বাংলার লোক-গীত-কথা

চিত্তরঞ্জন দেব

মুখবন্ধ :

অধ্যাপক ডক্টর হাইনশ্‌ মোদে

[জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের হালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রাচ্য-পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক]

পরিবেশক :

কত-কথা

১/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
পূরবী দেব
"পল্লীগীতি"
৩৩/১, ডঃ মেঘনাদ সাহা রোড
কলিকাতা-৭৪

প্রথম সংস্করণ : ১৯৬০ খৃঃ অঃ
১৩৬৭ বঃ অঃ

প্রচ্ছদ শিল্পী :
ধীরেন শাসমল

গ্রন্থনা :
পঞ্চানন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
২০/এ, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শান্তনু গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৯

স্বর্গতা শ্রীযুক্তা তরুলতা দেব-এর
পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

১।	প্রস্তাবনা	৩—৬
২।	চম্পকলতা	৭—৫৮
৩।	আসমান তারা	৫৯—৮৪
৪।	ফুলবানু	৮৫—১০৬
৫।	সোহাগী বাইদ্যানী	১০৭—১৪৮
৬।	সাকিনা বিবি	১৪৯—১৬৩
৭।	ক্যাশবতী কইন্যা	১৬৪—২০৮
৮।	রূপধন কইন্যা	২০৯—২৪৪
৯।	রূপবান কইন্যা	২৪৫—২৯৮
১০।	সতী রূমুনা ঝুমুনার পালা	২৯৯—৩৩৮

বাংলার লোক-গীত-কথা

॥ প্রস্তাবনা ॥

গান আর গাথার দেশ এই বাংলা। হাটে, মাঠে, বাটে অফুরন্ত এর গানের ভাণ্ডার। তার বৈচিত্র্যই বা কত! এক অঞ্চলের গানের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের গানের যেমনি রয়েছে সুরগত পার্থক্য, তেমনি বিষয় বস্তুতেও। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনাও করেছি। এই গান শুধু যে পল্লীবাংলার নিরক্ষর জনসাধারণের অবসর বিনোদনের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে তা' নয়। এর ভিতর একদিকে যেমনি দেখতে পাওয়া যায় নিরক্ষর কবিকুলের কবিত্বশক্তির বিকাশ অপর দিকে সমসাময়িক সমাজের আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি, আর্থিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যাদিও অস্বীকার করবার উপায় নেই। বলা বাহুল্য ইতিহাসের বহু অলিখিত উপাদানও খুঁজে পাওয়া যাবে লোক-কবিদের এই সব গান ও গাথার মধ্যে।

তবে এ-কথা বলাই বাহুল্য গান অপেক্ষা গাথার ভিতরই এই-সব ঐতিহাসিক উপাদান, তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক খবরাখবর অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বিগত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃ: অ: ভিতর বাংলার (উভয়বঙ্গ একত্রে) বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের সময় যে প্রভূত পরিমানের লোক-গীতি সংগ্রহ করি, সেই সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে কয়েকখানি লোক-গীত-কথা (Ballad) ও সংগ্রহ করতে সমর্থ হই।

সুদীর্ঘ ষাট বৎসর পূর্বে ৺চন্দ্রকুমার দের সহায়তায় আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় যে পঞ্চাশ-ষাট খানি গীত-কথা সংগৃহীত হয়েছিল তারপরে পল্লীবাংলার ঘরে অবশিষ্ট যা ছিল যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ ও বর্তমানের দ্রুত সমাজ বিবর্তনে তা, আজ প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত

মাত্র নয় খানি গীত-কথা যা সংগ্রহ করতে অগণিত হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ সকলেরই সাহায্য এবং সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছিল। বাংলার ভাবীকালের গবেষকদের পক্ষ থেকে তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গীতিকা বা লোক-গীত-কথা (Ballad) সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে আমাদের মনে রাখা দরকার, গীতিকা শুধুমাত্র ক্ষণিকের ভাব বা অবস্থা বর্ণণাতেই শেষ নয়—এর ভিতর একটা দৃঢ় ভিত্তিক কাহিনী থাকবেই এবং এই কাহিনীই এর প্রাণ-স্বরূপ। এর ভিতর ঘাত-প্রতিঘাত নাটকীয় রীতি-নীতি সবই বিদ্যমান। এখানে সুর অপেক্ষা কাহিনীই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এর গায়কী ভঙ্গী বা ধারা যে সর্বত্র প্রায় একইরূপ—যে কথা লোক-গীতির বেলায় খাটেনা।

গীতিকাগুলির আলোচনাকালে আর একটি জিনিস সহজেই মনে আসবে, এর রচনাকাল এবং এর রচয়িতা সম্পর্কে। কারণ, যে দেশের কাব্য-মহাকাব্য মূলতঃ দেবতাদের লীলাখেলা তথা দেব মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত সেক্ষেত্রে কী ভাবে এই গীতিকাগুলির কাহিনী সম্পূর্ণ স্বাধীন—কোনও ধর্মের ছুঁৎমার্গ না রেখে সাবলীল কাহিনী সম্ভবপর? তা'হলে এই গীতিকাগুলির মূল উৎস কি আদিবাসী সমাজ? এ সম্পর্কে প্রসঙ্গান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। কারও কারও মনে এরূপ সন্দেহও উপস্থিত হয়েছে—এই গীতিকাগুলি কি তা' হলে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পূর্বেকার? অনেকের মতে এর ভিতর বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও ছাপ রয়েছে। এ সম্পর্কেও পৃথকভাবে আলোচনায় আসা যাবে।

সংগৃহীত গীতিকাগুলি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন মনে জাগে—এগুলি কোনও ঐতিহাসিক কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে রচিত কি-না?

প্রথম দৃষ্টিতে অবশ্য সেরূপ কোনও ব্যক্তির বা চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। যদি থেকেও থাকে তা' হলে বিচার করতে হবে কোন্

সময়ের এবং কোন্ অঞ্চলের গীতিকা—এর উপর উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর অনেকটা নির্ভর করে

সংগৃহীত গীতিকাগুলির প্রায় সবকটিতেই নারী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। এটা বোধ হয় গীতিকামাত্রেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ✓চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত গীতিকাগুলির ভিতরও এই জিনিসটিই দেখা গেছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের বহুল প্রচলিত Ballad গুলি নিয়ে আলোচনা করলেও ফলশ্রুতি একই হবে।

গ্রন্থে সন্নিবেশিত গীতিকাগুলির ভিতর কয়েকটি হিন্দুসমাজের কাহিনী সমৃদ্ধ, কয়েকটি মুসলমান সমাজের। বলা বাহুল্য একই গীতিকা উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরই গীত হয়ে থাকে। গীতিকার ব্যাপারে বিশেষ কোন গীতিকাকে নির্দিষ্ট কোন সমাজের বলে চিহ্নিত করা যায় না বা করাও উচিত নয়। তবে গীতিকায় বর্ণিত কাহিনী গুলির আলোচনার সুবিধার জন্য বলা যায়—মুসলমান সমাজের বর্ণিত গীতিকাগুলিতে যুদ্ধ-সংঘর্ষ-সংঘাতটাই বেশী করে দেখান হয়েছে পক্ষান্তরে হিন্দুসমাজের বর্ণিত গীতিকার ভিতর প্রেম-ভালবাসা ও ভক্তিভাবের প্রাবল্যই লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সংগৃহীত এই গীতিকাগুলির কোনটিই একটি মাত্র লোকেরই রচনা এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই—বরং এক বা একাধিক লোকের দ্বারা এক একটি গীতিকা (যতদিন পুঁথিবদ্ধ না হয়) পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হতে হতে বর্তমান রূপ নিয়েছে। এ কথা বলাই বাহুল্য এ বিষয়ে সর্বশেষ যিনি পরিবেশক তার রুচিবোধ ও বৌদ্ধিক পরিশীলতাও অনেকটা নির্ভর করে থাকে।

যেহেতু এই গীতিকাগুলিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথাই তুলে ধরা হয়েছে, সেই হেতু এর বিনাশ নেই—এমনকি এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও এর মানবিক আবেদন আজও অটুট।

আমি আমার সীমিত ক্ষমতায় সংগ্রাহকের কর্তব্য মাত্র সমাপন করলাম। আশা করি, ভাবী কালের গবেষকগণ এ সম্পর্কে তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে গীতিকাগুলির সঠিক মূল্যায়ণ করতে সমর্থ হবেন।

।। চম্পকলতা ।।

কাহিনী

কাঞ্চনপুরে আদিশূর নামে ছিলেন এক রাজা। কিন্তু তিনি ছিলেন আটকুঁড়ো। তাই তার ধন-দৌলত, বিষয়-আসয়, লোক-লস্কর সব কিছু থাকা সত্ত্বেও মনে কোনরূপ সুখ বা শান্তি ছিল না। একদিন রাজার এই আট কুঁড়ো নাম ঘুঁচল—তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। রাজাময় হৈ-চৈ পড়ে গেল। দান, ধ্যান, কাঙালী বিদায় করতে প্রায় সাতদিন সাত রাত কেটে গেল।

রাজপুত্র পরম সুন্দর। তার রূপ দেখে কন্দর্পেরও বুঝি হিংসে হয়। তাই তার নামকরণও করা হল কন্দর্প কুমার।

কন্দর্প কুমার দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু মুস্কিল হল রাজপুত্রের কোন লক্ষণই তার ভিতর দেখা গেল না। মৃগয়া যাওয়া বা মল্লক্রীড়া এর কোনদিকেই তার উৎসাহ নেই। সে দিবারাত্র বসে রাজজ্যোতীষির কাছে জ্যোতিষ-শাস্ত্র চর্চা করে চলে। রাজা, মন্ত্রী সবাই চিন্তিত। তাইতো সাত নয়, পাঁচ নয় রাজার একমাত্র বংশধর, ভাবী রাজা এ দেশের সে কিনা রাজকার্য কিছু না শিখে টুলো পণ্ডিতের মত জ্যোতীষচর্চা করে দিন কাটাবে!

মহারাজ আর মহামন্ত্রী দুজনে পরামর্শ করে একদিন রাজকুমারকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, দেখ বাবা আমি বুড়ো হয়েছি। এরপর তোমাকেই ত' এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে। তাই তোমাকে অবিলম্বে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তবে হ্যাঁ, যুবরাজ হয়ে বসবার আগে নিয়ম অনুসারে তোমাকে সামান্য একটা পরীক্ষা দিতে হবে—তা' না হলে আমাদের সকলের মনেই একটা সংশয় থেকে যাবে—রাজত্বটা যোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়ল কিনা?

রাজপুত্র বিনীত ভাবে জবাব দেয়, বেশ, আমি প্রস্তুত। যে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে আমার কোন আপত্তি নেই।

মহারাজ কুমারের হাতে উজ্জ্বলবর্ণের এক বহু মূল্যবান মাণিক্য দিয়ে বললেন, দেখ বাবা, এই মাণিক্যটি হল সাত রাজার ধন। এইটি তোমার সঙ্গে রাখ। একটি বছর তোমায় সময় দিলাম—এর মধ্যে তুমি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই মাণিক্য সহ এখানেই ফিরে আসবে। না পারলে বুঝব, তুমি এখনও যুবরাজ হবার উপযুক্ত হওনি।

—বেশ, তবে তাই হোক—বলে রাজপুত্র মাণিক্যটি ট্যাকে গুঁজে ঘোড়ায় চেপে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণে।

দিন যায়। রাত হয়। এই ভাবে একদিন সন্ধ্যের কাছাকাছি রাজপুত্র এসে পৌঁছয় এক নতুন রাজার রাজত্বে।

রাজপুত্র পরিশ্রান্ত। ভাবে, নিকটেই যে দীঘি দেখা যাচ্ছে ওখানে গিয়ে প্রথমেই ভাল করে স্নানাদি সমাপন করে সেই রাত্রের মত কোনও গৃহস্থ বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে পরদিন ভোরেই আবার যাত্রা শুরু করবে।

রাজপুত্র তার পোশাক পরিচ্ছদ খুলে রেখে দীঘিতে নেমে স্নান শুরু করেছে, এমন সময় সেই দীঘির সান বাঁধানো ঘাটলায় ছিপ হাতে মাছ ধরবার ভান করে এসে বসে এক চোর। তার কাজই হ'ল ঐ ভাবে ঘাটলায় বসে থাকা আর পথশ্রান্ত পথিকেরা দীঘিতে এসে স্নান শুরু করলেই তাদের জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেওয়া।

রাজকুমার যে মুহূর্তে দীঘির জলে ডুব দিয়েছে, চোরও অমনি তার জামা কাপড় ঘেঁটে দেখতে পেল সেই মাণিক্য। চোর আর কোন দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি মাণিক্যটি নিজের কাপড়ের ভিতর বেঁধে নিয়ে ওই ওজনের এক খণ্ড ইট রাজপুত্রের কাপড়ের ভিতর রেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

রাজপুত্র পরিতৃপ্তি সহকারে স্নান সমাপন করে উঠে দেখে, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কাছাকাছি কোন লোকালয়ও নজরে পড়ে না, তাই তাড়াতাড়ি করে জামা কাপড় পরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় পূবদিক লক্ষ্য করে। কিন্তু পথ বড়ই অন্ধকার। রাজপুত্র ভাবে, মাণিক্যটি বের করবেনি, ওর আলোতে বেশ পথ দেখা যাবে।

এই না ভেবে রাজপুত্র যেই তার কাপড়ের ভঁজ খুলেছে অমনি দেখে মাণিক্যত নেই-ই, তার পরিবর্তে সেখানে রয়েছে এক খণ্ড ইট। রাজপুত্রের বুঝতে আর বাকী থাকে না যে, এ-কাজ ঐ লোকটিই করেছে।

রাজপুত্র বৃথাই ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দীঘির পাড়ে ফিরে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখল সেখানে পড়ে রয়েছে সেই চোরের হুকো, কল্কী, আর ছিপ ও মাছের আধার।

রাজপুত্র জ্যোতীষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তৎক্ষণাৎ ঘাটলার উপর খড়ি পেতে গুণে দেখল, চোর খুব একটা দূরে যেতে পারে নি। পূব দিকেই গেছে। রাজপুত্রও আর সময় নষ্ট না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পূব দিকেই।

কিছুদুর যাবার পর রাজপুত্র দেখে, যখন তামাম দুনিয়া আঁধারে ঢাকা সেই সময় একটা কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

রাজপুত্র সেই আলোর রশ্মি অনুসরণ করে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হয় সেই বাড়ির একেবারে পিছনের দিকে। চুপি চুপি সেই ঘরের পিছনে এসে হোগলা পাতার বেড়ার ফাঁকা দিয়ে দেখতে পায়, চোর আর তার বৌ দু'জনে মিলে তাদের মাটির ঘরের মাঝখানটায় মাটি খুঁড়ে মাণিক্যটি রেখে হাতে খড়্গ নিয়ে বসে পাহাড়া দিচ্ছে।

রাজপুত্র চিন্তা করে, কোনক্রমে যদি চোরাকে বা চুন্নীকে ওখান থেকে না সরান যায় তা হলে ত' মাণিক্য উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই

নেই—এই ভেবে সে চুপি চুপি ঘরের পিছন থেকে বাঘের ডাক ডাকতে থাকে।

চুন্নী (চোরের স্ত্রী) ভয় পেয়ে চোরাকে বলে, ওগো ঘরের পিছনে বাঘের ডাক শুনতে পাচ্ছি, একটু উঠে দেখ ত'।

চোরা প্রথমটায় ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে চায় না। পরে চুন্নী আলো হাতে নিয়ে আর চোরা খড়্গ নিয়ে বেড়িয়ে আসে বাইরে বাঘ তাড়াবার জন্য। রাজপুত্রও ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকে তলোয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে মাণিক্যটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সোজা দৌড়।

এদিকে চোরা-চুন্নীও বাঘ দেখতে না পেয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখে, মাণিক্য নিয়ে রাজপুত্র চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই শুরু করে তার পিছু ধাওয়া করতে।

ছুটছে ত' ছুটছেই। ছুটতে ছুটতে তারা তিনজনেই এসে পড়েছে সেই দেশের রাজপুরীর সিংহ দরজায়।

চোরা-চুন্নী যুক্তি করে তখন এক নতুন কৌশল অবলম্বন করে।

রাজপুত্র দৌড়তে দৌড়তে প্রহরীর কাছে গিয়ে পৌঁছতেই চুন্নী কাঁদতে কাঁদতে রাজপুত্রের পিছু ধাওয়া করে—ওগো, আমাকে ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ গো—

প্রহরী রাজপুত্রকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে চুন্নীকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে মা ?

চুন্নী কাঁদতে কাঁদতে বলে, দেখ সিপাই বাবা, ইনি আমার স্বামী। আমাকে খেতে পরতে না দিয়ে অন্য মেয়ে লোকের প্রেমে পড়ে আমাকে পরিত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

রাজপুত্র চিন্তা করে দেখে, এর প্রতিবাদ করা এই মুহূর্তে নিরর্থক। তার চাইতে ওর অভিযোগই স্বীকার করে নেওয়া ভাল। রাজপুত্র উত্তর দেয়, সিপাই বাবা, উনি ঠিকই বলেছেন, উদয়াস্ত পরিশ্রম করি

কিন্তু তবু আমার স্ত্রীর কোন সাধ আহ্লাদই পূরণ করতে পারি না। তাই মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম।

সিপাই দু'জনকেই রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করে সব ঘটনা বর্ণনা করে।

রাজা বিবরণ শুনে বিধান দেন,—বেশ, আজ থেকে তোমরা আমার রাজপুরীর ভিতরেই থাকবে। আমার রাজসভাতেই তোমার চাকুরী বহাল হ'ল।

রাজপুত্র তখন থেকে চুন্নীর সংগে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে চলে। দিনে রাজকার্যে বাইরেই কাটায়। রাত্রে এক বিছানায় শুয়েও ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে।

এদিকে চোরা রোজ রাত্রে এসে গোপনে চুন্নীর সাথে মিলিত হয়। তাকে ভৎর্সনা করে,—যে করেই হোক ওকে হত্যা করে মানিকটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে আয়—।

কিন্তু চুন্নী সে সুযোগ আর পায় না। শেষে একদিন অধৈর্য হয়ে চোরা চুন্নীকে গালাগাল দেয়,—বুঝেছি, তুই ওর ওই সুন্দর মুখ দেখে ওর প্রেমে মশগুল হয়ে গেছিস, তা' না হ'লে ওই একরত্তি ছেলেটাকে খুন করতে এত দেরী হবার কথা নয়। আজ যে করেই হ'ক ওকে হত্যা করে মাণিক্য নিয়ে চলে আসবি, না হ'লে তোকেই আমি খুন করে ফেলব।

রাজকুমার ঘুমের ভান করে শুয়ে থেকে সবই শুনছিল। যখন ওরা বাদানুবাদে লিপ্ত ঠিক এই সুযোগে চুপিচুপি সে বিছানা ছেড়ে দিল এক দৌড়—

হঠাৎ চোরাচুন্নী দু'জনেরই নজর পড়ে, পাখি উড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চোরাচুন্নী দু'জনে ঝগড়া থামিয়ে শুরু করে ওর পিছু ধাওয়া করতে।

দৌড়চ্ছেত' দৌড়চ্ছেই। দৌড়তে দৌড়তে রাজপুত্র এসে পৌছয় এক নদীর কিনারে।

নদীতে তখন ভরা জোয়ার। মাত্র একখানা ডিঙ্গি নৌকো রয়েছে ঘাটে বাঁধা। রাজপুত্র লাফ্ দিয়ে নৌকোয় উঠেই মাঝিকে বলে,—নৌকো ছাড়—।

মাঝি বলে,—এই জোয়ারে নৌকো ছাড়ব কি মরতে ?

রাজপুত্র দেখে আর উপায় নেই—ওরা এসে পড়েছে প্রায়। ঐ ত দেখা যাচ্ছে ওরা ঊর্দ্ধশ্বাসে এই দিকেই দৌড়ে আসছে। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি নিজের হাতের স্বর্ণাঙ্গুরী খুলে নিয়ে মাঝির হাতে দিয়ে বলে, ভাই, তুমি এই সোনার আংটিটি রাখ এর অনেক দাম, তুমি এর বিনিময়ে আমাকে যে ভাবেই পার ওপাড়ে পৌঁছে দাও।

মাঝি একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সোনার লোভে এই দুর্যোগেও নৌকো ছেড়ে দেয়। ওদিকে চোরা-চুন্নীও পাগলের মত মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে নদীর পাড়ে এসে পৌঁছয়।

চোরা দুঃখে-শোকে চুন্নীকে ধরে প্রহার করতে থাকে। বেদম প্রহারের চোটে চুন্নী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। চোরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে শেষ চেষ্টা করবার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয় নৌকো ধরবার জন্য। কিন্তু জোয়ারের টানে নৌকো ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। চোরার দেহটা ঢেউয়ের ঝাপটায় নিয়ে আছড়ে ফেলে দিল অনেক দূরে এক বালির চরে।

চুন্নী সারা রাতভর নদী পাড়ে বসে কেঁদেকেটে ভোর হবার সাথে সাথে প্রায় বিবসনা অবস্থায় ঘরে ফিরে আসে।

রাজকুমার নৌকো থেকে নেমে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। পূবদিকে শুধু বালি আর বালি জন-বসতির চিহ্নমাত্রও নেই। উত্তর দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখে শুধু বন আর বন। দূরে দূরে কোথাও বা বাঘের ডাকও শোনা যায়। রাজপুত্র ওই দু' পথই পরিত্যাগ করে। পশ্চিমে বিশাল সাগর সুতরাং ওদিকে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 'যা থাকে কপালে'—বলে রাজপুত্র এইবার দক্ষিণ দিকের পথ ধরে চলতে থাকে।

রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছে রাজপুত্র। কী সুন্দর দেশ! মনোরম সব অট্টালিকা, সুদৃশ্য পথঘাট, কিন্তু কী আশ্চর্য লোকজনেরত' সাড়া-শব্দ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না! তা' না পাওয়া যাক, এমন সুন্দর রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি যেখানে রয়েছে সেখানে কি আর লোকজন না থেকে পারে?

রাজপুত্র আরও এগিয়ে যায়। দেখে, পথের পাশে শ্বেত পাথরের গড়া অতি মনোরম এক বিশাল অট্টালিকা। বাড়ির সুমুখে আটখানা অতি মূল্যবান আরাম কেদারা পাতা, তার সাতখানাতে বসে রয়েছে সাতজন যুবা পুরুষ আর অষ্টমটিতে আলো করে বসে রয়েছে এক অসামান্যা সুন্দরী।

রাজকুমার দেখে আর ভাবে,—এরা কারা?

কিছুদূর এগিয়ে মনের সন্দেহ নিরসন করতে গণনা করে দেখে,—সর্বনাশ! এই সাত যুবা পুরুষ হল বিখ্যাত সাত ডাকাত, আর নারীটি হলেন এদেরই একমাত্র বোন নাম চম্পকলতা।

চম্পকলতাও জ্যোতীষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী। তার কাজই হ'ল রাস্তা দিয়ে যে সব পথিক যায় তা' দেখেই সে বলে দিতে পারে কোন্ পথিকের কাছে কী জিনিস আছে। আর সেই খবর শুনে সাত ভাই সঙ্গে সঙ্গে সেই পথিকের পিছু ধাওয়া করে তার সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে আসে।

এই ভাবেই এদের দিন কাটছিল। আজ এইমাত্র এই রাজকুমারকে দেখেই চম্পকলতা মুহূর্তের জন্য যেন চমকে উঠ্‌লো—এমন সুন্দর রূপ কি কখনও কোন মানুষের হয়? আহা না জানি সে কোন্ বা দেশের রাজকুমারই বা হবে!

চম্পকলতার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে ভাইয়েরা। চম্পকলতাও মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ভাইদের হুকুম করে, দাদা, শীঘ্র ওই পথিকের পিছু ধাওয়া কর। জেনো, ওর পাগড়ীর ভিতর লুকোনো রয়েছে মহা মূল্যবান সাতরাজার ধন এক মাণিক।

বোনের কথায় ভাইয়েরা সঙ্গে সঙ্গে যে যার ঘোড়ায় চেপে বায়ু বেগে ধাওয়া করে কুমারকে।

দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে রাজপুত্রের আর বুঝতে বাকী থাকে না – ডাকাতদল তাকেই ধরতে এগিয়ে আসছে।

রাজকুমার মুহূর্ত মধ্যে নিজের বেশ পরিবর্তন করে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে গুটিগুটি চলতে থাকে। ডাকাতদল তার কাছে এসে ঘোড়া থেকে না নেমেই প্রশ্ন করে,—কি হে ঠাকুর, এই পথ দিয়ে কি কোনো সদাগরকে যেতে দেখছ?

ব্রাহ্মণ বেশী রাজকুমার একগাল হেসে ডাকাতদের ঠিক উল্টো-দিকটাই দেখিয়ে দিয়ে ধীরে সুস্থে নিজের পথ ধরে।

এদিকে ডাকাতরা রাজপুত্রকে খুঁজে না পেয়ে বোনের কাছে ফিরে এসে জানায়,—না, তাকে পাওয়া গেল না।

তাদের কথায় চম্পকলতা যেন তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, আরে ওই পুরুতবেশী ব্রাহ্মণই হ'ল ছদ্মবেশী রাজপুত্র। যাও, যাও, শীঘ্র যাও এখনও সে ভীলরাজার রাজত্বের ভিতর গিয়ে পড়তে পারেনি, তা'হলে আর তাকে ধরতে পারবে না।

বোনের কথায় সাত ডাকাত আবার দ্বিগুণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় সেই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে।

রাজকুমারও কান খাড়া করেই ছিল। বুঝল, ডাকাতদল আবার ফিরে আসছে। তাই আর কালবিলম্ব না করে ব্রাহ্মণের বেশ পরিত্যাগ করে একজন গাঁয়ের বৈদ্যের বেশ ধারণ করে, বগলে একরাশ লতা-পাতা, কাঁধে ওষুধের পুঁটলি, হাতে লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে হেঁটে চলে।

ডাকাতদল তার সুমুখে এসে বেশ রাগত ভাবেই জিজ্ঞেস করে, কবিরাজ মশাই, এ-পথে কি কোন বামুন ঠাকুরকে যেতে দেখেছেন?

রাজকুমার একটুক্ষণ চিন্তার ভান করে তাদের পুনরায় উল্টোদিক দেখিয়ে দেয়। ডাকাতদলও সে কথা শুনে তৎক্ষণাৎ উল্টোদিকে রওনা দেয় এবং কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে আবার ফিরে আসে বোনের কাছে।

চম্পকলতা ভাইদের খালি হাতে ফিরতে দেখেই বুঝতে পারে পাখি এবারও ফাঁকি দিয়েছে। সে আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে তড়িৎ গতিতে নিজের সাদা ঘোড়ায় চেপে পবন-বেগে যাত্রা করে যে দিকে কুমার চলেছে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ভীলরাজার রাজত্বের দিকে।

রাজকুমার পুনরায় গণনা করে দেখে, এবার আর নিস্তার নেই, পিছনে এগিয়ে আসছে কালনাগিনীসম চম্পকলতা তার উদ্যত ফণা তুলে। ভয়েই প্রাণ আধখানা। তায় সারাদিনের পরিশ্রম। পা যেন আর চলতে চায় না। বারবার করে 'উঁচু-নীচু জায়গায় হোচট খেয়ে পড়ে যায়। তবুও তার ছোটা এবং চলার আর বিরাম নেই। পিছনে এক লহমার জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখে মেঘের মত কালো কেশ উড়িয়ে চামুণ্ডা মূর্তিতে বিদ্যুৎ গতিতে ধেয়ে আসছে চম্পকলতা। কুমার জীবনের আশা একদম ছেড়ে দিয়ে শেষ চেষ্টা করে অবসন্ন দেহে কোন রকমে ঢুকে পড়ে ভীলরাজার রাজ্য সীমান্তে।

চম্পকলতা দেখে, এখানে আর তার জারিজুড়ি খাটবেনা। অন্য রাজার রাজত্ব, সম্মুখেই সীমান্ত প্রহরী! তাই, সে অন্যপন্থা অবলম্বন করে। মাণিক্য তা'র চাই-ই। তাই, যে মুহূর্তে কুমার ভীল রাজার সীমানায় পদার্পণ করে সেই মুহূর্তেই সে নেহাৎ এক কুলবধুর রূপ ধরে কাঁদতে কাঁদতে তার পিছু পিছু চলতে থাকে একেবারে রাজসভা পর্যন্ত।

ভীলরাজা তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করায় চম্পকলতা উত্তর দেয়, দেখুন আপনি দেশের রাজা, সকলেরই পিতা। আপনিই বিচার করুণ, ইনি আমার স্বামী, কী কারণে, কী অপরাধে আজ উনি আমায় পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন—এই বলে সে বর্ণনা করে শিশুকালে তার পিতামাতা অনেক দেখে শুনে এহেন বরে বিয়ে দিয়েছিলেন যিনি তার নিজের স্ত্রীকে খেতে পড়তে না দিয়ে পালিয়ে চলে যান।

চম্পকলতার অভিনয়ে ভীলরাজা রাণী দু'জনেই মুগ্ধ হয়ে যান। রাজা কঠিন কণ্ঠে আদেশ করেন, দেখ, নারীর অমর্যদা এ-রাজত্বে

চলবেনা। সত্য কথা বল, কেন তুমি তোমার বিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে চাইছ ?

কুমার দেখে, এখানেও সেই একই ফ্যাসাদ, এখন সত্য কথা বললেও এদের বিশ্বাস করান যাবেনা। তার চেয়ে ঘটনা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই একটুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দেয়, হ্যাঁ মহারাজ, এ রমনী আমার স্ত্রীই বটে, যা বলেছে সবই সত্য। দিবারাত্রি পরিশ্রম করেও আমি আমার নিজের ও আমার স্ত্রীর উদরান্নের সংস্থান করতে পারিনা, তাই অতি দুঃখে এ হেন যুবতী রূপসী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ যাত্রা করছিলাম। এর পরের ঘটনা সবইত আপনার জানা।

রাজপুত্রের কথায় রাজারাণী উভয়েই ব্যথিত হলেন। রাজা আদেশ দিলেন, আজ থেকে তোমার কাজ হল আমার দরবারে বয়স্য হিসেবে থাকা। আর তার বিনিময়ে তোমাদের থাকা, খাওয়া সব খরচই সরকার থেকে বহন করা হবে। থাকবার জন্য স্বতন্ত্র এক বাগান বাড়িও নির্দিষ্ট করা হ'ল।

রাজপুত্র ভীলরাজের কথায় সম্মত হয়ে সেই থেকে দিনে রাজসভায় চাকুরী করে আর রাত্রে এসে বাসায় শুয়ে থাকে। চম্পকলতার সঙ্গে একই ঘরে রাত কাটায় অথচ কেউ কারও সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত বলে না।

দিন যায়। রাত হয়। রাত কেটে গিয়ে আবার ভোরও হয়। রাজকুমার আর চম্পকলতার ভিতরকার ব্যাপার যাতে বাইরের কারও নজরে না আসে সে বিষয়ে উভয়েই খুব সতর্ক।

এ দিকে চম্পকলতার সাত ভাই গভীর রাত্রে এসে নিভৃতে বোনের সঙ্গে সাক্ষাত করে। পরামর্শ করে, কী করে রাজপুত্রের কাছ থেকে মানিক্য ছিনিয়ে নেওয়া যায়। দিনের পর দিন এই ভাবে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়ায় ডাকাতরা বোনের উপর চটে যায়। কী সামান্য একজন যুবককে হত্যা করে তার কাছ থেকে মানিক্য ছিনিয়ে নিতে কত সময় লাগে ?

ডাকাতদল আজ বোনকে চরম কথা শুনিয়ে দিল—যে করেই হ'ক আগামী তিন দিনের ভিতর রাজকুমারের কাছ থেকে মানিক্য ছিনিয়ে নেওয়াই চাই। প্রয়োজন বোধে তাকে হত্যা করতেও যেন সে কুণ্ঠিত না হয়।

পরদিন। রাত গভীর। কুমার ঘুমিয়ে আছে পালঙ্কের উপর, চম্পকলতা তার পায়ের কাছে বসে বসে দেখতে থাকে কুমারের অপূর্ব রূপ-লাবণ্য। জানালা দিয়ে চাঁদের কিরণ এসে লুটিয়ে পড়েছে কুমারের মুখের উপর। যত দেখে ততই সে মোহিত হয়ে যায়। ভাবে, আহা না জানি কোন্ দেশেরই বা রাজপুত্র! আহা কী অনিন্দ্য সুন্দর এর রূপ রাশি! একে যদি পাই, তবেই আমার জীবন সার্থক।

ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হয়। মানিক্য আর ছিনিয়ে নেওয়া হয় না। দ্বিতীয় দিন আবার সেই একই ভাবে বসে বসে চেয়ে থাকে কুমারের মুখের দিকে, আর নিজের মনেই বিলাপ করতে থাকে তার অতীত জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে। দেখতে দেখতে সে-রাতও সেই একই ভাবে শেষ হয়ে যায়।

আজ শেষ দিন। আজ যে-করেই হোক কার্য সমাধা করতেই হবে, তা' না হলে ভাইদের হাতে তারও নিস্তার নাই।

মনের সব রকম দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চম্পকলতা আজ প্রথম থেকেই সতর্ক হয়ে যায়।

গভীর রাত। জানালা দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের অকৃপণ জোছনা এসে লুটোপুটি খাচ্ছে কুমারের দেহের উপর। মৃদু বাতাসে উড়ে যায় তার মাথার চুল। চম্পা কুমারের নাকের কাছে হাত নিয়ে অনুভব করে—সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এই তো ঠিক সময়। না, আর দেরী নয়, খোঁপার ভিতর থেকে বের করে নেয় অগ্নিমুখী ছুরি। মনের রুদ্ধ আবেগ প্রবল শক্তিতে বেঁধে নিয়ে কম্পিত হস্তে এগিয়ে যায় কুমারের বুকের কাছে।

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও কুমারের মুখের দিকে চেয়ে তার চোখের জল কিছুতেই বাধা মানলনা। টপ্ করে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে

পড়ল কুমারের মুখের উপর। আর সেই উষ্ণ জলের স্পর্শে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে কুমার খপ্ করে ধরে ফেলে চম্পার হাত। ছিঃ ছিঃ সামান্য একটা মানিক্যের চেয়েও মূল্যবান যে জীবন, তাকে তুমি এই ভাবে নষ্ট করছ? এর চাইতে তুমি যদি মানিক্যটা মুখ ফুটে চাইতে আমি বিনা প্রতিবাদেই তোমার হাতে তুলে দিতাম, এই নাও সেই সাত রাজার ধন এক মানিক্য—বলে কুমার তার ট্যাঁক থেকে মানিক্যটি বের করে চম্পার হাতে দিয়ে পুনরায় বলে,—যাও, যে জন্য আমার পিছু-পিছু এতদিন কাটিয়েছ তা'ত' পেয়েছ, এইবার দয়া করে আমার কাছ থেকে চলে যাও।

রাজকুমারের কথায় চম্পার চৈতন্য উদয় হয়। এইবার-সত্যি সত্যিই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বলে, কুমার, আমায় ক্ষমা কর, যদিও আমি তার যোগ্য নই। আমাকে তোমার চরণে ঠাঁই দিলে আমি কৃতার্থ হব। আজ থেকে এ-জীবন তোমার পায়েই সঁপে দিলাম। এখন তোমার ইচ্ছে হলে এ প্রাণ রাখতে পার, ইচ্ছে না হলে এই মুহূর্তেই তা' শেষ করে দাও, আমার অভিশপ্ত জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটুক। একদিন আমিও ছিলাম এক নামকরা সওদাগর কন্যা, ভাগ্য দোষে আজ আমি দস্যু দলের নেত্রী। আজ তুমি ছাড়া এ তিন ভুবনে আমার আর কেউ নেই। আজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবেই তোমার পায়ে সঁপে দিলুম—এই বলে চম্পা আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে।

রাজকুমার বলে, তা কেন, তোমার ভাই, বন্ধু, অত্মীয়-পরিজন সব রয়েছে, এই মানিক্য নিয়ে তাদের কাছে চলে যাও: সেখানে গিয়ে সুখে বসবাস কর। কেন মিছি মিছি অমার পিছনে ঘুরে ঘুরে কষ্ট পাবে, আমারত' আর কিছুই নেই।

একটু থেমে কুমার আবার বলতে থাকে, সত্যি কথা বলতে কি আমিও তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। কিন্তু সকলের উপর আমার কর্তব্য, যে করেই হ'ক এই মানিক্যসহ আমায় দেশে ফিরে যেতেই হবে।

আর, যদি কোনদিন এই মানিক্য সহ দেশে ফিরে যেতে পারি, তখনই তোমাকে গ্রহণ করার কথা উঠবে, তার আগে নয়। কাজেই যাতে তোমার ভাইদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে দেশে ফিরতে পারি এই মানিক্য সহ তারই একটা উপায় বের করা দরকার।

চম্পা বলে, বেশতো আজ থেকে সে দায়িত্ব আমি সেচ্ছায় গ্রহণ করলুম, এখন থেকে যদি আমি যেমনটি বলি তেমনটি কর, তা' হলে আর তোমার কোন বাসনাই অপূরণ থাকবেনা।

পরদিন। রাত গভীর। চম্পা জানালা দিয়ে দেখে, দূরে তার সাত ভাই এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়ায় চেপে। চম্পা কুমারকে বলে, দেখ আমি ওদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলবার ভান করব, তারপর তোমাকে নিয়ে আমার সাদা ঘোড়ায় চেপে চলে যাব। এই বলে চম্পা হাসতে হাসতে বাগানের ভিতর ভাইদের কাছে গিয়ে মিলিত হয়ে তাদের একটু দূরে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে ক্ষিপ্রগতিতে ভাইদের ঘোড়ার কাছে এসে তাদের সাতটি ঘোড়ারই পায়ের রগ মুহূর্ত মধ্যে কেটে দেয় তার খোঁপায় গোঁজা অগ্নিমুখী ছুরি দিয়ে। তারপর কুমারকে ডেকে নিয়ে আসে। তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ভাইদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, দেখ দাদা, আমি ওকে ভুলিয়ে আমার ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছি, তোমরা একটুক্ষণ বাদেই যে যার ঘোড়ায় চেপে আমাদের অনুসরণ কর, তারপর যা করবার হয় পথেই কাজ হাসিল করে চলে যাব।

ডাকাতরা চম্পার চালাকী ধরতে না পেরে সেইখানেই বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে যে যার নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে দেখে, কোনো ঘোড়াই আর চলতে পারে না। নিষ্প্রাণ ঘোড়াগুলি নেহাৎ কাঠের পুতুলের মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুঝতে আর কারও বাকী থাকেনা—তাদের বোন তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত চালাকী করেছে। তখন আর করবার কিছুই নেই। তবু একবার মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে। যদি কোন রকমে একবার পাকড়াও করতে পারে, তা' হলে

তুজনকেই একত্রে শেষ করে ফেলবে। কিন্তু চম্পকলতা ততক্ষণে কুমারকে নিয়ে চলে গেছে বহু দূর—তাদের নাগালের একদম বাইরে।

রাজপুত্র আর চম্পকলতা। ছুটছে ত ছুটছেই। কত মাঠ, ঘাট, বন, পর্বত, নদী, উপত্যকা যে তারা পার হয়ে গেল তার আর লেখা-জোকা নেই। এক সময় তারা এসে পৌঁছয় নিলক্ষীর চরে।

সেখানে না আছে গাছ পালা, না আছে জল, না দেখা যায় কোনও ঘর বাড়ি। আরও কিছুক্ষণ চলবার পর নজরে আসে ছোট্ট একখানা মেটে বাড়ি। কুমার বলে, চম্পা বড় তেষ্টা পেয়েছে, একবার ঘোড়াটা একটু থামাও।

চম্পা বলে, সে কি কুমার, এযে নিলক্ষীর চর। এখানে বাস করে ঠগনগরী আর উঠানদম্‌দমি নামে তুই ডাইনী বুড়ি। এরা তুই বোন, এদের নিঃশ্বাসের এত তেজ, যে কারণে কোন গাছপাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে জন্মায়না। ধারে কাছে এ জন্যে কোন জন বসতিও নেই।

কুমার বলে, তা' হক, তৃষ্ণায়ই যদি আমার প্রাণটা বেরিয়ে যায় তা' হলে আর চলব কি করে?

অগত্যা চম্পাকে সেইখানেই ঘোড়া থামাতে হয়। নেহাৎ শান্ত শিষ্টের মত ঠগনগরী এবং উঠানদম্‌দমির বাড়ির কাছে এসে, মাসী, ও মাসী, মাসী গো-বলে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়।

ডাক শুনে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এ-তল্লাটের ডাক সাঁইটে ডাইনী যুগল ঠগনগরী আর উঠানদম্‌দমি।

ঠগনগরী উঠানদম্‌দমিকে বলে, দেখতো রে বোন, এরা মাসী মাসী বলে ডাকাডাকি করে কেন বলত? আমাদের আর কোন বোন ছিল বলেত' মনে হয় না।

উঠান দম্‌দমি বলে, সে যাই হোক্, এদের আগমনে যখন আমাদের শুকনো গাছে ফুল ফুটেছে, তখন আর যাই হ'ক, এরা খারাপ লোক কেউ নয়।

চম্পা এগিয়ে এসে বলে, কী গো মাসি, আমাদের বুঝি চিনতেই পারনি ? আরে আমার মা, নাম যা'র অমাবস্যা, তোমাদের সকলের বড় বোন, যা'র বিয়ে হয়ে ছিল উজানীনগর—তা'র কাছেইত শুনেছি তোমাদের কথা।

ঠগনগরী কিছুক্ষণ উঠানদমদমির সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে—তা' ও যখন মাসী বলে ডেকে আমাদের আশ্রয়ে এসে উঠেছে-তা' সে ভুল করেই হ'ক বা সত্যিই হ'ক আমাদের কাছেত' কোন মানুষ বা আত্মীয়-পরিজনও আসে না, এরা যখন আমাদের আপন-জন বলে পরিচয় দিচ্ছে, তখন এদের খাতির যত্ন করতে হবে বৈ-কি ঠিক আপন মাসীর মতই।

উঠানদমদমি বলে, তা' বুঝলাম, কিন্তু কুটুম্ব বাড়িতে এলে তার আদর যত্ন ত' করা চাই। ঘরেত' চাউল বাড়ন্ত। আমরাত' দু'তিন দিন বাদে বাদে কোথাও থেকে কিছু যোগাড় করে নিয়ে এসে সংসার চালাই। কিন্তু এদের বেলায়ত' আর তা' হয়না।

ঠগনগরী বলে, বোন তুই বসে এদের পরিচর্যা কর, আমি দেখি কিছু যোগাড় করে নিয়ে আসতে পারি কি-না—এই বলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। দেখে, অনেক দূরে সেই দেশের রাজপুত্র বিশাল বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে বিয়ে করতে চলেছে। ঠগনগরীর এই তো মওকা, সে চট্ করে কবর স্থান থেকে একটি পাঁচ, ছয় বছরের মৃত বালকের দেহ সংগ্রহ করে পথের পাশে বসে রইল। রাজপুত্রের রথ তার পাশ দিয়ে চলে যেতেই সে বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল, ওরে—আমার দাদুরে—তোকে এই ভাবে রাজার বেটা গাড়ী (রথ) চাপা দিয়ে প্রাণে মেরে ফেল্লরে—ইত্যাদি।

ঠগনগরী আর কোন দিকে না তাকিয়ে মরা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সোজা এসে হাজির সেই দেশের রাজার কাছে।

সভাস্থ সকলেই ব্যথিত হয়ে উঠল ঠগনগরীর করুণ বিলাপে। সত্যিইত' আমোদ স্ফূর্তি করে বিয়ে করতে চলেছে বলে একজন অনাথা

বিধবার নাতীকে এই ভাবে হত্যা করাত' কোন মতেই উচিত নয়। রাজা মশাই পুত্রের কৃতকর্মের জন্য ঠগনগরীকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে তখনকার মত বিদায় করলেন। আর ঠগনগরীও সেই টাকায় বেশ কিছুদিন ধরে অতিথি সৎকার করতে লাগল।

বেশ কয়েকদিন কাটল ভালভাবেই। একদিন চম্পা দেশে ফিরবার কথা তুললে দু'জনেই বলে ওঠে, সে-কি এতকাল পর যখন এসেইছ তখন থাকনা এখানে ক'দিন'—এই বলে দু'বোনে আবার পরামর্শ করতে বসে, নতুন জামাই বলে কথা! তবুত' মনে করে একবারের জন্য হলেও বেড়াতে এসেছেত', এখন তারা যদি শুধু হাতে ঘরে ফিরে যায় তা' হলে লোকে বলবে কি? চম্পা না হয় আমাদের নিজেদের লোক, কিন্তু রাজপুত্রের দেশের লোকেরা ভাববে আমরা বুঝি অতিথি সৎকার সম্পর্কে কিছুই জানি না। কাজেই এর একটা বিহিত করাই দরকার।

এই সব সাত পাঁচ ভেবে উঠানদম্‌দমি একদিন উঠোনে এনে জড় করল যত রাজ্যের ভাঙ্গা মাটির খোলা। তারপর পাঁচখানা থলেতে সেগুলি ভর্তি করে ফেলল। এর মধ্যে একটা থলের নিচের অর্দ্ধেকটা বোঝাই করল ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকবো দিয়ে, উপরের দিকের বাকী অংশটা বোঝাই করল বাজার থেকে কিনে আনা কিছু স্বর্ণালঙ্কারে। তার পর পাঁচটি থলে নিয়ে গিয়ে সোজা হাজির হল ঐ রাজ্যের সব চেয়ে বড় বন্ধক-ব্যবসায়ী মাধব পোদ্দারের কাছে।

উঠানদম্‌দমি বলে, দেখ বাপু মাধব, সারা জীবনতো এই সব অপকর্ম করেই জীবনটা কাটল। ভাবছি, জীবনের শেষ কটা দিন একটু ধর্ম-কর্ম করে বেড়াব। তা' বাছা তোমার কাছে আমার এই পাঁচটি গয়নার থলে রেখে গেলাম। যদি কোন দিন দেশে আবার ফিরে আসি তখন এগুলি ফেরৎ দিও, আর না হলে সবই তোমার থাকবে—এই বলে যে থলেটায় স্বর্ণালঙ্কার ছিল সেই থলেটার উপর দিকটা খুলে দেখাল। মাধব হাত দিয়ে গহনার সোনা পরখ করে নিয়ে হাসতে হাসতে বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠানদম্‌দমির থলেগুলি নিয়ে নিজের সিন্ধুকে আটকে রাখে।

উঠানদম্‌দমি বেশ নরম স্থুরে বলে, তা' বাবা মাধব, কবে বাঁচি, কবে মরি, তার ত' কিছু ঠিক নেই, তুমি এক টুকরো কাগজে যদি লিখে দাও ক' থলে সোনা-দানা তুমি আমার কাছ থেকে গচ্ছিত রাখলে তা' হলে মরার আগে অন্তুতঃ মনে করব, আমার শেষ সম্বল কী কী ছিল।

উঠানদম্‌দমির কথায় মাধব আর দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজে বেশ স্পষ্টকরে লিখে দিল,—উঠানদম্‌দমির কাছ থেকে সে কয় থলে সোনা দানা গচ্ছিত রাখল।

একদিন, দু'দিন করে তিন দিনের দিন সকালে উঠানদম্‌দমি এসে হাজির মাধবের বাড়ি। বিনা ভূমিকায়ই সে বলতে থাকে, দেখ বাবা মাধব, কাশী যাওয়া আর হ'লনা। ভাবলাম, সারাটা জীবন যখন তোমাদের মধ্যেই কাটালাম, বাকী দিন কয়টাও আর তোমাদের ছেড়ে থেকে লাভ কি? বিদেশ বিভূঁই-এ শেষ সময় দেখবেই বা কে? তা' বাপু কি আর করা, সোনার গয়নার থলেগুলি সিন্ধুক থেকে বের করে দাও, একটু নয় মেহনতই হবে, আবার এগুলি বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাই—শেষের দিন ক'টা এই নিয়েই নাড়াচাড়া করি।

মাধবত' উঠানদম্‌দমিকে দেখেই চোখ কপালে তুলে ফেল্‌ল। সে এক-কথায় সব অস্বীকার করে বলে উঠ্‌ল,—কী বলছ যা-তা? আমার কাছেত তুমি কিছুই গচ্ছিত রাখনি—এই বলে উঠানদম্‌দমির মুখের উপরই তার দোকানের দরজাটা বন্ধ করে দিল। লোভের বশে তার দেওয়া রসিদের কথাও সে বে-মালুম ভুলে গেল।

উঠানদম্‌দমি সেই বন্ধ দরজার এপাশ থেকেই খানিকটা কাকুতি মিনতি করে সোজা গিয়ে হাজির হয় রাজ-দরবারে,—মহারাজ, দেখুন আপনার রাজত্বে এই মাধব বেনিয়া আমার মত একজন দুঃস্থ স্ত্রী-লোককে ফাঁকি দিয়ে তার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে। আপনি দেশের রাজা, আপনিই এই অন্যায়, অবিচারের প্রতিবিধান করুন—এই বলে খানিকটা মরাকান্না কেঁদে নিয়ে আঁচল থেকে মাধবের হাতের লেখাটা মহারাজের হাতে তুলে দেয়।

লিখন দেখে রাজা ত' চটে লাল,—এ ত' ভারী অন্যায়, একজন নিরাশ্রয় বিধবাকে ঠকিয়ে নেবার মত অপরাধ আর নেই।

মহারাজের আদেশে সেই মুহূর্তেই পিয়াদা গিয়ে বেঁধে নিয়ে এলো মাধব বেনিয়াকে। সঙ্গে করে নিয়ে এল উঠানদম্‌দমির সেই পাঁচটা থলে।

উঠানদম্‌দমি প্রথম থলে খুলে দেখে, তার সোনা-দানা সব ঠিকই আছে, কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় করে বাদবাকী থলেগুলি একটার পর একটা খোলে আর কপালে করাঘাত করে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বলে, দেখুন মহারাজ, বেনিয়ার পোর কাণ্ডকারখানা। আমাকে ঠকাবার জন্য এ-কি ফন্দি করেছে, এবার আপনিই এর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করুন।

ব্যাপার দেখে রাজা, মন্ত্রী, সভাসদগণ সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ব্যাপার দেখে সবচাইতে বেশী তাজ্জব বনে গেল মাধব বেনিয়া নিজেই। কিন্তু মহারাজ হুকুম করলেন, এই মুহূর্তে তার নিজের হাতের লিখনের মর্মানুসারে উঠানদম্‌দমিকে পাঁচ থলে স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে দিতে হবে, নতুবা এইরূপ তঞ্চকতার জন্য তাকে অবশ্যই শূলে যেতে হবে।

মহারাজের আদেশ শুনে এবং তার নিজের পরিণাম চিন্তা করে মাধব আর মুখে কিছু না বলে সুড় সুড় করে ঐ পাঁচটি থলে স্বর্ণালঙ্কারে বোঝাই করে উঠানদম্‌দমির হাতে দিয়ে নিষ্কৃতি পায়।

বাড়ি ফিরে উঠানদম্‌দমি ঠগনগরীর সঙ্গে পরামর্শ করে সেই স্বর্ণালঙ্কারের থলে পাঁচটি রাজপুত্র এবং চম্পকলতাকে উপহার দিয়ে বলে, জামাই, এই রইলো আমাগো আশীর্বাদ।

রাজপুত্র এবং চম্পকলতা ঠগনগরী এবং উঠানদম্‌দমিকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এইবার যাত্রা শুরু করে নিজের দেশের উদ্দেশে—যেখানে প্রতিনিয়ত উদগ্রীব হয়ে বসে রয়েছেন তার মা, বাবা, মন্ত্রী এবং সমগ্র দেশবাসী—তা'র প্রত্যাগমনের আশায়।

ঠিক এক বছরের মাথায় রাজপুত্র ফিরে এলো তার দেশে—সঙ্গে মাণিক্য এবং রূপসী চম্পকলতা।

পরম শুভক্ষণে রাজপুত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে চম্পকলতাকে গ্রহণ করল তার জীবনসঙ্গিনী রূপে।

।। কাব্য ।।

(এক)

(হারে) কাঞ্চনপুরেতে ছিল আদিশূর এক রাজ,
আটকুঁড়া নামেতে তার মোনে বাজে বিষম লাজ।
সেইনা রাজার এক পুত্র যদি হইল,
আটকুঁড়া নামও তার তবে যে ঘুঁচিল।
চারিদিগে বাদ্য বাজে মহা কোলাহল,
পচ্চিমা সাঁইনদারে তোলে শোরগোল।
শুভদিনে শুভক্ষণে নামকরণ করিল,
পরম সুলক্ষণা কুমার নামও যে হইল।
চান্দের মতন পোলা[1] যেমুনি কন্দর্পের কান্তি,
কুঁচের মতন ওষ্ঠ দেইখ্যা ভোমরার লাগে ভ্রান্তি[2]।
ম্যাঘের মতন কালা ক্যাশ দন্ত মুকতাপাতি,
সোনার বর্ণ রাজপুত্তুরে দেইখ্যা জুড়ায়
বুকের ছাতি।
ওগো এ হেন রাজার কুমারের নাম কন্দর্প থুইল,
জয় জোকার দিয়া নারী ঘরেতে তুলিল।
আইওগণ পান খায় জুইড়্যালয় গান,
দানছত্তর খুইল্যা রাজার বাড়িল গুমান[3]।
ওগো এই ভাবেতে ছ্যাখতে ছ্যাখতে
বচ্ছর চইল্যা যায়,
রাজপুত্তুরের কোন লক্ষণ কেউ
ছ্যাখতে নাই পায়।
ওগো রাজার পুত্তুর রাজপুত্তুর মিরগয়ায় যাইবে,

১। ছেলে ২। ভ্রান্তি=ভুল ৩। গৌরব

তবে তো দ্যাশের লোক রাজা বইল্যা মানবে।
সেইনা পুত্তুরে থুইয়্যা রাজা বোনে যাইবার চায়,
স্বভাব অভাব দেইখ্যা তার মোনে লাগে ভয়।
ভাবে, এই না পোলার কাছে রাজ্য যদি দেই,
একই দিনে অবে ফকির ঘটনা নিচ্চই।
ওগো এদিগেতে রাজপুত্তুর মুরুক্ষু কিন্তু নয়,
ঘরে বইস্যা গুরুর কাছে শেখে গোণনা সমুদায়।
এইমত পুঁথিপত্তর রাজপুত্তুর কত
পইড়্যা যে ফ্যালাইলো,
নাই তার ল্যাখাজোকা কত্তবা বলিব।
এক দিনেতে মহারাজ যুক্তি করে মুন্ত্রীর সহিতে,
রাজপুত্তুরে ডাইক্যা কয়, এবার রাজ্য নিতে অবে
কিন্তু বাপা শোন আগে, শোন দিয়া মোন,
ক্যামুন তুমি যোগ্যপাত্র হের দেহ বিবরণ।
এই না বইল্যা মুন্ত্রী কহিতে লাগিল,
সাত রাজার ধন এক মাণিক্য মোনেতে জানিও।
এই না মাণিক্য লইয়্যা কাছে তুমি
ঘুইরো দ্যাশে দ্যাশ,
এক বচ্ছুর পরে ইয়ারে লইয়া তুমি
ফিরো আপন দ্যাশ।
পথেতে জানিও বাছা ডাকাইত ভয়, রিপু ভয়,
জুজুর ভয় আছে.
ইয়ারে সাবধানে তুমি রাইখ্যো কাছে কাছে।
এই না পরীক্ষা দিলে তুমি রাজার যোগ্য হও,
না পারিলে মোনে লয় শিশু এখনও রও।
এই না বইল্যা মুন্ত্রী তহন মাণিক্য যে দিল,
গণোক রাজারপুত্তুর তহন পরস্থান করিল।

(দুই)

(হারে) চলিল রাজারপুত্র চলে পন্থ দিয়া,
দ্যাশ বিদ্যাশের পেরজাগণে
দ্যাহে চাইয়্যা চাইয়্যা।
সোনার বন্ন রাজার পুত্র সোনার চাহনি,
রবির কিরণে তার খসিল লাবণী।
যে বা দ্যাখে চাইয়্যা থাকে
ভাবে কাহার বাছনী,
সত্য কইর‍্যা কওনা কথা
অগো যাদুমনি।
ওগো দিনে দিনে রাজপুত্রের বন্ন অইলো কালো,
দেইখ্যা ধন্দ লাগে বুঝি ম্যাঘের আবডালেতে আলো।
ওগো এই ভাবেতে একদিনেতে
এক পুষ্কর্ণী দেখিবারে পায়,
জল তেষ্টায় কাতর হইয়্যা কুমার
ঘোড়া বান্ধিল যে হেথায়।
পুষ্কর্ণীর ঘটলা পাড়ে ফুট্যাছে চম্পা ফুল,
হেই দেইখ্যা রাজপুত্রের প্রাণ অইলো আকুল।
হায়রে অঙ্গ শেতল করতে যে যায়
কুমার কন্দর্প,
সেইনা ঘাটে বইস্যা রইছে দুশমন
এক দুর্দান্ত।
ভাল মুনিষ্যের মতন ঠসক[৪] মেইল্যা
রইয়্যাছে বইস্যা,
মাছ ধরনের আশায় যেন রইছে
কানী-বগা।

(৪) ভান করা

এই সব না দেইখ্যা কুমার গায়ের
পোশাক যে খুলিল,
তার ভিতরে সংগোপনে মাণিক্য রাখিল।
জলেতে লামিয়া কুমার করে সন্তরণ,
তেরছা ভাবে চাইয়্যা চোরা তার
খুলিল আস্তরণ।
শয়তানে মাণিক্য লুকাইয়্যা থোয়
মাটি চাপা দিয়া,
বস্তরের সাইত করে ইডাল[৫] চাপা দিয়া।
সিনান সাইর্য্যা রাজপুত্তুর পাড়েতে উঠিল,
চম্পাফুলের গোন্ধে তারে সগলি ভুলাইলো।
কিছুদূর গিয়া যহন রাত্রি আন্ধার অয়
বস্ত্রের ভাঁজের থিকা তহন মাণিক্য
লইতে মন লয়।
এই না ভাইব্যা কুমার যদি বস্তর খুলিল,
ইডাল চাকা এট্টা দেহিতে যে পাইলো।
মাণিক্য হারাইয়্যা কুমার তহন ভাবে মনে মন
ঐ না শয়তানে উহা কইর‍্যাছে হরণ।
রাজপুত্র কান্দি কয়, কোথা তুমি দয়াময়
এ কি বিষম করম লেখা।
আসিলাম বিদ্যাশেতে, ঘরে যামু শুধা[৬]হাতে
অসময়ে দিও তুমি দেখা॥
কান্দে কুমার উচ্চৈস্বরে, পশুপঙ্খী তুলিয়া শোরে
য্যামুন বাইস্যার জলধারা।
তরুলতা আদি যত, সবে কান্দে বিধিমত
কাইন্দা কাইন্দা অইলো সারা সারা।

---

(৫) ইটের টুকরো (৬) শূণ্য হাতে

ওগো এই ভাবেতে কিছুক্ষণ রাজপুত্রে যায়,
দৌড়া দৌড়ি কইর‍্যা ফেরে পুষ্কর্নীর ঘাটলায়।
পঙ্খী হেথায় পালাইয়্যা গ্যাছে
যেমুন গোলার ধান খাইয়্যা,
ভাঙ্গা ছিপ আর পোড়া আধার
রইয়্যাছে হেথায় পইড়্যা।
ঘাটলাতে বইস্যা কুমার তহন জুড়িল গোণনা,
গুণিয়া সন্ধান পাইলো শয়তানের আস্তানা।
রাজকুমার তৈয়ার হইয়া পূর্বদিগে যায়
সগল মুল্লুক আন্ধার হইয়্যা একই বাতি রয়।
সেইনা বাড়ির ফাঁকে কিছু আলো দেখা যায়,
ভাইব্যা চিন্তা কুমার ছ্যাখে এই কুটীরই হয়।
চুপি সারে রাজপুত্র ঘরের ছাঞ্চিতে(৭)যে গেল,
হোগলা পাতার ফোকর দিয়া দেখিতে লাগিল।
দেখিল রাজার পুত্র বেড়ার ফোকর দিয়া,
শয়তান শয়তানী জাইগ্যা রইছে
রামদাও হাতে লইয়্যা।
পীদ্দ্ম জ্বালাইয়্যা বইস্যা রইছে শয়তান দুর্দান্ত,
কিছুক্ষণ ঠাউরিয়া কুমার মোন করিল সিদ্ধান্ত।
কলাছোপের মইধ্যে বইস্যা কুমার বাঘের ডাক ডাকে,
খাটালে(৮)বইস্যা শয়তানীর ডরেতে বুক কাঁপে।
শয়তানী সুবচনী সোয়ামীরে কয়,
বাঘের ডাক শোনছ নাকি, শোন মহাশয়।
বাঘের গর্জন কিছু নিকটে শোনাইলো,
পীদ্দ্ম লইয়্যা সুবচনী খুঁজিতে লাগিল।
বাঘের সন্ধানে যেইনা শয়তানরা

(৭) ঘরের চালের বাড়তি অংশ (৮) ঘরের মাঝখানটা

বাইরেতে আসিল.
এই ফাক-কাডালে[১] রাজপুত্তুর
ঘরেতে ঢুকিল।
ঘরে ঢুইক্যা রাজপুত্তুর মাণিক্য হস্তে লইয়্যা
তাড়াতাড়ি বাইর হয় ঘরের মধ্য থিকা।
রাজপুত্রে দেইখ্যা শয়তান তহন কপালে
করে করাঘাত,
অবস্থা বুইঝ্যা সুবচনী রাজপুত্তুরের পিছে
দৌড়ায় সাথে সাথ।
বলে, কী কুক্ষণে আইলাম বাইরে
হারাইলাম মাণিক,
এই না বইল্যা দুইজনাতেই দৌড়াইলো খানিক।
যহন ছ্যাখে রাজপুত্তুর সেই ছ্যাশের
রাজপুরীতে ঢোকে,
চোরা চুন্নি দুই জনাতে নতুন ফন্দি আঁটে।
ফন্দি আঁইট্যা চুন্নি তহন কুমারেরে ডাকে,
কোথা যাও আমারে ফ্যালাইয়্যা
দুস্কুতে বুক ফাটে।
তোমার লইগ্যা আমি যে গো জীয়ন্তেতে মরা,
কীবা দোষে ছাইড়্যা মোরে করলা কপাল পোড়া।
তোমার লগে আমার পীরিত অইল অগঠন,
কচিগাছে গুঠলে যেমুন পড়িয়া মরণ।
আসমানেতে হাত বাড়াইলে শূন্য না লয় টাইন্যা,
পর কভু আপন না হয় হিয়ার মাংস দিলে ক্যাইট্যা,
ফুলের লগে ভোমরার পীরিত যেমুন
আগে বোঝা দায়,

(১) অবসরে

এক ফুলের মধু খাইয়্যা আর ফুলেতে ধায়।
শুন্যা এ-সব কথা, রাজপুরুষের লাগে ব্যাথা
মিষ্টভাষে জিজ্ঞাসে তখন।
রাজপুত্রে বলে চিন্তা কইরে, শুন রাজন কই তোমারে
সুদীর্ঘ বিত্তান্ত আমি কহিব এখন॥
উদায়াস্ত খাটি আমি, নাই আমার কোন সঙ্গতি
এই না দুঃখেই ছাড়লাম সুবচনী।
তবে যদি করুণা কর, আমার অন্তিম বাক্য ধর
সংস্থান কিছু করগো আপুনি।
শুনিয়া এসব বিত্তান্ত, রাজা করেন সিদ্ধান্ত
রাজপুরীতে করে হেরগে বাসস্থান নির্দেশ।
এই রূপেতে দুইজনাতে পুরীমধ্যে থাকে যেন সুখে দম্পতিতে
কথা কেহ কারও সঙ্গে না করে বিশেষ।
এই ভাবে কিছুদিন দুইজনাতে রয়,
রাত্তিরেতে চোরা আইস্যা আড়ি পাতন ছায়।
রাজপুত্র দিবাভাগে কার্য করে রাজসভাতে,
হারারাত্তির কাটায় শুইয়্যা পালঙ্কের উপারে।
হারে এক দিন, দুই দিন, কত দিন না জানি,
নিশি রাইতে চোরা আইয়্যা চুন্নীরে দেয় খিঁচুনী[১০]।
জাইত গ্যাল, মান গ্যাল, কুলে রইলো খোঁটা,
এতদিনে না সজুত[১১] করতে পারলি
তিন আঙ্গুইল্যা এক বেটা।
সগ্ গল কথা ভাল মতে বোঝালাম মুই এহন,
মোর ডে মিথ্যা কইয়্যা ভুইল্যাছ সোন্দর বদন।
(ওগো) এই না অবসরে রাজপুত্র চারিদিগে চায়,
পালঙ্ক ত্যাজ্য করি পবন বেগে ধায়।

(১০) বকুনী। (১১) জব্দ

দূরের থিকা দেইখ্যা চোরা তহন
পেছন পেছন ধায়,
রাজপুত্রে হেতক্ষণে গাঙের ঘাট পৌঁছায়।
গাঙপাড়েতে একখান নাও রইছে পাড়ের কিনারে,
উথালী গাঙের জলে পাটনীতে ডর করে।
কুমার কয় মাঝি ভাই, তুমি মোর ধর্ম-ভাই
পার কইর‍্যা মোর প্রাণ রক্ষা কর।
এবে মুই দরিদ্র বটে, কিন্তু কিছু দিব হস্তে
লও আমার অঙ্গুরী সুন্দার।
অঙ্গুরীর সোনার লোভে, পাটনী তহন নৌকা খোলে
স্রোতের টানে নাও চল্ল অনেক দূর।
গাঙপাড়ে আইস্যা চোরা, ফনি যেমুন মনিহারা
কান্দিতে লাগিল বহুতর।
কহনো জলেতে নামে, কহনো বা জমিনে ছোটে
রইয়্যা রইয়্যা বক্ষে করে করাঘাত।
চুন্নীরে কিলাইলো বহু, ক্রোধ নাহি পরে তবু
মস্তকে হইলো যেন বজ্রাঘাত।
উন্মত্ত হইয়্যা শয়তান, স্রোতেতে দিল যে ভাসান
অকূল দিশে গ্যাল তলাইয়্যা।
পূবেতে উদিল ভানু, ফুকরাইলো[১২] রাখাল বেণু
রাজপুত্র উৎরাইলো অপর তীরে।
হইয়্যা বসন বিবসনী, ঘরে চলে সুবচনী
কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃ স্বরে।

(তিন)

(হারে) ডাঙ্গাতে নামিল কুমার ডিঙা নৌকা ছাইড়্যা,

---

(১২) বাঁশী বাজান

কোন্ দিগে যাবে এবার ভাবে খাড়াইয়্যা।
পূবদিগালে শুধুই বালি করে হাহাকার,
জন প্রাণী কিছু নাই, নাই পারাবার।
সেই না পথ ত্যাজিয়া কুমার উত্তার দিগে যায়,
দূরের থিকা বাঘের ডাক কাণে শোনা যায়।
অগো পচ্চিমে সাগর ছিল দেইখ্যা ছিল আগে,
সগল দিগ থুইয়্যা কুমার দেখে দক্ষিণ ভাগে।
অগো দক্ষিণে সড়ক ছিল পাক্কা দালান কোঠা,
এই না পথে গ্যালে পরে বাঁধবে না আর ল্যাঠা।
ইতি উতি ভাইব্যা কুমার চলিতে লাগিল,
কিছু দূরে গিয়া এক দৃশ্য যে দেখিল।
অগো পন্থ রইছে মুনিষ্যি নাই এ বা ক্যামুন ছাশ,
আজব নগরের কথা বলি শুনহে বিশেষ।
অগ পন্থ পাশে শ্বেত পাথরের পুরী এক ছিল,
তার লামায় এক দৃশ্য কুমার দেখিবারে পাইল।
অগো সাতবাই বিষম ডাকাইত মধ্যে এক বুইন,
সেই না বুইন ছিল যে গো বিষম গুণীন।
অগো হেই বুইনেতে গুইণ্যা কয় পথিকের খবর,
পলকে বান্ধিয়া তারে আনে পুরীর ভিতর।
অগো পরাণ বধিয়া তার ফ্যালাইয়্যা দেয় জলে,
এই না ভাবে সাতবাই এক বুইনের দিবারাত্র চলে।
অগো হেই কারণে সেই নগরে মুনিষ্য না রয়,
রাজকুমারের জানিয়া উয়া লাগিল বিস্ময়।
অগো হেইনা কইন্যার নাম ছিল চম্পকলতা,
চম্পাফুলের মতন গঠন গইড়্যাছে বিধাতা।
অগো সব্ব অঙ্গ সুন্দার কইন্যার চৌক্‌খে বিজলী খেলে,
চম্পকলতার রূপ দেইখ্যা রাজপুত্রে ভোলে।

৩

অগো হেইনা দিকে চাইয়্যা কুমার কয় মধুর ভাষ,
চান্দবরণ কইন্যাগো তোমার ম্যাঘ বরণ ক্যাশ।
কী বা তুমার নাম গো কইন্যা কোথায় তোমার দ্যাশ ॥
অগো ফুলের মতন সুন্দর কইন্যা রূপেগুণে অতি ধইন্যা,
তোমার নাকি হইয়্যাছে গো বিয়া।
কাহার শাপেতে তুমি আইস্যাছ এ মর্তভূমি
তোমার দুঃখে ফাটে আমার হিয়া।
অগো পদ্মের মতন বদন তোমার তাহে জোড়া ভুরু,
কিবা তোমার নরম দ্যাহ কলার মত উরু (কন্যা হে)।
চান্দ বরণ তোমার কইন্যা রূপের নাইকো তুলা,
বিদ্যাশী পথিক মুই দ্যাহ নয়ন মেইল্যা (কন্যা হে)।
অগো তেলাকুচার মতন ওষ্ঠ চৌক্‌খে মাণিক জ্বলে,
তোমার লগে মিলন অইলে ডুইব্যা মরতাম জলে (কন্যা হে)।
অগো মিষ্ট তোমার মুখের হাসি দন্ত মুকতা পাতি,
তোমারে না পাইলে আমার ফাটে বুকের ছাতি (কন্যা হে)।
অগো বিদ্যাশী নাগর মুই বদন তুইল্যা চাও,
অধরে অধর থুইয়্যা রসের গীত গাও (কন্যা হে)।
অগো এই না কথা কইয়্যারে কুমার
যেই চলিতে লাগিল,
চম্পকলতাও হেইও দণ্ডে ভাইয়েদের ডাকিল।
শোন দাদা কই তোমাগো ধাওয়া কর ওর পিছে,
হাত[১৩]রাজার ধন এক মাণিক্য আছে উয়ার কাছে।
উপার দেইখ্যা সগল সোমায় স্বরূপ বোঝা দায়,
কালা কুকিলের মিষ্টস্বর যেমুন ভুবন ভোলায়।
দীন ভিখারীর ব্যাশে গ্যাল যে পথিক,
উয়ার তুল্য সেয়ানা জাইন্যো নাইকো অধিক।

---

(১৩) সাত

শীঘ্র কর অগ্রজ দল চলগো সত্বর,
উয়ারে আনিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।
এই বার্তা না শুইন্যা সাত ভাই অশ্বপৃষ্ঠে চাপে,
পায়ের চাপে ধূলা ওড়ে ভয়ে মেদিনী কাঁপে।
শব্দ শুন্যা রাজপুত্র তহন গোনে মনে মন,
কিছু দূরে গিয়া তহন সাজে এক ব্রাহ্মণ নন্দন।
অগো পুরোহিতের লক্ষণ নিয়া রাজপুত্রে চলে,
নিকটে ঘনাইলে শয়তানে এড়াইল ছলে।
ব্রাহ্মণেরে বলে, ঠাকুর, কও দেহি সত্বর,
এই পথে নি দেইখ্যাছ এক নবীন সওদাগর।
চিন্তিতের ভান কইর‍্যা ঠাকুর মাথা নাইড়্যা কয়,
উল্টা পথ দ্যাখাইয়্যা তারগে সত্বর রওনা হয়।
অগো বাঘা লড়াই লাইগ্যা গ্যাল দুই
গুণীনের মইধ্যে,
চম্পালতা রাজপুত্রে কেউ কারো না মান্যে।
সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি কলিতে বিদ্যমান,
ঘোরাঘুরি কইর‍্যা ফেরে ডাকাইত সাত প্রধান।
শুধা হাতে ফেরতে দেইখ্যা চম্পালতা বলে,
ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে সেই পথিকেই চলে।
যাও দাদা শীঘ্র করি ধর তার পাছ,
এহনও না সে পৌঁছিয়াছে ভীল রাজার কাছ।
অগো ময়নামতী বনের মইধ্যে রাজপুত্রে চলে,
কিছুদূর গিয়া কুমার সন্দে চৌখ খোলে।
তামাম মুল্লুক ধূলা উড়াইয়্যা সপ্ত অশ্ব আইসে,
মুহূর্তে গোণনা কইর‍্যা রাজপুত্রে বৈদ্যের বেশে হাসে।
অশ্ব হইতে নাইম্যা সাত ভাই জিজ্ঞাসে তহন,
কোন্ বা পথে গিয়াছে ঠাকুর কও ত' বিলক্ষণ।

মায়া হাসি হাইস্যা কুমার উল্টা দিক দেখায়,
কিছুদূরে গিয়া পুনঃ বৈসে গোণনায়।
ঠাকুরে না পাইয়্যা সাত বাই, ফির্যা আসে বুইনের ঠাঁই
ধপাস্ কইর্যা বসিল ভূমেতে।
শুধা হাতে ফেরতে দেইখ্যা, চম্পালতা ওঠে জ্বইল্যা
নিজে ওঠে অশ্বের পৃষ্ঠেতে।
রাজপুত্র গোণনা করে, প্রাণ কাঁপে থরে থরে
কালনাগিনী আইস্যাছে দংশিতে।
পবন বেগেতে ধায়, রাজপুত্র চইল্যা যায়
উছাট(১৪)খাইয়্যা পড়ে পথের মইধ্যে।
উদ্ধশ্বোয়াশে কুমার দৌড়াইতে লাগিল,
পিছানেতে কালনাগিনী নিমেষে হেরিল।
অগো ক্ষুধায় কাতর কুমার চলিতে না পারে
আউল্যাইন্যা শরীরে কুমার সীমানা উতারে।
অশ্ব হইতে নাইম্যা কইন্যা চলে পাছে পাছে,
অবশাস্ত রাজার কুমার ঢোকে চৌহদ্দির মাঝে।
অগো ভীল রাজার গৌরব কত নেখা জোকা নাই,
গৌরবে বসতে দিল দুই জনায় দুই ঠাই।
কইন্যা বলে রাজা তুমি সগলেরই পিতা,
তোমার দুহিতা সম মুই চম্পকলতা।
শিশুকালে দিল বিয়া বাপে আর মায়,
আবাগী চম্পারে আজি তার সোয়ামী ক্যান ছাইড়্যা যায়।
সূরয ছাড়া আসমান ছ্যাহ সদাই যে আন্ধারা,
যৈবন কালে নারীর পতি পুষ্পের ভোমরা।
উথালী তরঙ্গ নদীর তাতে যৈবন তরী
অসময়ে ছাইড়্যা গ্যালে কে-অইব কাণ্ডারী।

(১৪) হোচট খাওয়া।

অগো আমার যৈবন আইজ ধইর‍্যাছে জোয়ারে,
এই পানি শুকাইলে ছ্যাখো আরত নাই সে ফেরে।
যাইওনা যাইওনা বলি কান্দে চম্পকলতা,
অগো এমন নিষ্ঠুর প্রাণ গইড়্যাছে কোন্ ধাতা।
অগো সোনা নয় রূপা নয় যে অঙ্গেতে ধরিব,
পরাণের পরাণনাথ বক্ষেতে রাখিব।
কুমারের বে-খেয়ালের আশায় রাইত জাইগ্যা কাটায়।
অগো রাজার কুমার শুইয়্যা আছে পালঙ্কের উপরে,
চম্পালতা আইয়্যা বইসে কুমার পদতলে।
অগো দেইখ্যা দেইখ্যা চম্পার চৌক্ষে আসে জল,
ভাবে উয়ার না দাসী অইলে মোর জনম বৈফল।
অগো কোন্ বা ছ্যাশের রাজার কুমার কোন্ বা ছ্যাশে ঘর,
কিয়ের লইগ্যা কুমার তুমি অইলা দেশান্তর।
ক্যামুন তোমার মাতা, পিতা ক্যামুন তাদের হিয়া,
কোন্ আবাগী মায় দিছেরে ছাইড়্যা, পঞ্চ প্রাণ দিয়া।
সূরয বরণ তোমার কুমার রূপে মাণিক জ্বলে,
তোমার লগে মিলন অইলে নামিতাম পাতোলে।
যে দিন দেইখ্যাছি কুমার তোমার সোন্দর মুখ,
হেওই থিকা জ্বইলা মইলাম য্যান অগ্নির আগে ধূপ।
পুষ্পের মতন তোমার ছ্যাহ গায়ে পদ্ম গন্ধ,
কোন্ পরাণে মুইবা তারে করিবরে মন্দ।
স্বজন বন্ধু, সহায় সম্বল, রইয়্যাছে খাড়াইয়্যা,
ক্যামনে লইমু মুই মাণিক্য ছিনাইয়া।
শিশুকালে মৈল মাতা নামে কনকলতা,
কৈশোরে হারাইলাম পিতা, মুই সদাগর দুহিতা।
যৈবনে শিক্ষা করলাম গোণনা জ্যোতিষী,
হেইও থিকা অইলাম আমি মানুষের সর্বনাশী।

বাই সাত আছে মোর বাণিজ্য না করে,
বেনিয়ার নন্দন হইয়্যা দস্যুগিরি করে।
অগো হেইনা দস্যু-দলের মুই অংশ ভাগী,
যৈবনে না দিল বিয়া মুই বড় আবাগী।
দিনে রাইতে গুণি বাছি কইয়্যা দেই মুই,
ডাকাতী কইর‍্যা আনে মোর সাত বাই।
অগো খটাখট্ শব্দ ওঠে কাননের মাঝারে.
ঘোড়ায় চাইপ্যা চম্পার ডাকাত বাইয়েরা আসে।
সাত বাই আইয়্যা খাড়ায় ঘরের আইলসা ধইর‍্যা,
চৌক্ষু মুইছ্যা চম্পালতা হাসতে থাহে কুশল প্রশ্ন কইর‍্যা।
বড়বাই রাইগ্যা কয়, তুমি আমার বুইন,
কীয়ার লইগ্যা মাণিক্য লইতে করলা এত গৈণ।
মাইজ্যাবাই তেইজ্যা কয়, বুইঝ্যাছি এহন,
সোন্দর বরণ বদন দেইখ্যা সব অইয়্যাছি বেস্মরণ।
তিন দিন সোমায় দিলাম সাইঝাগা বাই কয়,
বৈফলে তুইও পরাণ বধিব নিচ্চয়।
নোয়াবাই বিনয় হইর‍্যা কয়, শোন্ বোন,
বড়র লগে ছোডর পীরিত অয় অগঠন।
রাঙাবাই জোর দিয়া কয়, ছাড় ওসব কথা,
বিছাশী পথিকের লইগ্যা কীয়ের মাথা ব্যাথা ?
রূপাবাই বলে, বুইন, সার বুঝ বুইঝো,
ফাঁক পাইলেই পথিকের পরাণ বধিও।
এই না কথা শুইন্যারে চম্পার চৌক্ষে আসে জল,
ভাবে, বাঘেরডে কিরপা চাইলে
না অয় কোন ফল।
কুট্টি বাই[১৫] ডাক দিয়া কয়,

(১৫) কনিষ্ঠ—সকলের ছোট ভাই

তোমার অশ্ব রইলো কাননের ভিতর,
বধিয়া এই পথিকে তুমি পালাইও সত্বর।
এই না কথা কইয়্যা রে সাতবাই চইল্যা যে গ্যাল্,
শূন্যে চাইয়্যা চম্পকলতা কান্দিতে লাগিল।
অগো কান্দিতে কান্দিতে গ্যাল পরথম রজনী,
দ্বিতীয় রজনী শেষে চম্পা ভাবিল তখনি।
এই না বাল [১৬] সোমায় কুমার সুখে নিদ্রা যায়,
এমন সোনার অঙ্গে আঘাত মুই
ক্যামনে করমু তায়।
অগো দরিয়ার মাঝারে যেমুন চরের বসতি,
আবাগী চম্পার তেমুন রাজপুরীতে থিতি।
কু-কার্য না করিলে সাতবাই মোর বধিবে পরান,
বৈফলে কুমারের কাছে অইবে অপমান।
আমি কী করমু কোথায় যাইমু ভাইব্যা নাই পাই,
কুমারের রূপে মইজ্যা এহন ঠ্যাকলাম বিষম দায়।
অগো সাক্ষী রইও চান্দর সূরয, সাক্ষী রইও দেওতা,
এমন বৈষম কালে কোথায় রইলেন
মোর মাতা পিতা।
সগ্‌গের দেওতা বন্দি, বন্দি, তার গো পায়,
কুমারের বধের ভাগী কইরো না আমায়।
(হারে) এই কথা না ভাইব্যা চম্পা পালঙ্কে উঠিল,
নাকে হস্ত দিয়া কুমারের নিঃশ্বাস ঠাউরাইলো।
অগো অসাড়ে ঘুমাইয়্যা রইছে রাজার কুমার,
পাছে কিছু ট্যার পাইলে দিবে ছাড়ে খার।
ভাইব্যা চিন্তিয়া চম্পা তহন ছুরি নিল হাতে,
এক ফোঁটা চৌক্ষের জল পরলো কুমারের মাথে।

---

(১৬) ভাল সময়

জলের পরশে কুমার জাইগ্যা যে উঠিল,
হস্ত ধরিয়া চম্পার কহিতে লগিল।
অগো বাপু সরল মেয়ে কী কারণে বধিছ আমায়,
সাত রাজার ধন এক মাণিক্য লইয়্যা আমারে বাঁচাও।
অগো নারীকুলে জন্ম নিয়া নারীত্ব না পাইলা,
কী বা দোষে মোরে তুমি বধিতে আসিলা।
এই লও মাণিক্য, তুমি দূর হইয়্যা যাও,
হারা জনম বইয়্যা বইয়্যা চুরির ভাত খাও।
এই কথা না বইল্যা কুমার মাণিক্য যে দিল,
হেয়াতে চম্পার দুঃখু অধিক আরও অইলো।
অগো আউলাইয়্যা মাথার বেণী লোটাইয়্যা ভূমিতলে,
উথালি পাথালি কান্দে চম্পা কুমার পদতলে।

বন্ধুহে, অ বন্ধু তুমিনি আমার প্রাণ,
সে কোন্ লগ্‌গনে, দেহিলাম তোমারে
হারাইলাম জাত কূল মান।
যহন দেহিলাম আমি, ও চান্দ বদন খানি
মনপ্রাণে অইলাম তোমার দাসী।
আবাইগ্যা নারীর প্রাণ, করে সদা আনছান্
মদনের বানে গলে পড়লাম ফাঁশী।
বন্ধুহে, অবন্ধু আর কি ছাড়িয়া দেব।
এ-বক্ষ চিড়িয়া, পদদাসী হইয়্যা
হিয়ার মাঝারে থোব॥
ও চান্দবদন, সদাই দেখিব
আর না চাহিব কিছু,
তুমি যথা যাও, দাসী তথা ধায়
তব চরণের পিছে পিছে।

কাননে যাইলে, দাসী আগে যাবে
কণ্টক তুলিতে হাতে,
বিপদ আসিলে, দাসী আগে রবে
তোমারে রাখিবে পিছে।
মোর যত অপরাধ, ক্ষমা কর নাথ
আর কিছু নাই চাই।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে
তোমারেই যেন পাই॥

এই কথা না কইয়্যারে চম্পা কান্দিতে লাগিল,
কান্দিতে কান্দিতে তার দুঃখু অনেক হইলো।
বলে, শোন প্রভু কই তোমারে মিথ্যা কিছু নয়,
চরণে বঞ্চিলে আবাগী পরাণ ত্যাজিবে নিচ্চয়।
এই না বইল্যা কন্যা ছুরি তোলে আপন শরীরে,
হেয়া দেইখ্যা রাজকুমার খপ্ কইরা হের হস্ত ধরে।
কুমার বলে, শোন কইন্যা শোন দিয়া মোন্,
কী কারণে এ অমূল্য জীবন ত্যাজিবে এহন।
বাই বন্ধু তোমার সাত আছে গো আশ্রয়,
তুচ্ছ এই মাণিক্য লইয়্যা সুখে ঘরে যাও।
ম্যাঘের লগে চাঁদের আসনাই [১৭] কতকাল রয়,
ক্ষেণে দেহি তামাম আন্ধার, ক্ষেণেতে উদয়।
অতি-বুদ্ধি নারীর লগে পীরিত শ্যাষে জ্বালা ঘটে,
জিহ্বার লগে চান্দের পীরিত আর ছলেতে কাটে।
যা চাইছ, তাই পাইছ, আর কি-বা চাও,
সামনের থিকা তফাৎ গিয়া মোরে পরাণে বাঁচাও।
চম্পা কয়, শোন কুমার, শোন আমার কথা,

(১৭) ভালবাসা=পীরিত

তোমার সাক্ষাৎ ত্যাজিব পরাণ এই শেষ কথা।
অগো অবলা রমণী-জাতি চির পরাধীন,
কৈশোরে পিতার, পরে যৈবনে সোয়ামীর,
বার্ধক্যে পুত্রের, কভু সে না অয় স্বাধীন।
অবলা রমণীর যদি স্বল্পবুদ্ধি অয়,
গুণবান হয়্যা তুমি ক্ষেমা কর তায়।
পুরুষ তমাল-তরু প্রেম অধিকারী,
নারী যে মাধবীলতা আশ্রিতা তারই।
মুইতো অবলনারী তরুর বুকে লতা,
শেষ আশ্রয় দিয়া তুমি ঘুঁচাও মনের ব্যথা।
মুই বটে অবাগিনী জনম দুঃখিনী,
পিতা মাতা দেবতুল্য তাদের কথা মানি।
হেই নামেতে কীরা[১৮] কাইট্যা তোমারে জানাই,
ঐ-চরণ ছাড়া মোর গতি আর নাই অন্য ঠাঁই।
কুমার বলে, শোন ওগো বাণিয়ার নন্দিনী,
তোমারে করমু বিয়া ফিরয়া গ্যালে রাজ্য রাজধানী।
এই বেলা স্থির কর পালাবার উপায়,
কাইল নিশিথেই আইয়্যা পড়বে তোমার সাত বাই।
কৌশলে মাণিক্য লইয়্যা যদি ঘরে ফেরতে পারি,
হেইও কালে পত্নী বইল্যা তোমায় মান্য করি।
অগো সতী-নারীর কথা কত আছে যে পুরাণে,
কৌশলে রক্ষিয়া মোরে বাঁচাও ধনে প্রাণে।
চম্পা কয়, শোন কুমার, শোন খাঁটি কথা,
এহনথিকা ইয়ার লাইগ্যা কইরো না মাথা ব্যাথা।
আইজ নিশি পোয়াইলে কাইলকের কথা কইও,
রাত্র এহন শ্যাষ অইল পালঙ্কে সুখে নিদ্রা যাইও।

(১৮) প্রতিজ্ঞা

অগো পরদিনেতে নিশি রাইতে চম্পা স্থাহে চাইয়্যা চাইয়্যা,
সাতবাই আইত্যাছে বেগে তেজী অশ্বে চাইপ্যা।
হেইনা দেইখ্যা চম্পা তহন মন করিলা স্থির,
মস্তকের বুদ্ধি কিছু করিল বাইর।
তড়াতড়ি কইর‍্যা দুজন কাননেতে যায়,
পাছে পাছে সাতবাই সামনে আইয়্যা খাড়ায়।
কুমারেরে রাইখ্যা চম্পা নিজের অশ্বের ধারে,
নিজে সে দৌড়াইয়্যা আসে পরিজনের কাছে।
অগো ছলা কলা জানে কত বেনিয়ার নন্দিনী,
পরিজনে ভক্তিমতী কৌশলে সাপিনী।
বাই-বন্ধুরে ডাইক্যা কয়, তোমরা খাড়াও এই হানে,
রাজকুমাররে লইয়্যা গ্যালেই পিছু ধাইও ততক্ষণে।
অগো পিরিতি আটন, পিরিতি বাটন,
পিরিতি গলার হার,
পিরিতি কইর‍্যা যে-জন গো মরে সফল জনম তার।
অগো চম্পার বাক্যে সাতবাই তহন কাননে লুকাইলো,
একখান দৌড় দিয়া চম্পা সাত বাইর অশ্বের পায়ের রগ
কাইট্যা যে দিল।
অগো পায়ের রগ কাইট্যা দিলে অশ্ব দৌড়াইতে না পারে,
কৌশলে হারিয়া [১৯] কাম [২০] ফেরে নিজের অশ্বের ধারে।
চম্পা কয়, শোন কুমার বিলম্ব ক্যান কর,
মোরে লইয়্যা এইদণ্ডে স্থাশে যাত্রা কর।
ইতি উতি ভাবে কুমার মুখে কিছু নাই বলে,
মোনেতে ভাবনা করে পাছে কিছু ঘটে।
কুমারের ভাবনা দেইখ্যা চম্পা নিজেই ওঠে অশ্বপৃষ্ঠে,
কুমার চম্পায় দুই জনায় সমুখ পানে ছোটে।

(১৯) শেষ করিয়া (২০) কার্যে

কতদূরে গ্যালে অশ্ব ডাকাইত দল আইসে
নিজের অশ্বের ধারে,
যার যার অশ্বে চাইপ্যা চালায় সেই পথে।
অগো বিধির নিব্বন্ধ দেখ ওগের অশ্ব নাই চলে,
পাথারে ফ্যালাইয়্যা গ্যাছে ডাকাইত সাত বাইরে।
হায়, হায় কইর‍্যা সাত বাই মুখে পাড়্‌লো গালি,
আমাগের লগে দুশমনি হরলি
তোর কপালে পড়বে ছালি।[২১]
পাগোলের মতন সাত বাই দৌড়াইলো
বনের ভিতার,
হারাদিন ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা ফেরে নিজের ঘর।

(চার)

খটাখট্ শব্দ ওঠে জমিনের উপর,
ঘোড়ায় চাইপ্যা রাজার কুমার চলে নিরন্তর।
কত না ত্বাশ, কত না নদী, কানন প্রান্তর,
একে একে পার অইলো মাঠ তেপান্তর।
মাঠের পর মাঠ ভাইঙ্গা চলে দুইজনা,
যেন সোনায় আর সোহাগায় মিশ্যাছে
একস্তর হইয়্যা।
অগো চলিতে চলিতে চম্পা ক্ষুধায় কাতর অয়,
বলে, অগো কুমার, এইবার এইহানে বিশ্রাম কিছু লও
অগো তিয়াষে কাতর কুমার চলিতে না পারে,
খানিকদূরে ছোনের ঘর একখান দেখিবারে পারে।
চম্পা গুইণ্যা কয়, এ বাড়িত বালো নয়,
ঠগনগরী, উঠানদম্‌দমির বাড়িত নিচ্চয়।

---

(২১) ছাই

অগো ঠগনগরী আর উঠানদম্‌দমি,
তানাগো ডরে কাঁপে তামাম মর্তভূমি।
ঠগনগরী ডাইনী বুড়ি, বয়স আশী নব্বই,
উঠানদমদমি আরেক ডাইন ছোড বুইন হেরই
তুইজনাতে থাহে একস্তর কাঁচা রাড়ী থিকা,
বয়সের নাই গাছ-পাথর বাঁইচ্যা আছে,
ক্যাবল লোক ঠকাইয়্যা।
অগো ঠগ ব্যবসা জানে ভালো ঠগনগরী বুড়ি,
সগ্‌গ মত্ত পাতালেতে মেলবে না হের জুড়ি।
উঠানদম্‌দমি কাইজ্যা হরে তিষ্ঠাইতে না ছ্যায় কাক,
ছ্যাশে মরক আইলে পরে হেরে দেয় ডাক।
অগো এইনা দোনোজনার বাড়ি ক্যাবল
নিকটে না দেইখ্যা,
চম্পা কুমার দোনোজনায় আইলো হেথায়
উপায় না পাইয়্যা
দুরেরথন দেইখ্যা ঠগনগরী উঠানদম্‌দমিরে কয়,
নিলক্ষীর চরে আইলো কেডা গতিক বালো নয়।
দম্‌দমি কয় শোনলো বুইন একখান কথা কই,
শুকনা গাছে যহন ফোটছে ফুল
ওনারা ছ্যাবতা নিচ্চই।
নিকটে ঘোনাইয়্যা চম্পা তহন গণে মনে মন,
মাসি, মাসি ডাক ছাইড়্যা তুইওজনার
মোন ভিজাইলো তহন।
শোনগো শোনগো মাসি কইযে তোমাগো,
হগ্‌গল কর্ম থুইয়্যা এহন দেহগো আমাগো।
ঠগনগরী বাইরাইয়্যা কয়, শোন্ বড় মাইনষের ঝি,
হাচা কথা কও দেহি ক্যামুন তুমি বুইনঝি।

হস্ত গুইন্যা চম্পা কয় হাইস্যা হাইস্যা,
উজানী নগরে অইছিলো বিয়া
তোমার দিদি আমাবইস্যা।
অগো অমানিশার মতন বরণ কালো জননীর আমার,
হের কাছে শুইন্যাছিলাম তোমাগের সোমাচার।
দশখান বচ্ছর অইলো গত জননী মোর নাই,
হেই কারণে মাসি তোমারগে চরণ-ছায়া চাই।
ভাইব্যা দেখগো মাসি খাও আমার মাথা,
লগে কইর্যা আইন্যাছি তোমারগে জামাতা।
উঠানদমদমি চিন্তা হইরা কয়, বুইন ঠিক,
কুটুম্বের মাইন্য রাখা চাই, বাইরহ' একদিক।
ঠগনগরী হাইস্যা কয়, আইসো আইসো বুনঝি,
দিদি মরছে কী অইছে আমরা আছিনি ?
এই কথা না কইর্যারে ঠগী রাস্তাতে চলিল,
চলিতে চলিতে এক ফিকির ঠাওরাইলো।
অগো সেই না ছ্যাশের রাজার কুমার
বিয়া করতে যায়,
ঠগনগরী হেই রাস্তায় এক মরা-পোলা
কোলে নিয়া করে হায় হায়।
ঠগী কয়, রাজার পুত্তুর বড় মাইনষের বেটা,
দুঃখিণীর লাতী মাইর্যা বাধাইলা এক ল্যাঠা।
মরা পোলা লইয়্যা ঠগী যায় রাজার নিকটে,
সভার মইধ্যে গিয়া কয় কান্দিতে কান্দিতে।
শোন শোন ধরম-বাপ, পাইলাম বড় মনস্তাপ
অকালে হারাইলাম লাতি-ধনে।
অবোধ লাতী আমার, নাই দোষ কিছু তার
কী কারণে বধিলো তাহারে।

উন্মত্ত হইয়্যা সুখে, নাহি দেখে দীন-দুঃখে
অকস্মাৎ ফেলিলো ভূতলে।
তুমি রাজা কই তোমারে, বিচার কর বিধিমতে
বক্ষজোড়া করগো আমারে।
শুইন্যা ঠগীর কথা, চিন্তিত হইয়্যা রাজা
বলে লও সহস্রেক মুদ্রা।
লইয়্যা সুবর্ণ ধনে, ঠগী ফেরে নিজ ঘরে
মুখে জানায় দুঃখের বারতা।
অগো কয়দিন কাটলো ভালো রাজার দৌলতে
চম্পা কয়, বিদায় দ্যান গো মাসি
ঘরে ফিরমু যে এহনে।
উঠানদমদমি উইঠ্যা কয়, কথা কিন্তু ঠিক,
আর কয়দিন থাইক্যা মাইয়্যা যাইও খুশী যে-দিক।
উঠানী কয়, ঠগীরে বুইন ব্যাভার কিছু আন,
লোক-সমাজে হে নাইলে থাকবে না আর মান।
উঠানীর কথায় ঠগি পাঁচ থুতি চাড়া[২২] যে আনিল,
হের ভিতর এক থুতিতে খানিক সুবর্ণ যে থুইলো।
অগো শয়তানীতে জুড়ি নাই ঠগীর মতন,
পাঁচটা থুতি লইয়্যা আসে বেনিয়ার ভবন।
হেইনা গেরামেতে ছিল এক মাধব বাইন্যা,
তার থানে ঠগী সোনার বস্তা দিল যে থুইল্যা।
কাঁচা সোনার বন্ন দেইখ্যা বাইন্যার
জেহ্বায় আইসে জল,
সুযোগ বুইঝ্যা ঠগী তহন জুড়িল কৌশল।
ঠগী কয়, শোন বাই, হাচা কথা কই,
বয়সও অনেক অইলো, এবার তীথ্থ করবার চাই।

(২২) মাটির হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গা টুকরো গুলি।

এ গেদে তোমার নাহান যুধিষ্ঠির আর নাই,
ফিরা না আসা পর্যন্ত খুতি পাঁচটা
রাইখ্যো আমার বাই।

অগো লোভে পাপ, পাপে মিত্যু
সগ্‌গল লোকে কয়,
ঠগনগরীর ফ্যাঁরে পইলো
বাইন্যা মহাশয়।

ঠগীর কথায় মাধব তহন
খুতি পাঁচখান লইয়্যা,
একখণ্ড ভোজপাতে[২৩] হেরে
দিল যে লেইখ্যা।

অগো একদিন, দুইদিন, তিন দিবসের প্রাতে,
ঠগনগরী আইস্যা কয় বানিয়ার কাছে।
শোন বাপু মাধব পোদ্দার বড় দুঃখে কই,
তীর্থ-ধর্ম আর অইলো না, রোগে মইর‍্যা যাই।
জীবনে আর যে কয়দিন বা বাঁচি,
বাসনা আছে হেই কয়দিন
তোমাগের কাছেই থাহি।

শোন বাপু, এইনা ব্যালায় খুতি পাঁচটা ছাও,
তোমার ল্যাখা ভোজপাত তুমি ফেরৎ নাও।
ঠগীর বাক্যেতে মাধব তহন টালুমালু ছাহে,
কৌশলে ঠগীর সামনেই দরজা বন্ধ করে।
ক্রোধ ছাখাইয়া ঠগী তহন রাজ সভাতে যায়,
মরা কান্দন কাইন্দা ঠগী সগ্‌গলরে ভুলায়।

---

(২৩) ভূর্যপত্র —যখন কাগজের আবিষ্কার হয়নি তখন চিঠিপত্র সব এতেই লেখা হত।

হোন রাজা কই তোমারে মুই অনাথা বিধবা,
বাইন্যার ব্যাটা মাধইব্যা দিল মোরে কতনা যাতনা।
হস্তে ধরি, পায়ে ধরি তোমাগের সগলের
বিহিত একখান হর,
এই গ্যাহ হের হাতের খতখানা ধর।
এই না কথা কইয়্যারে ঠগী তহন
ভোজপাতখান গ্যায়,
খত দেইখ্যা মহারাজের সন্দ দূরে যায়।
জ্বইল্যা ওঠলো রাজা তহন অনেয্যের কারণে,
দুইশত সেপাই পাঠায় বাইন্যারে আনিতে।
তড়াশে বাইন্যা তহন খুতি পাঁচখান আনে,
সভার মধ্যে থুইয়্যা ঠগী তহন গয়নাগাটি গোণে।
পেরথম খুতি খুইল্যা ঠগী, ফিরাা ফিরাা বান্ধে,
বাকী খুতি খুইল্যা ঠগী মরা-কান্দন কান্দে।
রাজারে গ্যাখাইয়্যা কয় ঠগনগরী বুড়ি,
গ্যাহেন রাজা, আমার লগে বাইন্যায়
জুইড়্যাছে ক্যামুন জুয়াচ্চুরি।
ঘটনা দেইখ্যা রাজা তহন আদেশে বাইন্যার পো'রে,
অগো বাইন্যারপোয় তহন হাপুস নয়নে কান্দে।
বিধি এ কি মোরে ঠ্যাকাইলাগো দায়,
ঠগীর ঠগবাজীতে এহন পরাণ রাহা দায়।
রাজা কয়, সুদখোর, জুয়াচ্চোর, তুই বেটা পাজী,
এই দণ্ডে আন সোনা-গয়না মোরা বইস্যা আছি।
কথার খেলাপ করলে পরে দণ্ড পাবি শূল,
আমার বিচার অতি খাঁটি না অবে এর ভুল।
হায় হায় কইর‍্যা মাধব তহন গৃহে চইল্যা যায়,
চাইর খুতি সোনা দিয়া পরাণডা বাঁচায়।

পাঁচ খুতি সোনা লইয়্যা ঠগী তহন বাড়িতে ফিরিল,
উঠানী দেইখ্যা উয়া আনন্দে ভাসিল।
হাইস্যা কয় ঠগনগরী, শোন, প্রাণের বুইনঝি,
যাওয়ার কালে লইয়্যা যাও যা কিছু দিতেছি।
মুখে হাসি আইন্যা চম্পা তহন কুমারেরে লইয়্যা,
সোনা-দানা সঙ্গে কইর‍্যা বসলো অশ্বপৃষ্ঠে চাইপ্যা।
ধূলা উড়াইয়্যা অশ্ব তহন চলে পবনের গতিতে,
দূরে দূরে অনেক দূরে কাঞ্চী চৌখ্‌খে পড়ে।
কুমার কয়, ত্থাহ কইন্যা দেহগো চাহিয়া,
সোনার-রাজ্য আমার ওগো নাই যে তার তুলনা।
(হারে) খটাখট্ শব্দ কইর‍্যা চলে অশ্বরাজ,
হশুর বাড়ির নিকটে আইয়্যা চম্পার
বাজে বিষম লাজ।
অগো এত কালের সেয়ানা মাইয়্যা যৈবতী রত্তন,
লাজেতে মইর‍্যা গ্যাল ছোড ছেমড়ীর মতন।
দূরেতে না দেইখ্যা অশ্ব মনে জাগে সাড়া,
রাজা, মন্ত্রী, উজীর, নাজির আনন্দে জ্ঞান হারা।
অগো সভা কইর‍্যা খাড়াইছেন পুরনারী যত,
বাদ্য সাঁনাই লইয়্যা ব্যস্ত বাজানদার কত।
চম্পার হস্ত ধইর‍্যা কুমার হেরে(২৪) জমিনে লামায়,
পরথমে পরনাম জানায় জননীর পায়।
অগো হারানিধি পাইয়্যা রাণী আনন্দে ভাসিল,
শাস্তর মত কুলক্রীয়া সাইর‍্যা শ্যাষে
বধূ কোলে নিল।
ধন্য ধন্য রব পইলো পুরীর ভিতরে,
রাজা, মন্ত্রীর এত দিনের চিন্তা গ্যাল দূরে।

(২৪) তাহাকে।

মুন্ত্রী কয়, শোনেন রাজা, শোনেন গো বারতা,
ধইন্য তোমার পুত্র কুমার সঙ্গে চম্পকলতা।
শুভদিন দেইখ্যা এহন এরে যুবরাজ কর,
কুমারেরে রাজ্য দিয়া বানপ্রস্থ কর।
মুন্ত্রীর বচনে রাজার হরিষ অন্তর,
আনন্দের বান ডাকে পুরীর ভিতর।
ঢাক বাজে, বাজে ঢোল, তম্বুরা, কাশী, খোল,
খুশী মনে দুঃখী দীনে তোলে আনন্দের রোল।
শুভ দিনে, শুভ লগ্নে কুমারয়ে রাজ্য দিয়া,
রাজা রানী দুইওজনায় বনে গ্যাল চইল্যা।
(অগো) এই ভাবেতে এই হানেতে
চম্পকলতার পরস্তাব অইলো শেষ,
মোহনবংশী দাসের নাম কইর‍্যা বাহার দিও বেশ।

॥ আলোচনা ॥

উপরোক্ত গীতিকাটি বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলা থেকে সংগৃহীত। একে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক—রাজপুত্রের বীরত্বপনা তথা রূপ-কথা, দ্বিতীয়—নারী হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্খা প্রিয়া, জায়া ও জননী হবার উদগ্র বাসনা।

গীতিকাটির বয়স কত? এ নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষতঃ এর শেষ পংক্তিতে মোহনবংশী দাসের নাম উল্লেখ থাকায় ধরে নেওয়া যায় হয়ত সেই এ-কাহিনীর শেষ গায়ক ও রচয়িতা। কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব নয়, কারণ লোকগীতি ও গাথার দস্তুরই হ'ল একই গান ও গাথা মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতে কালক্রমে প্রথম রচনা থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ কথা কল্পনা করা খুব অন্যায় নয় যে গীতিকাটি হয়ত কোন একক কবি-প্রচেষ্টায় রচিত নয়। কারণ, গাথাটির ভিতর একাধিক

জেলা যথা—ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, খুলনা, ঢাকাও বরিশালের কথার আমেজ পাওয়া যায়, কিন্তু গাথাটি যদি কোন এক বিশেষ অঞ্চলের কোন ব্যক্তি বিশেষের একক রচনা হত তা' হলে এর ভিতরকার শব্দ চয়নে বিশেষ করে একটি অঞ্চলের ভাষাই প্রত্যক্ষ করা যেত।

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের এক জায়গায় "আলাপনী গানের" উল্লেখ করেছেন। এ গুলি হ'ল গল্প এবং গানের সমাহার। সাধারণতঃ কোন একজনে গল্পটি শুরু করেন, মাঝে মাঝে তার ভিতর গানও থাকে, শ্রোতৃবৃন্দও কথিকার সঙ্গে সমস্বরে ঐ গানে অংশ গ্রহণ করে। এই কথা এবং গান একত্রিত হয়েই পূর্ণাঙ্গ একখানি গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় শুধু গানের মাধ্যমেই বর্ণনা করে অনেক কাহিনী—অনেক রূপকথা বা উপকথার। ৺চন্দ্রকুমার দে মহাশয় ময়মনসিংহের বিশেষতঃ পূর্ব ময়মনসিংহের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে এই রকম অনেক লোক-গাথা সংগ্রহ করে দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য এই জাতীয় লোক-গাথা শুধুমাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বাংলার সর্বত্রই এই ধরণের লোক-গাথার প্রচলন ছিল। আলোচ্য গীতিকা 'চম্পকলতা'ও ওই একই গোত্রের।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে এই গাথাটি ফরিদপুর জেলা থেকে সংগৃহীত হলেও এর কাহিনী সন্নিহিত জেলা যথা—বরিশাল, যশোর, ঢাকা এবং পাবনারও কোন কোন অঞ্চলে পরিবর্তিত রূপে প্রচলিত। তবে একটানা কাব্য হিসেবে এটি ছাড়া আর কোনও পাঠ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু কিছু গান, কিছু কথা মিলিয়ে পাঠভেদে কোন কোন জেলায় প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ যশোরে প্রচলিত "ডাকাত কুমারী" ও বরিশালের "চতুর রাজপুত্তুর" বা ঢাকার "মাণিক্য কুমার" কাহিনীর কথা উল্লেখ করা চলে।

এই প্রসঙ্গে ফরিদপুরের "চম্পকলতা"র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যেখানে রাজপুত্র পিতা, মাতা ও আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিরুদ্দেশের পানে চলেছে, গীতিকার যেখানে বর্ণনা করছে :—

"চলিল রাজার কুমার·········দুর্দান্ত" পৃষ্ঠা—২৭

সেখানে পুরোদস্তুর গানের মাধ্যমে যশোরের "ডাকাত কুমারী"তে বলছে :—

"গমন করিল কুমার বৈদেশের পানে,
নিরখিয়া ভূমণ্ডলে চাপে অশ্বপৃষ্ঠে।
না জানি কোন্ শাপের ফল ভুগিছে কুমার,
জানিয়া সকল সন্ধি বরাতে তাহার।
যে-জন দেখিল তারে মূর্ছাগত প্রায়,
এমন সোনার পুতুল রৌদ্রেতে শুকায়।
মেঘের আড়ে সৌদামিনি যেমন শোভা পায়,
দেখিয়া কুমারে সবে ডাকি ডাকি কয়।
দেখগো নগরবাসী, দেখগো চাহিয়া,
রাজার কুমার বৈদ্যাশে যায় তার জননী ছাড়িয়া।
জলের নাম জীবন দেখ সর্বলোকে কয়,
পিপাসায় কাতর হৈল কন্দর্পের রায়।
দেখিয়া সরোবর এক অতি অনুপম,
নিমিষে নামিয়া কুমার তায় করে নিরিক্ষণ।
ওগো কতনা পুষ্পেরি মেলা ভোমরা ভোমরী,
শীতল করিতে দেহ তার করে আকুলি বিকুলী।
পরিধেয় খুলি রাখি চলে ত্বরা করি,
কেমনে জানিবে সে বাম তার বিধি।
ঘাটলাতে বসিয়া এক চোরা লাগিল দেখিতে,
তিলেক মাত্র না করে গৈণ মাণিক্য হরিতে।

মাণিক্য লইয়া চোরা উর্দ্ধশ্বাসে যায়,
পরম নিশ্চিন্তে কুমার জলেতে সাঁতরায়।"

'চম্পকলতা'র তৃতীয় অনুচ্ছেদে যেখানে চম্পকলতা রাজকুমারের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছে তার রূপ দেখে, ভুলে যাচ্ছে তার উপর রাজপুত্রের প্রাণ হননের দায়িত্ব—তার কাছ থেকে মাণিক্য অপহরণের :—

"অগো কোন্‌বা.........সর্বনাশী।" পৃষ্ঠা—৩৭

বরিশালের "চতুর রাজপুত্তুর" পালাগানে গায়ক সেখানে বলছে :—

"আরে বিধি কী-কথা শুনালিরে বক্ষে শেল দিয়া,
চুরি করতে আইস্যা আমি পরলামরে ঘুমাইয়্যা।
(বিধি............)

হারে সতীনে না পারে সইতে সতীন পুতের নাম,
তোমার নি গো আছে মাতা, কোথায় তোমার ধাম।
হারে সুজন দেইখ্যা পিরীত করে যত চতুরা চতুরী,
হইলে কামাশরে জড় জড় খাটে না জারিজুড়ি।
বাল্যকাল গ্যাল হাসিতে খেলিতে
আসিলো যৈবন মাস,
এতকাল ত' রাখলাম বাইন্ধ্যা
এখন ঘটলো সর্বনাশ।
চাইয়্যা ছাখ সোনার কুমার চাহগো ফিরিয়া,
অভাগী দাসী যে কান্দে যুগল পাও বেড়িয়া।'

এ ছাড়া আর একটি বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ঢাকার "মাণিক্য কুমারের" ভিতর। এখানে এই গীতিকার (চম্পকলতা) চতুর্থ অনুচ্ছেদ অর্থাৎ ঠগনগরী ও উঠানদমদমির যে কাহিনী রয়েছে "মাণিক্য কুমারে" তা' একেবারেই অনুপস্থিত। পরিবর্তে সেখানে পাওয়া যায় একটি নতুন কাহিনী। কাহিনীটি সংক্ষেপ এইরূপ :—

"...রাজপুত্র কন্দর্পকুমার এবং বেনিয়া নন্দিনী চম্পকলতা ডাকাত দলের হাত ছাড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চল্‌ল। চলতে চলতে কতদূর যে এসে পড়েছে তার ঠিক নেই। রাজপুত্র পিপাসার্ত্ত হয়ে ঘোড়া থামায় এক জঙ্গলের ধারে। দূরে দেখা যায় একখানা কুঁড়ে ঘর। চম্পকলতা নিষেধ করে, কুমার ওটা হ'ল এই দেশের কুখ্যাত সাত ডাকাতের বাড়ি। ওখানে গেলে আর নিস্তার নেই। কিন্তু কুমার সে কথা শোনে না। অগত্যা চম্পকলতাকেও কুমারের অনুগমন করে সেই বাড়িতে যেতে হয়। সেখানে রয়েছে শুধু ডাকাতদের মা। সে ত' মহানন্দে ওদের আশ্রয় দিয়েই নিজের ঘরের চালায় আগুন ধরিয়ে দেয়—যাতে তার ছেলেরা দূর থেকে ধোঁয়া দেখেই বুঝতে পারে তাদের বাড়িতে কোন শিকার ধরা হয়েছে। চম্পকলতা এক সময় নিজেই ছিল ডাকাত দলের নেত্রী, তার উপর জ্যোতিষ গণনাও জানত। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ঘাটে স্নান করতে যাবার নাম করে রাজপুত্রকে নিয়ে সেই মুহূর্ত্তেই সে-স্থান পরিত্যাগ করে চলে যায়। ডাকাতরা বাড়ি ফিরে এসে মার কাছ থেকে সব শুনে ওদের যাত্রাপথ ধরে পিছু ধাওয়া করে,—কিন্তু পাখি ততক্ষণে উড়ে গেছে। রাজকুমার আর চম্পকলতা ডাকাতের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে দেশের পথ ধরে। বৎসর শেষ হবার আগের দিন দু'জনে এসে প্রবেশ করে রাজপুরীর চৌহদ্দির ভিতর...।"

তা'হলে দেখা যাচ্ছে একই কাহিনী লোক মুখে মুখে কখনও বা কাহিনীর কিছু কিছু হেরফের ঘটেছে, কখনও বা কাব্যাংশেরও রূপান্তর ঘটেছে। তবে, এ কথা ঠিক এ প্রসঙ্গে যে কটি গীত সহযোগে কাহিনী পাওয়া গেছে তার প্রত্যেকটির ভিতর মিল রয়েছে রাজপুত্র এবং চম্পকলতা উভয়েই জ্যোতিষী জানত। এ থেকে মনে করা সঙ্গত-গাথাটি সেই যুগেরই রচনা যখন এ দেশে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার বেশ প্রচলন ছিল। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, তা'হল Ballad বা গীতিকার প্রধান যে চরিত্র সেটি হ'ল নারী এবং এখানে কোন বিশেষ

ধর্মেরও ছায়া পড়েনি। এ থেকে মনে করা চলে কাহিনীটি আর যখনই রচিত হ'ক না কেন হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পূর্বেকার রচনা—নতুবা এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লেখক বা কবি কী-ভাবে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ মুক্ত হতে পারল। কাজেই গীতিকাটি ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি গীতিকারই সমসাময়িক।

এ সম্পর্কে আরও একটু এগুনো যাক। আমাদের এই সংকলন গ্রন্থে সংগৃহীত নয়টি গীতিকার ভিতর চম্পকলতার শেষে ভণিতায় রচয়িতা হিসেবে মোহনবংশী দাসের নাম পাওয়া যায়—যে জিনিসটি অন্য অনেক গীতিকাতেই অনুপস্থিত। অবশ্য এটির রচয়িতা আদতে মোহনবংশী দাস কি-না সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে না পারলেও এটা মনে করা যায় এ-গীতিকাটি হয়ত মহাজন পদাবলীর যুগে রচিত, যখন এ দেশের কবি-কুলের ভিতর একটা সাধারণ রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল গাথা বা গানটির সঙ্গে তার নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবার।

অবশ্য কেউ কেউ এমন কথাও বলতে পারেন,—এ গীতিকাটি যখনই রচিত হক না কেন, কালক্রমে হয়ত বিগত শতাব্দীর কোন এক সময় কোন সুচতুর ব্যক্তি গাথাটিতে নিজের নামাঙ্কিত করে রেখেছে।

আমরা তাঁদের এ-মতামতকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি না। কারণ, লোকগীতি বা গাথার দস্তুরই হল একই গান বা গাথা অঞ্চল বিশেষে পরিবর্তিত রূপ নেয়। লোক-গীতি বা গাথার এটা একটা সজীব ও প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৺দীনেশ চন্দ্রের সংগৃহীত প্রায় প্রতিটি গীতিকা বা গাথা সম্পর্কেই খাটে। তাই সেদিক থেকে গীতিকাটিকে আর যাই হোক পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সঙ্কলিত গীতিকার চাইতে নবীনতর বলারও কোন যুক্তি নেই।

আদর্শ গীতিকার যে-সব লক্ষণ থাকা প্রয়োজন যথা—নারীচরিত্র প্রধান, ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত, পয়ার ছন্দে রচিত, উপমা এবং সচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি—কোনটারই অভাব নেই। সে-দিক থেকে

সংগৃহীত "চম্পকলতা" গাথাটি বাংলার লোক-গীত-কথার সংগ্রহের ঝাঁপিতে নবতম সংযোজন বললে ভুল হবে না।

উপরোক্ত গীতিকাটি "স্বাধীনতা" পত্রিকার ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে একই নামে পাবনা জেলা থেকে অনুরূপ আর একটি গীতিকা আমাদের হস্তগত হয়। তার সঙ্গে উপরোক্ত গীতিকার এক জায়গায় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ব্যাতিক্রমটি হ'ল—উপস্থাপিত গীতিকাটির ৩৭ পৃষ্ঠায় যেখানে "অগো সোনা নয়······জাইগ্যা কাটায়" সেখানে নতুন সংগৃহীত গীতিকাটিতে দেখা যায়ঃ—

অগো সুবর্ণ নয় যে অঙ্গেতে ধরিব,
প্রাণের অধিক তাই বক্ষেতে রাখিব।
শুন্যা চম্পার বাণী, দুঃখে ভাসে ভীল রাণী
বলে তুমি থাকগো এইখানে।
অতি অপরূপ রূপ তব, তোমারে আর কি কহিব
এ কারণে দুঃখ পাইলাম মনে।
শুন্যা চম্পার বচন, ভীল রাজা কুমারেরে জিজ্ঞাসে এহন,
কে তুমি পথিক-সুজন, স্ত্রী ত্যাজিছ কী কারণ ?
যদি কোন দুঃখ থাকে, কহ তুমি অকপটে,
আমার রাজত্বে কোন দুঃখ কষ্ট নাই বটে।
কিন্তু বিনা দোষে ত্যাজিলে সতী,
তার শাস্তি ভীষণ অতি,
এ কথা জানিও নিচ্চয়।
রাজপুত্রে চিন্তিয়া বলে, শুন রাজন কই তোমারে,
হতভাগ্য আমি, তাই ছাড়ি এ হেন পরিবারে।
উদয়াস্ত খাটিপিটি কোনমতে সংসার করি,
উচিত জুমরী পাইলে দাসত্বও করিতে পারি।

কুমারের কথা শুন্যা রাজা তবে দিল যে আদেশ,
রাজ সভাতে তার কার্য করেন নির্দেশ।
অগো সেই না চম্পকলতা সুন্দরী রত্তন,
রাজপুত্রের লগে থাহে সোয়ামী ইস্তিরীর মতন।
অগো একদিন, তুই দিন, কত দিন যে গ্যাল,
চম্পকলতা কুমারের রূপেতে মজিল।
অগো দিনেতে না থাকে কুমার গৃহ মইধ্যখানে,
নিশি রাইতে ঘরে ফির‍্যা ঘুমায় পালঙ্কের উপারে।
এক পালঙ্কে ঘুমায় তুইজন সাগর ব্যাবধান,
মুখে কারও রা নাই পাষাণ সমান।
অগো ছলা কলা কইর‍্যা চম্পা ভুলাইতে চায়,
কুমারের বে-খেয়ালের আশায় নিশি জাইগ্যা কাটায়।

সুতরাং এ-কথা বলাই বাহুল্য, এই রকম পাঠভেদ অনুসন্ধানের ফলে আরও আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নয়।

।। আসমান তারা ।।

কাহিনী

উজানী নগরে জহিরুদ্দিন নামে এক সওদাগর বাস করত। তার ছিল চার ছেলে, ছোটটির নাম হাচান।

জহিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর বড় তিনি ভাই বিবাহাদি করে ঘর-সংসার করতে লাগল। যে-হেতু হাচান ছিল একটু বোকা ধরণের, সেইজন্য সে কোন কাজকর্মও করে না, ভাইয়েরাও তার বিয়ে-সাদী দেয় না। এক কথায় ভাইয়েদের সংসারে সে যেন গলগ্রহ। অবশ্য আদর যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না।

কিন্তু এ-ভাবেত' আর দিন চলে না। একদিন, অতিভোরে ঘুম থেকে উঠেই হাচান বলতে লাগল, আমায় নৌকা সাজিয়ে দাও, আমি বানিজ্যে যাত্রা করব।

কথা শুনে সবাইত' অবাক। বৌদিরা সব ঠাট্টা শুরু করে দেয়। কিন্তু হাচান তাতে দমে না। জিদ করতে থাকে, তাকে বাণিজ্যে যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য।

অগত্যা ভাইয়েরা কী আর করে? সাতখানা বাণিজ্যের নৌকো সাজিয়ে দিয়ে বড় ভাই পাটমাঝিকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে দেয়, দেখ ভাই, তোমার হাতেই সঁপে দিলাম আমাদের অবোধ ভাইটিকে। সাবধানে থেকো। নির্বিঘ্নে ফিরে এসো বাণিজ্য সেরে।

হাচান মা, বৌদি, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাণিজ্য-যাত্রা করে। একদিন, দুইদিন করে দেখতে দেখতে পনের দিন অতিবাহিত হবার পর হাচান 'লোহিত সাগরে' এসে পৌছয়।

লোহিত সাগর পার হয়ে ক্রমান্বয়ে 'দুধসাগর' তারপর 'কৃষ্ণ সাগরের' তীরে এসে নৌকো বাঁধে। দেখে সেখানকার নদী পাড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে প্রচুর গরু বাছুর। হাচান তার মাঝি-মাল্লাদের দিয়ে

সেইসব গরুর গোবর দিয়ে ঘষি (ছোট ঘুঁটে জাতীয়, জ্বালানীর কাজে লাগে) দেয়ালো সারা নদীর পাড় জুড়ে। তারপর তিনদিনের দিন সেইসব শুকনো ঘষিকে তুলে নিয়ে বোঝাই করল সাত নৌকোর খোলে। এরপর সে-স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে চলল 'ক্ষীর সাগরের' দিকে।

ক্ষীর সাগরের পাড়ে হাচান দেখতে পায় ওই গাঁয়ের কতকগুলি বাচ্চা ছেলে একটা ইঁদুরের লেজে দড়ি বেঁধে সেটাকে নদীর কিনারে এনে ঘোরাচ্ছে। ইচ্ছে—একটু পরেই সেটাকে জলে বিসর্জন দেবে।

হাচান টাকা দিয়ে ওদের কাছ থেকে ইঁদুরটা কিনে নিল। এরপর আরও কিছুদূর গিয়ে দেখে,—কতকগুলি চ্যাংড়া ছেলেএকটা বিড়ালকে নিয়ে রং-তামাসা জুড়ে দিয়েছে। হাচান টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিড়ালটাকেও কিনে নিয়ে নৌকোয় ফিরে এসে ইঁদুর ও বিড়ালের জন্য দুটি পৃথক খাঁচার ব্যবস্থা করে তাদের আহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত করে দিল।

নৌকোর যত মাঝিমাল্লা আছে ইসারায় একজন আরেকজনকে বলে, বাণিজ্য করতে এসে এমন পাগলামী কেউ কি কখনও দেখেছ ?

হাচান যেন সব বুঝেও কিছুই বোঝে না। দেখতে দেখতে ক'দিন পর হাচানের নৌকো এসে পড়ে এক গভীর অরণ্যের ধারে। দেখে, জঙ্গল লাল হয়ে উঠেছে আগুনের তাপে। বনে দাবাগ্নি শুরু হয়েছে। বনের যত পশু, পাখি সব যে যেদিকে পারছে প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ভিতর দিক হতে একটা বিরাট অজগর সাপের ফোঁশ-ফোঁশানী শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে।

হাচান এগিয়ে যায় বনের দিকে। ওর মনটা কেমন যেন ব্যথিত হয়ে ওঠে অজগরের ঐ মৃত্যুকাতর দৃশ্য দেখে।

তাড়াতাড়ি করে নৌকোয় গিয়ে মাঝিমাল্লাদের অনেক সাধ্যসাধনা করে তাদের দিয়ে কলসী কলসী জল ঢালিয়ে অজগরের আশপাশের আগুন নিভিয়ে দিতে সক্ষম হয়। অজগরও অনেকটা সুস্থ বোধ করে।

পরে ঠিক মানুষেরই কণ্ঠে অজগর প্রশ্ন করে, তুই কে-রে আমার এই অন্তিম সময়ে আমায় একটু শান্তি দিলি ?

হাচান অজগরের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করে নিজের কথা। অজগর তখন তার লেজের গোড়া থেকে একটা অঙ্গুরী ছুঁড়ে দিয়ে বলে, —দেখ এ আংটিটা তোকে দিয়ে গেলাম, খুব সাবধানে রাখবি। এর কাছে যখন যা চাইবি তখনই তাই পাবি—এই বলে অজগর সেই বনের ভিতরই দেহত্যাগ করল। হাচান ফিরে গেল তার নৌকোয়। এই আংটির খবর একমাত্র সে ছাড়া আর কেউই জানতে পারল না।

নৌকোয় ফিরে হাচান পাটমাঝিকে আদেশ করে,—নৌকো এবার দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য।

দেখতে দেখতে সাত দিন, সাত রাত শেষে হাচানের বাণিজ্যের নৌকো এসে ভিড়ল গ্রামের ঘাটে। বাড়িতে খবর গেল—হাচানকে যেন যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে বরণ করে ঘরে তোলা হয়।

নৌকো ঘাটে ভিড়িয়ে মাঝিমাল্লারা যখন পাড়ে চলে গেছে হাচান তখন ভাবল,—এই ফাঁকে অজগরের কথাটার সত্যতা যাচাই করা যাক—এই ভেবে অঙ্গুরীকে আদেশ করে, অঙ্গুরী তুমি যদি আমার হও তা'হলে এই দণ্ডেই নৌকোর যত ঘষি আছে সব হীরে, মুক্তো, মাণিক্যে পরিণত কর।

যে-কথা সেই কাজ। অঙ্গুরী-স্পর্শে হাচানের সাত নৌকোর ঘষি মনিমাণিক্যে পরিণত হ'ল।

বরণ করতে প্রথমেই এগিয়ে এলো হাচানের মা। হাচান বেছে বেছে ষোলটি মাণিক্য দিয়ে তাকে প্রণাম জানায়।

এরপর বরণ করতে এগিয়ে এলো হাচানের বড় বৌদি। হাচান তাকেও প্রণাম করলো বারটি মাণিক্য দিয়ে।

এইভাবে একে একে মেজভাইর বৌ, সেঝভাইর বৌ থেকে পাড়া-প্রতিবেশী যেই আসে হাচান তাকেই কিছু না কিছু দিয়ে সম্মান জানায়।

খবর পেয়ে দেশময় রাষ্ট্র হয়ে যায়—বাণিজ্য করে হাচান এতই বড়লোক হয়েছে যা নাকি কোনদিন কেউ ধারণাও করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে হাচানদের বড় অবস্থা আরও বিরাট হয়ে উঠলো। দেশ বিদেশ থেকে আসতে লাগল হাচানের বিবাহের প্রস্তাব!

এ দিকে একদিন সেই দেশের রাজবাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাচান দেখে ফেল্‌ল রাজকন্যা আসমানতারাকে।

আসমানতারার রূপের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত। হাচানের সাথে হঠাৎ চোখাচুখি হতেই হঠাৎ সে ফিক্ করে হেসে ফেলে। হাচানও সেই থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, বিয়ে যদি করতেই হয় তা'হলে এই মেয়েকেই সে বিয়ে করবে।

হাচান ব্যক্ত করল তার মনের কথা বাড়ির লোকের কাছে।

তারা ত' একথা শুনেই অবাক! হাচান বলে কী?

ভাইবান্ধবরাও মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। বেশ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে, কিন্তু তাই বলে একেবারে রাজার মেয়ের সাথে বিয়ে! এ যে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু হাচান এতে দমল না একটুও। সে নিজেই তারপর দিন ঘটক পাঠাল রাজার (বাদশা) কাছে। সঙ্গে নজরানা দিয়ে পাঠাল সুন্দর দেখে চারটি মাণিক্য।

রাজা অমন সুন্দর চার চারটে মাণিক্য দেখেত' হতবাক। তক্ষুণি ঘটককে ডেকে শোনেন সব বৃত্তান্ত।

ঘটকও ঘটকালীর ধারায় বহুগুণ বাড়িয়ে বলতে থাকে হাচানের ধনদৌলতের কথা। পরিশেষে নিবেদন করে তার মনের কথা—হাচান সাদী (বিবাহ) করতে চায়, রাজকন্যা আসমানতারাকে।

শুনেই রাজাত' চটে লাল। তারপর রাগ সামলে নিয়ে বলেন,—বেশ, তাই হবে। তবে একটি সর্ত পূরণ করতে হবে। আজ এই একরাত্রের মধ্যে যদি হাচানের বাড়ি থেকে আমার বাড়িপর্যন্ত ষোল হাত চওড়া এক রাজপথ নির্মাণ করে দিতে পারে এবং সেই রাস্তার দু'ধারে

থাকবে নানা জাতের ফুল ও সুমিষ্ট ফলের বাগিচা। পাকা ফলের সুবাসে পাখিরা এসে ঠুকরিয়ে খাবে সেইফল, আর তাদের কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠবে রাজপুরী। আর তাদের সেই কলকাকলিতে যদি ভেঙ্গে যায় রাজার ঘুম, তা'হলেই তিনি সেইদিনই তার কন্যা আসমানতারার সঙ্গে বিয়ে দেবেন হাচানের। কিন্তু যদি এর অন্যথা হয়, তা'হলে এই বেয়াদবির জন্য হাচানের মাথা আর ধরের উপর থাকবে না—এ কথাও সুনিশ্চিত।

রাজ-আদেশ শুনে ঘটকমশাইত' ভীত এবং চিন্তাগ্রস্ত ভাবে হাচানের বাড়িতে এসে নিবেদন করে তার রাজ-সাক্ষাতের ফলাফল।

বাড়ির সকলে সংবাদ শুনে শুধু বিস্মিতই নয়, প্রাণ ভয়েও ভীত হয়ে উঠ্‌ল।

হাচান কিন্তু এ কথা শুনে এতটুকুও ঘাবড়ালো না। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে, হাচান অঙ্গুরীর সাহায্যে তৈরী করাল ষোল হাত দৈর্ঘ্যের প্রশস্ত এক রাজপথ তার বাড়ি থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত। পথের দুধারে সাজান হ'ল সুগন্ধি ফুল আর সুমিষ্ট ফলের গাছ। পাকা ফলের গন্ধে পাখিরা এসে ঠোকরাতে লাগল সেই মিষ্টি ফল রাজি। তাদের কলকাকলিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল রাজার।

ঘুম থেকে উঠেই রাজা চোখের সুমুখে ওই দৃশ্য দেখেত' তাজ্জব! তক্ষুণি ঘটককে ডাকিয়ে কন্যা আসমানতারার বিয়ের যোগাড় করতে আরম্ভ করলেন, এবং এক শুভদিনে সত্যিই হাচান বিয়ে করে ঘরে ফিরল•রাজকন্যা আসমানতারাকে নিয়ে।

কিন্তু বিধির বিধান। রাজকন্যা আসমানতারার ছিল গুপ্ত প্রণয় সেই দেশেরই সেনাপতির সঙ্গে। হাচান মুগ্ধ হয়ে গেল আসমান তারার অপরূপ রূপলাবণ্যে।

এদিকে আসমানতারাও প্রতি নিয়ত তক্কে তক্কে আছে হাচানের গুপ্ত-শক্তির সন্ধান নেবার জন্য।

একদিন হাচান সত্যি সত্যিই রাজকন্যার ছলাকলায় ভুলে প্রকাশ করে দিল তার যাদু আংটির বৃত্তান্ত। আর যায় কোথায়? সেই দিনই রাত্রে আসমানতারা হাচানের কাছ থেকে আংটি চুরি করে সেনাপতিকে নিয়ে একেবারে সাত সমুদ্র, তের নদীর পাড়ে গিয়ে নতুন এক প্রাসাদ বানিয়ে সুখে বসবাস করতে আরম্ভ করল।

ভোর হতেই বাড়িতে এবং রাজার কানে গেল কন্যা নিরুদ্দেশ হবার কাহিনী। হাচানকে জব্দ করবার ফন্দি তিনি মনে মনে অনেক দিন ধরেই পুষে রেখেছিলেন, এত দিনে যখন সেই সুযোগ এলো তিনি আর তা' হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। কন্যা নিরুদ্দেশ হবার জন্য তিনি হাচানকেই দায়ী করে তক্ষুণি তাকে বেঁধে নিয়ে এসে রেখে দেওয়া হল কারাগারে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে। বলা হল, তার কন্যা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে ওইখানেই ওই ভাবেই থাকতে হবে—একদিন তিল তিল করে শুকিয়ে মারা যাবার জন্যে।

কান্নার ধুম পড়ে যায় হাচানের ঘরে। হাচানের বাঁচার আশা তারা বুঝি ছেড়েই দেয়। ঠিক এই সময় হাচানের পালিত বিড়াল আর ইঁদুর তাদের প্রভুর বিপদের কথা বুঝতে পেরে তক্ষুণি দু'জনে যুক্তি করে সুরঙ্গ কেটে গিয়ে হাজির হয় হাচানের কারাগারে। সব বৃত্তান্ত তার কাছ থেকে শুনে নিয়ে দু'জনে মিলে যাত্রা করে সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে।

ওরা দেখে—রাজকন্যাত' মহা ধুরন্ধর। ঘুমোবার সময় আংটিটি মুখে পুরে ঘুমোয়—পাছে কেউ চুরি করে নেয়। বিড়াল আর ইঁদুর আবার যুক্তি করতে বসে। এইবার ইঁদুর দিল তার লেজ বাড়িয়ে রাজকন্যার নাকের ভিতর। ঘুমের ঘোরে সুরসুরি লেগে যে মুহূর্তে রাজকন্যা হেঁচে ফেলল—সঙ্গে সঙ্গে আংটিটাও তার মুখ থেকে ছিটকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। আর কি? বিড়াল কাছাকাছিই ছিল এইবার দুইজনেই তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে সামনেই যে নদী ছিল তাতে দিল ঝাঁপ।

কিন্তু ওপারে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ এক বোয়াল মাছ টক্ করে গিলে ফেল্‌ল ইঁদুরটাকে।

বিড়াল পাড়ে উঠে ভাবতে থাকে, এখন কী করা যায়? ইঁদুরকে ফেলে রেখে একাকী ফিরে গিয়েই বা কী লাভ? আংটি রয়েছে ইঁদুরের মুখের ভিতর। অনেক ভেবে চিন্তে বিড়াল মিঁউ মিঁউ করতে করতে গিয়ে জুটলো সেই দেশের মাছের বাজারের ভিতর। আস্তানা গাড়ল জেলেদের দোকানের পাশে। জেলেরা অমন সুন্দর নাদুশ নুদুশ বিড়ালটা দেখে ভালবাসতে আরম্ভ করল,— মাছের কাঁটা, আঁশ, পিত্ত, নাড়ীভুঁড়ি যা-হয় তাই ওকে দেয়। ও মহানন্দে দিন কাটায় আর সুযোগের অপেক্ষা করে। প্রতি মুহূর্তেই সব দোকানের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখে কোন্ দোকানে কোন্ বড় মাছ কাটছে।

অবশেষে বেড়ালের ভাগ্যেও এল সেই শুভ দিন। একদিন সেই বোয়াল মাছটাই ধরা পড়ল এই বাজারেরই এক জেলের জালে। বিড়াল, সেই থেকেই জেলের পিছু পিছু মিঁউ মিঁউ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলেও মাছটা কেটে তার নাড়ীভুঁড়িগুলি দিয়ে দিল বিড়ালটাকে। বিড়ালও এই সুযোগে সেগুলি নিয়ে গিয়ে বসল একটু দূরে। পরে, নখ দিয়ে চামড়ার থলে ছিড়ে ফেলে ইঁদুরকে মুক্ত করে।

আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। ইঁদুর এবং বিড়াল দৌড়তে দৌড়তে চলে এলো সেই কারাগারের ভিতর। ইঁদুর মুখ থেকে বের করে দিল সেই যাদু-আংটি।

আংটি হাতে পেয়েই হাচানের দৈবশক্তি ফিরে এল। তৎক্ষণাৎ খবর পাঠাল রাজা, উজীর, নাজির, পাত্র, মিত্র সকলের কাছে। সবাই অবাক !!

হাচান রাজাকে বলে, দেখুন মহারাজ. আপনার কুলটা কন্যা এবং সেনাপতির কীর্তি—এই বলে যাদু আংটির সাহায্যে সেই মুহূর্তেই সেখানে এনে হাজির করল সেনাপতি ও আসমানতারাকে—তারা তখন সুখ নিদ্রায় বিভোর।

লজ্জা, অপমান ও আত্মগ্লানীতে কাতর হয়ে পড়লেন মহারাজ। ওদের আর জেগে উঠবারও সুযোগ দিলেন না। নিজের হাতের তরবারির এক এক কোপে দু'জনেরই শিরশ্ছেদ করে ফেললেন। শেষে অশ্রুসজল কণ্ঠে হাচানের হাত ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিজ কৃতকর্মের জন্য।

মনের দুঃখে হাচানকেই সিংহাসনে বসিয়ে নিজে 'হজ' যাত্রা করলেন।

সংক্ষেপে এই হ'ল আসমানতারার কাহিনী।

।। কাব্য ।।

বয়াতী। মোরা বন্দন করি গাজীর চরণে।

দোহারবৃন্দ। হে বন্দন করি,
তালে লাল জ্বিয়ে লাল।
বন্দন করি গাজীর চরণ হে,
বন্দন করি।
তালে লাল জ্বিয়েলাল।

বয়াতী। শুনেন সবে ভক্তিভাবে হিন্দু মুছলমান
উজানী নগরের কথা অপূর্ব সোমান।

দোহার। হে বন্দন করি, গাজীর চরণ হে,
বন্দন করি,
তালে লাল জ্বিয়ে লাল।

বয়াতী। মোনে দুঃক্ষু পাইলাম আমি হাচানের লাগিয়া,
সেই না হাচান বিয়া করল কইন্যা আসমানতারা।
উজানী নগরে ছিল জহিরুদ্দিন মেঞা,
তেনার ছেলো চাইর বেটা, হাচান অইল বোকা।

দোহার। হায়রে হাচান অইলো বোকা।

বয়াতী। জহিরুদ্দিনের তিন ব্যাটায় বিয়া-ছাদী কইলো
ধন দৌলত থুইয়্যা জহির বেহেস্তেতে [১]গ্যাল।

দোহার। হায়রে হাচান অইলো বোকা।

বয়াতী। ডাঙ্গর-ডুঙ্গর[২] তিনি পোলায় সওদাগরী করে,
বোকা হাচান ঘরে বইয়্যা ক্যারাম কুরুম[৩]করে।

দোহার। হায়রে হাচান অইলো বোকা।

---

(১) স্বর্গ (২) বয়স্ক, সেয়ানা (৩) এলোমেলা ভাবে ঘোরাফেরা করে।

বয়াতী হায়রে বিধির নিব্বন্ধ[৪] কই খণ্ডান না যায়,
গাজীর দোয়ায় হাচানের নসিব ফির‍্যা যায়।
দোহার। হায়রে বিধির নিব্বন্ধ কই খণ্ডান না যায়।
বয়াতী। একদিন ফয়জোরে[৫] হাচান ডাক দিয়া কয়,
বিষ্যাশে বাণিজ্যে যাইমু মুই জোগার হইর‍্যা দাও।
দোহার। হাচান বাণিজ্যেতে যায়।
বয়াতী। এইনা কথা শুন্যা ভাবীজানেরা মুখ টিপ্যা কয়,
কী আনবা মোরগো লইগ্যা হাচা কথা কও।
দোহার। হায়রে হাচান বাণিজ্যেতে যায়।
বয়াতী। মায় বুঝায়, ভাবীজান বুঝায়,
বুঝায় ভাই বেরাদার প্রিতিবাসী,
বিষ্যাশের পেরসানীর[৬] কথা ভালো মোনেনা বাসী।
দোহার। হাচান দুঃখু পাইলো মোনে।
বয়াতী। হায়রে হাচান হায়,
কী কইমু হাচা কথা পেত্যয় না যায়।
(হারে) বাণিজ্যের লইগ্যা হাচান কান্দে রইয়্যা রইয়্যা,
কান্দন শুইন্যা মা জননীর উথলাইলো দয়া।
দোহার। হাচান কান্দে রইয়্যা রইয়্যা।
বয়াতী। কান্দন শুইন্যা মা জননী কহিল তরাসে,
যাও বাছা বাণিজ্যেতে সাবধানে থাকিও,
সাইঝা সইঞ্ঝায়[৭] গাজীপীরের নামও লইও।
দোহার। হাচান বাণিজ্যেতে যায়।
বয়াতী। হারে বাণিজ্যের লইগ্যা হাচান নৌকাতে চড়িল,
ভাই ভাতিজা ঘাটে আইস্যা কান্দিতে লাগিল।
বড়ভাই পাটমাঝিরে ডাক দিয়া কয়,
তোমার হাতে সইপ্যা দিলাম দেইখ্যো আমার ভাই।

---

(৪) লেখা, (৫) সকাল (৬) কষ্ট (৭) সন্ধ্যাকালে

দোহার। হাচান বাণিজ্যেতে যায়।

বয়াতী। হাচানের নাও তহন বাণিজ্যে চলিল,
কত নগর পন্থআদি সগ্‌গলই উৎরাইল।
একদিন, দুইদিন, কতদিন না জানি,
পঞ্চদশ দিবসে হাচান গ্যাখল লাল পানি।
লাল পানি, লাল জল, লালে লালে ধুম,
চাইর দিগে চাইয়্যা হাচানের লাগে বিষম ঘুম।
এই ভাবে একে একে হাচান দুধ সায়রে ধায়,
দুধ সায়র উৎরাইয়্যা হাচান কালাপানি যায়।
কালাপানির তীরে হাচান নাও রাখে বান্ধি,
তীরেতে গ্যাখে হাচান গরুতে খায় দানা-পানি।
গাজীর দোয়াতে হাচানের বুদ্ধি কিছু ছিল,
মাঝিমাল্লায় ধইর‍্যা হাচান
সেই গোবরের ঘষি[৮] যে দেওয়াইলো।
ঘষি শুখাইয়্যা হাচান থুইলো ডরার মইধ্যে,
পাট মাঝি দেইখ্যা উয়া বইস্যা বইস্যা ভাবে।

দোহার। হাচান বাণিজ্যেতে যায়,
এক মাঠের যত ঘষি, হাচান নায়েতে উঠায়।

বয়াতী। ওগো সুদিন আইলে পরে শাকে বান্ধে সোনা,
কুদিনে ছাইড়্যা যায় হাতের মরা পোনা।
এই ভাবেতে হাচান মিঞা ক্ষীর সায়রে ধায়,
ক্ষীর সায়রের পাড়ে পোলাপান দেখিবারে পায়।
হাচান গ্যাখে পোলাপানে ধইর‍্যাছে এক ইন্দুর,
ল্যাজেতে বান্ধিয়া তারে গ্যাখাইছে সমুদ্দুর।
হাচান তহন ট্যাহা দিয়া ইন্দুর নিল কিন্যা,
নায়ের যত মাঝি-মাল্লা গ্যাহে চাইয়্যা চাইয়্যা।

(৮) শুকনো গোবর খণ্ড—ঘুঁটের ছোট আকার

দোহার। হায়, হায়রে হাচান কেনলো একখান নূতান ব্যাসাতী,
ই ব্যাসাতী কেনলো হাচান বাণিজ্যের লাগিয়া গো।
হায়,হায়,হায়, হাচান কেনলো একখান নূতান ব্যাসাতী।
আইচ্ছা মেঞা সাবাস বাই,
বেশ, বেশ, বেশ বাই।

বয়াতী। কিছুদূর গিয়া হাচান গ্যাহে নদী পাড়ে,
গুড়াগুড়ায়[৯] তামাশা[১০] জোড়ছে
এট্টা বিলাই ধইরে।
ট্যাহা দিয়া কেনলো হাচান ধলা বিলাইডা,
খাঁচা কইর‍্যা রাখলো তুগ্‌গায়[১১] যত্তন করিয়্যা।
প্যাটমাঝি[১২] কয়, দাড়-মাঝি বাই, দ্যাখছনি এমন কাম,
ঘরে ফির‍্যা বড় মেঞার ডে[১৩] থাকবে না আর মান।
বলদের লগে চলে বলদে
গাছে ওঠে মরতে।

দোহার। হাচান কেনলো একখান নূতান ব্যাসাতী।

বয়াতী। হায়, হায়রে হাচানের নসিব ফেরলো এতদিনে,
গাজী পীরের দোয়াতে হাচান পৌছাইলো বিদ্যাশে।
কিছু দূর না গিয়া হাচান গ্যাহে চাইয়্যা চাইয়্যা,
বোনেতে লাইগ্যাছে আগুন নেভায় ক্যামুন কইর‍্যা।
সু-বুদ্ধির ভাণ্ড হাচান তহন নৌকা পড়েতে লাগায়,
দাবানলের মধ্যে এক বৃদ্ধ অজাগরে দেখিবারে পায়।
(অগো) অজাগরের ফোঁসফোঁসানীতে প্রাণে লাগে ডর,
পুইড়্যা যায় গাছ-গাছালী পোড়ে তামাম ঘর।
আসমান হইতে মা ফাতিমা ইসারায় কহিলো,
অজগোরের কাছের থিকা হাচান অঙ্গুরী চাহিলো।

(৯) বাচ্ছা-কাচ্ছা, (১০) মজা—খেলা, (১১) দুইজনকে
(১২) প্রধান মাঝি—কর্ণধার (১৩) কাছে

দৌড়াদৌড়ি কইর‍্যা হাচান নদীর ঘাটে যায়,
হস্তে ধইর‍্যা মিনতি কইর‍্যা হাচান মাঝিগের বুঝায়।
একে একে সগ্‌গল মাঝি বাই, শোন দিয়া মোন,
বোনের আগুন না নিবাইলে যাবে মোরগো ধন পান।
ওগো হাচানের বাক্যে মাঝিরা
জলের কলসী যে আনিল,
ঘন ঘন ঢাইল্যা জল আগুন যে নিবাইলো।

দোহার। হাচানের সুবুদ্ধি ফিরিল,
গাজীর নামেতে হাচান বুদ্ধিমন্ত অইলো।

বয়াতী। শোনরে হাচান হায়,
কলিজা পুড়িয়া গ্যাল আগুনের জ্বালায়।

দোহার। শোনরে হাচান হায়,
অজোগরের প্রাণ যায় আগুনের জ্বালায়।

বয়াতী। পানি পাইয়া অজোগরে শান্তি যে পাইলো,
হাচানেরে কিছু বর তয় দিবার যে চাহিলো।
মা ফাতিমার কথা মতন হাচান
সাপের আঙ্গুট[১৪] যে মাঙিল,
অজোগরে মরণকালে সেই আঙ্গুটও যে দিল।

দোহার। শোনরে হাচান হায়,
কলিজা ফাইট্যা অজোগর মইলো আগুনের জ্বালায়।
আল্লী, আল্লী, হায়, হায়,
কলিজা ফাইট্যা যায় আগুণের জ্বালায়।

বয়াতী। অগো অঙ্গুরীর গুণ কতনা কইবারে পারি,
অঙ্গুরীর গুণে হাচান যা চাবি তাই পাবি।
এই না বইল্যা অজগোরে বেহেস্তে চলিল,
অঙ্গুরী পাইয়া হাচান ছাইব নায়েতে আসিল।

---

(১৪) আংটি।

নায়ে উইঠ্যা হাচান মেঞা পাট মাঝিরে কয়,
বাণিজ্যত' অনেক অইলো এহন ফেরাও আমার নাও।

দোহার। হাচান ফেরে ঘরের দিকে।

বয়াতী। মাঝিমাল্লা যত জনায় এ উয়ারে কয়,
বিষম পাগলের ল্যাঠা বলা নাই যায়।
সাত ডিঙা ভইর্যা থুইছে ঘষি আর গোবর,
বিবিজানেরা চুলা[১৫] আঙ্গাইবেন[১৬] তিন কুড়ি বচ্ছর।
হাচান মেঞা নৌকায় বইয়া বিলাই ইন্দুর পোষে,
সাত মাস, সাত দিন পরে ছাশে আসে শ্যাষে।

দোহার। হাচান ফেরল নিজের ছাশে।

বয়াতী। পাট মাঝিরে পাড়ে দিয়া হাচান ভাবে মনে মন,
অজোগরের কথা হাচা ক্যামুন দেখিমু এহন।
এই কথা না ভাইব্যা হাচান অঙ্গুরীরে কয়,
তুমি যদি মোর হও, এই দণ্ডেতে মানিক্য ছাও,
হীরা, জহরত, পান্না কর তামাম নায়ের ঘষি।

দোহার। হাচানের সুবুদ্ধি ঘটিল।
হের বাক্যে নায়ের সব ঘষি মাণিক্য হইলো।

বয়াতী। অগো পরথমে ছাখবার আইলো হাচানেরই মায়,
যোলটি মাণিক্যে সেলাম ছায় হাচান মেঞা বাই।
হের পরে আইলেন যিনি হাচানের বড় ভাতিজা,
হেনারে দ্বাদশটি মাণিক্য দেয় গুনিয়া গুনিয়া।
এই ভাবেতে মাইজলা বৌ,সাইঝলা বৌ,ভাই বেরাদার যত,
তামাম মুনিষ্যেরে হাচান তুষ্ট করল সাধ্য মত।

দোহার। হাচানের গুমান বাড়িল।
হায়রে হাচান হায়,
সওদাগরী কইর্যা ফেরে হাচান মেঞা বাই।

---

(১৫) উনুন (১৬) জালাইবেন।

বয়াতী । হায় হায়রে,
ত্থাশের মইধ্যে সোর পইলো হাচান সদাগর,
যেমুন পূবদিগালে উদয়গো ভান্নুর চৌদিগে পাসর।

দোহার । বুদ্ধিমন্ত মানুষ অইলো হাচান সদাগর,
বাণিজ্য কইর‍্যা আনে রত্তন বহুতর।

বয়াতী । এক দিনেতে সরোবরে হাচান ত্থাহে চাইয়্যা চাইয়্যা,
শাহজাদী আসমানতারা
তারে দেইখ্যা হাসে রইয়্যা রইয়্যা।
সেইনা রূপ দেইখ্যা হাচান তহন উন্মত্ত হইলো,
ঘরে ফির‍্যা হাচান তহন কীরা এক কাটিল।
হাচান কয়, এইনা কইন্যা যদি আমার নাই অয়,
জীয়ন্তে শেল লইমু শোনগো নিচ্চয়।
এই না বাক্য শুন্যারে হাচানের বড় ভাই
কানে দিল হাত,
বলে, শোনলে বাদশায় এই না কথা, ঘটাবে বিষাদ।
অগো আরশী কান্দে পড়শী কান্দে
তারা কান্দে রইয়্যা রইয়্যা,
হাচানের মায়ে কান্দে বুঝি শানে পাছাড় খাইয়্যা।
কত না বুঝায় হেনারা কথার না অয় শ্যাষ,
অবশ্যাষে ঘটকেরে কহিল বিশ্যাষ।

দোহার । হারে কান্দে হাচান সাদীর লাইগ্যা।

বয়াতী । হায়রে এই দিগেতে ঘটক সাইব রাজপুরীতে যায়,
চাইরখান মাণিক্য থুইয়্যা আলেকুম জানায়।
চাইর মাণিক্য না দেইখ্যা বাদশায় সন্দ মোনে মোনে,
ঠগবাজ জুয়াচ্চোর বুঝি না অবে ক্যামুনে।
এই না ভাইব্যা বাদশা ঘটকরে ডাকিল,
মাণিক্যের বিবরণ সবিশেষ চাইলো।

সুযোগ বুইঝ্যা ঘটক সাইব তার আরজি করে পেশ,
আসল কথা গোপন রাইখ্যা মিথ্যা ঢালে বেশ।
ঘটক কয়, তুমি বাদশা কয় মাণিক্যের
হওবা অধিকারী,
অগুন্তি মাণিক্যের খবর তোমারে আমি দেবার পারি।
এই না বার্তা শুন্যা রাজা সোহাগে ভাসিল,
সমুদায় বিত্তান্ত তহন কহিতে বলিল।

দোহার। হায় হায়রে ঘটক তহন কইতে লাগিল,
কোন্‌খানেতে ক্যামুন কইর‍্যা হাচান
শক্তিমান হইলো।
ঘটক তহন কহিতে লাগিল।

বয়াতী। শুন শুন বাদশা তুমি সগ্‌লেরই পিতা,
এ হেন সদাগরে তুমি না কর ক্যান জামাতা।
জহির মেঞা সদাগর এই ত্থাশেতেই ছিল,
তার যে বেটা হাচান মেঞা বানিজ্যে গেছিল।
সেই না হাচান মিঞা ফির‍্যা আইয়্যা
সাদী করবার চায়,
রূপে গুণে কুলে ধইন্যা তোমারি কইন্যায়।
অভয় দিলে নিঃভবসায কইবারে যে পারি,
এমন পাত্তর পাবানা তুমি তামাম ঢুইন্যা ঢুরি।
এই না কথা শুন্যারে বাদশা তহন ভাবে মনে মন,
ক্যামুন ক্ষমতা পাইছে বেটায় দেখমুনি এহন।
বাদশা কয়, ঘটকের পো বলিযে তোমায়,
আমার কইন্যার রূপের খবর জোড়া ভুবন ময়।
সেই না কইন্যা আমার দিব এমন লোকের হস্তে,
যে পারবে করতে তৈয়ার পাক্কা সড়ক
এক রাত্তিরের মইধ্যে।

পাকা সড়ক অইবে শোন ষোল হাত দীঘল,
পথের পাশে পাবে শোভা মিঠা মিঠা ফল।
সেই না গাছে বইবে আইয়্যা কাউয়্যা কুকিলা,
পক্ষির শোরে আমার নিদ্রা যাবে ভাইঙ্গা।
শোন বাপু ঘটকসাইব শোন দিয়া মোন,
এই কম্ম না করার পারলে হের বধিব জীবন।
বার্তা শুন্যা ঘটক সাইব তার দাড়িতে দেয় হাত,
হাচানের বড় ভাইর মাথায় যেন পড়ে বজ্জর পাত।

দোহার। হায় কান্দেরে হাচানের মায়,
হাচানের বুঝি প্রাণও যায়.
এমন বিষম কথা কেউনি শুন্যাছে ?

বয়াতী। বার্তা পাইয়্যা হাচান মেঞা মিটর মিটির চায়,
অঙ্গুরীর দোয়াতে হাচান পিরতিজ্ঞা পুরায়।
হায় হায়রে সড়ক বানায় হাচান মেঞা
রাজবাড়ির লাগায়,
তার ওই পাশে বিরিক্ষি সগল
ক্যামুন শোভা পায়।
শোভা পায় পুষ্পরাজি বিরিক্ষে মিষ্টিফল,
সেই না বিরিক্ষে রইয়্যা শোরে কাককুকিলার দল।
কাক কুকিলের শোরে বাদশার নিদ্রা ভাইঙ্গা যায়,
ফয়জোরে উইঠ্যা বাদশায় অবাক হইয়্যা চায়।
ভাবে, এইনা মুনিষ্যের হস্তে কন্যা দেওন যায়,
ঘটকেরে ডাইক্যা বাদশা অনুমতি স্থায়।

দোহার। হাচান সাদী করতে যায়।
সাদী করতে চলে হাচন পাল্কীতে চাইপ্যা,
বাজী বন্ধুক ছোটায় কেউ, ছোটায় রইয়্যা রইয়্যা।
ও হাচান সাদী করতে যায়।

বয়াতী । হায় হায়রে হাচান সাদী করল কইন্যা আসমানতারা,
রূপেগুণে যেমুন তেমুন মইধ্যেতে বিষ ভরা।
আসমানের বদন যেমুন বা আহাশেরও চন্দর,
কাঁচিহলদির বন্ন গাত্রের যৈবনও সোন্দর।
ম্যাঘের মতন কালা ক্যাশ খোপাতে শোভিল,
সেইনা রূপের ঠমক দেইখ্যা হাচান
কাফালে[১৭] পড়িল।

দোহার । শোনরে হাচান হায়,
কাফালে পইড়্যা গ্যাল হাচান মেঞা বাই।
আল্লী আল্লী হায়, হায়।

বয়াতী । সোন্দর আদন, সোন্দর বদন, সোন্দর কইন্যার হাসি,
সেই না হাসির প্যাচে পইর‍্যা হাচান গলে পরল ফাঁসি।
(হারে) নারী হাসি, নারী ফাঁসি, নারী মহাপাপ,
নারী খুশী; নারী তুষি, নারী অভিশাপ।

দোহার । আহা হায় হায়।

বয়াতী । (হারে) উচ কপালী, চিরল দাঁতী, পিঙ্গলা মাথার ক্যাশ,
হেইনা নারী সাদী করলে দুঃখের না অয় শ্যাষ।

দোহার । শোনরে হাচান হায়,
পুষ্পের মধ্যি সাপ লুকাইয়্যা রয়।

বয়াতী । আহা সাদী কইর‍্যা বাদশাজাদী
হাচান ঘরে আসে ফির‍্যা,
আসমানতারার চোরাবালিতে
পইলো আছাড় খাইয়্যা।
সতী নারীর পতি যেমুন মজিদেরি চূড়া,
অসইত্যা নারীর পতি তেমুন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।

দোহার । হায়, হায়, হায়।

---

১৭) বিপদ—বিভ্রান্তি

বয়াতী । হায়রে দুঃখের কথা কইবা কারে, দুঃখুতে বুক ফাটে,
হেইনা কইন্যার আসনাই[১৮] ছিল সেনাপতির লগে ।
ছলা কলা কইর‍্যা কইন্যায় হাচানরে ভুলাইলো,
ফেরেববাজি [১৯] কইর‍্যা শ্যাষে আংটি খুল্যা নিল ।
যাদু আঙ্গুট হাতে পইর‍্যা কইন্যায় পলাইয়্যা যায়,
ফযজোরে উঠ্যা হাচান করে হায় হায় ।

দোহার । শোনরে হাচান হায়,
কলিজা ফাইট্যা যায় তোর দুঃখেরই জ্বালায় ।

বয়াতী । রাইত পোয়াইলো ফার্শা অইলো
খবর আইলো রাজপুরীর মইধ্যে,
কইন্যা আইন্যা দ্যাও বইল্যা বাদশায়
হাচানেরে বান্ধে ।
মাজায় দড়ি দিয়া সেপাই হাচানেরে করে বন্দী,
বোকা হাচানের মস্তকে এহন না আইসে কোন ফন্দী ।

দোহার । হায় হায়রে—
কলিজা ফাইট্যা যায় হাচানের ব্যাথায় ।

বয়াতী । এ দিগেতে এক নিশাতে যুক্তি করে
বিলাই আর ইন্দুরে,
সুরঙ্গ কাইট্যা সোজা ঢোকে কারাগারে ।

দোহার । হায়, হায়, হায় ।

বয়াতী । হাচানেরে দেইখ্যা বিলাইয়ের দুঃক্ষুতে বুক ফাটে,
আহা বুকের উপর দিয়া পাষাণ হাচানেরে থুইছে ।
বিলাইরে দেইখ্যা হাচানের চৌখ্খে আসে পানি,
ধাইড়া ইন্দুর শোনে বইয়্যা আসমানের কাহিনী ।
শুন্যা এই সব কেচ্ছা দুই জনায় যাত্রা যে করিল,
সত্ত[২০] সাগর পাড়ে গিয়া দরশন দিল ।

---

(১৮) গুপ্তপ্রণয়, (১৯) শয়তানী (২০) সপ্ত = সাত ।

দোহার। হায় হায়রে—
বিলাই ইন্দুর দুইও জনায় দেখিতে পাইলো,
দেইখ্যা দেইখ্যা দুইজনায় সেনাপতির
গোপন ঘরের ভিতারে ঢুকিল।
আল্লী আল্লী হায় হায়।

বয়াতী। হারে দুইজনাতে যুক্তি কইর‍্যা
ইন্দুর বুঝি থাকে পাতোলে,
ধলা[21] বিলাই রইলো গিয়া আসমানতারার লগে।
একদিনেতে নিশৈতি রাইতে
বিলায় ছ্যাহে চাইয়্যা চাইয়্যা,
আসমানতারায় ঘুমাইয়্যা রইছে
সেই অঙ্গুরী মুখের মইধ্যে থুইয়্যা।
বিলাই কয়, শোনরে বাই
এই মাইয়্যাতো বড়ই সিয়ানা,
আংটি লওনের সুলুক[22] কিছু না পাইলাম খুঁইজ্যা।

দোহার। হায়রে বিষম চিন্তায় পইড়্যা গ্যাল বন্ধু দুইও জনায়,
আংটি সোজায় দেবে না সে কইন্যা আসমানতারায়।
হায় হায়রে,
বৈষম চিন্তায় লাইগ্যা গ্যাল বন্ধু দুইওজনায়।

বয়াতী। যাহা মুশকিল তাহা আছান শোনরে হাচান মেঞা,
কী কুক্ষণে সাদী করলি বেবাইজ্যা এক মাইয়্যা।
এই না ভাইব্যা বিলাই ইন্দুর যুক্তি যে করিল,
নিশৈত রাইতে দুইজনাতে হেরগে শোয়ার ঘরে
গোপনে ঢুকিল।
ঘরে ঢুইক্যা অবাক মানল ইন্দুর মহাশয়,
ক্যামুনে পাইবে আঙ্গুরী-রত্তন কে-বা হেরে কয়।

---

(২১) সাদা (২২) সন্ধান=উপায়

অনেক ভাবে ভাইব্যা ইন্দুর তহন

তার ল্যাজ বাড়াইলো,

ল্যাজ দিয়া কইন্যার নাহের ভিতার সুড়সুড়ি যে দিল।

সুড়সুড়ি পাইয়া কইন্যায় ফ্যাচ্চরৎ[২৩] যেই কইলো,

আচমকা মুখের থিকা আঙ্গুটটা তার

হেই লগ্‌গানেই পইলো।

ইন্দুর ছিল কাছ পিঠালে আঙ্গুট পাইয়া দৌড়,

আসমানতারায় জাইগ্যা তহন লাগায় বিষম শোর।

দোহার। হারে শোরগোল করে কইন্যা আসমানতারা.

সেনাপতিমশাই তহন দিনে ঘ্যাহেন তারা।

বয়াতী। আঙ্গুট নিয়া বিলাই ইন্দুর তহন সাঁতার ঘ্যায় জলে,

কিছুদূর গ্যালে বোয়াল মাছে গেললো ইন্দুরডারে।

দোহার। হায় হায়রে।

বয়াতী। নিদয় বিধিরে—।

দোহার। কী দোষে হারাইলাম সাথী সাইগরের জলে।

বয়াতী। হারে এমন দুক্ষের কথা কেউনি শুন্যাছ ?

দোহার। নিদয় বিধিরে—

কী দোষে হারাইলাম সাথী সাইগরেরই জলে।

আল্লী আল্লী হায় হায়।

বয়াতী। আইলাম মোরা দুইওজনে প্রভুর কার্য তরে,

ক্যামনে যাইমু মুই একা ফির‍্যা ঘরে ?

'হায়রে আমার বন্ধু' বইল্যা

বিলাই তহন কান্দিতে লাগিল,

বন্ধু মোরে ক্যানবা ছাইড়্যা গ্যাল।

দোহার। নিদয় বিধিরে,

কি দোষে হারাইলান সাথী পথের মইধ্যখানে।

---

(২৩) হ্যাঁচ্‌ করে হেঁচে ফেলার শব্দ।

বয়াতী। বিলাই কাইন্দা কয়, পরাণে কত বা সয়
একে একে সগ্‌গলই বিদায়।
শোন বন্ধু কই তোমারে, তুমি না ফির‍্যা গ্যালে
প্রভুর আমার কী অবে উপায়।

দোহার। নিদয় বিধিরে,
কী দোষে হারাইলাম সাথী পথের মধ্যিখানে।

বয়াতী। আমি অনাথ, প্রভু অনাথ, একই সাথে তিন অনাথ
দুক্ষের নাই কোন শ্যাষ।
এই না ভাইব্যা বিলাই তহন. বাজারে ধাইয়্যা যায়
জুৎ[২৪] কইর‍্যা থাহে জাইল্যার পাশ।

দোহার। নিদয় বিধিরে,
কী দোষে হারাইলাম সাথী সাইগরের জলেতে।

বয়াতী। (হারে) বিধির নিব্বন্ধ বল, কে বুঝিতে পারে বল
অচিরাৎ বন্দী অইলো বোয়াল মাছ।
বোয়ালরে নি কাইট্যা জাইল্যা,
নাড়ীভুড়ি ফ্যালে টাইন্যা,
পেরকাশ অইলো ইন্দুররাজ॥
ইন্দুররে না পাইয়্যা বিলাই, মনে না ভাইব্যা সংশয়
দৌড়াইলো মেঞাজীর কাছ।
অঙ্গুরী না পাইয়্যা হাচান, সগল দুক্ষের অইলো আছান
গজরাইলো[২৫] যেমুন পশুরাজ॥

দোহার। হায়রে হাচানের দুক্ষু অইল দূর,
ম্যাঘের শ্যাষে যেমুন উদিল রদ্দুর।

বয়াতী। আঙ্গুট পাইয়্যা হাচান মেঞার কোমরে আইলো বল,
সেই দণ্ডে বোলাইয়া[২৬] আনল, বাদশা, উজির সগ্‌গল।

---

(২৪) চুপটি করে। (২৫) গর্জন করিয়া উঠিল=হুঙ্কার ছাড়িল।
(২৬) ডাকিয়া আনিল।

হাচান কয়, শোন বাদশা বলিযে তুমায়,
তোমার মাইয়্যা আসমানতারা মুনিষ্য না অয়।
যেইনা নারী পতি থুইয়্যা পরপুরুষে ধায়,
খোদাতাল্লার খেদমতে[২৭] তায় দোজক[২৮] গমন অয়।
এই বাক্য না বইল্যা হাচান অঙ্গুরীরে কয়,
এই দণ্ডে লইয়্যা আইসো বান্দীরবাচ্ছা সেনাপতি
আর কুলটা আসমানতারায়।
উজির, নাজির, বাদশা, মুন্ত্রী তহন
ত্বাহে চাইয়্যা চাইয়্যা,
পালঙ্কের উপার দুইজনায় রইছে শুইয়্যা একস্তর হইয়্যা।

দোহার। হায় হায় হায়।

বয়াতী। এই সব না দেইখ্যা বাদাশার
গেলাণীতে[২৯] বুক ফাটে,
তলুয়ারের একখান কোপে দুইও জনায় কাটে।
মোনের দুঃখে বাদশা সাইব হজ করতে যায়,
কান্দিয়া হাচানেরে ধইর‍্যা রাজম্বে বসায়।

দোহার। বাদশা গ্যাল, বাদশা অইলো, হাচান মেঞা বাই,
তামাম মুনিষ্যের ঘুম ভাঙ্গাইলো ফয়জোরের সানাই।
হাচান মেঞা বাদশা অইলো শোনরে তোরা বাই,
আইসো এহন ক্ষ্যান্ত দিয়া গাজীর গান গাই।

বয়াতী। হাচান মেঞায় বাদশা অইলো দুশমনে পালায়,
দুম্ দুমা দুম্ কইর‍্যা নাচে তিন শয়তানের মায়।

দোহার। বাজে জয়ের বাজনা বাজে।

বয়াতী। এই সভা কইর‍্যা বইস্যাছেন যত হিন্দু মোছলমান,
হেনাগের চরণে মোরগে সেলাম বিত্তমান।

দোহার। বাজে জয়ের বাজন বাজে।

---

২৭ ইচ্ছায়-অনুশাসনে ২৮ নরক ২৯ গ্লানি-মনঃকষ্ট

বয়াতী। হাচানের মায় শুইয়া রইলো খ্যাতা[৩০] মুড়ায় দিয়া,
ধলা বিলাইডা উকি দিল খেঁচার মইধ্য দিয়া।
দোহার। বাজে জয়ের বাজনা বাজে।
বয়াতী। উগার[৩১] তলে ইন্দুর মশাই ক্যাতর কোতর করে,
ঘ্যার ঘ্যারাইয়া মনের সুখে আনন্দের ডাক ছাড়ে।
দোহার। বাজে জয়ের বাজনা বাজে।

॥ আলোচনা ॥

আসমানতারা গীত-কথাটি মূলতঃ রূপ-কথা ধর্মী। কিন্তু তা হলেও গীত-কথা বা Ballad-এর শ্রেণী থেকে বিচ্যুত বলা চলেনা। আমরা ক্রমান্বয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করছি।

গীতিকাটি আমরা সংগ্রহ করতে সমর্থ হই ১৯৪৬-খৃঃ অঃ ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) গোয়ালন্দঘাট স্টীমার স্টেশনে নিজামউদ্দীন সেখ নামে এক স্টীমার খালাশীর কাছ থেকে। তার বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ (বাংলাদেশের অন্তর্গত) জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার বাজিতপুর গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে গোয়ালন্দের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল।

তবে এর মূল রচয়িতা যে কে তা অনেক অনুসন্ধান করেও সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নিজামউদ্দিনও এটি তাদের গাঁয়ের কোন এক ফকিরের কাছ থেকে শুনেছে এই পর্যন্ত। লোক-গীতির দস্তুরই এই। কাহিনীর ভিতরকার অলৌকিক ঘটনাবলী বাদ দিলে এটিকে একটি নিখুঁত রসঘন উপাখ্যান বলতে বাধা নেই। সমাজের উঁচুতলার মানুষের নীচুমন এবং তাদের পারিবারিক ব্যাপার—গোপন প্রণয়ের কাহিনীই হ'ল এর মূল উপজীব্য। কিন্তু রূপকথার প্রভাবে এই বিষয়টা অনেটা চাপা পড়ে গেছে।

---

৩০ কন্থা-কাঁথা। ৩১ বাঁশের মাচা—যার উপর সংসারের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র রাখা হয়। অনেক সময় এর নিচেও অনেক জিনিসপত্র রাখা থাকে, নইলে ফাঁকাই থাকে।

অবশ্য বলতে বাধা নেই যে রীতিতে (form) এই গাথাটি সংগৃহীত হয়েছে এর অনুরূপও কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া যায়। বরিশালে এটি 'নয়ানতারা' নাম নিয়ে 'পরুন-কথা' বা রূপকথা রূপে প্রচলিত। অবশ্য এর মাঝে হাচানের বিয়ের পর রাজকন্যা কর্তৃক অঙ্গুরী অপহরণের যে কাহিনীটি বর্ণিত আছে তা এই সংগৃহীত গীত-কথাটিতে নেই।

বর্তমানে সংগৃহীত পাঠে-যেখানে বয়াতী বলছে ঃ—

"হায়রে-দুঃখের কথা কইবা কারডে···পলাইয়্যা যায়···" পৃষ্ঠা ৭৭ সেখানে কী-ভাবে যে হাচানের এত সাবধানতা সত্ত্বেও আসমানতারা তার কাছ থেকে অঙ্গুরি ছিনিয়ে নিল এ বিষয়ে ঠিক কিছুই বোঝা গেলনা। কিন্তু বরিশালের 'নয়ানতারা' নামক 'পরুন কথা' বা ফরিদপুরের 'দুষ্টা রাজকুমারী'র ভিতর রয়েছে ঃ—

"বিয়ের পর, নয়ানতারা সব সময়েই সদাগর পুত্রের চোখে চোখে থাকে। নয়ানতারাও এমন নিখুঁত অভিনয় করে চলে—যেন সদাগর-পুত্র ছাড়া সে এ পৃথিবীর আর কিছুই জানেনা।

দিন যায়। একদিন কথায় কথায় নয়ানতারা অভিমান করে বলে, তাকে বলতেই হবে তার গুপ্ত-শক্তির মূল উৎস সম্পর্কে। সদাগর পুত্র বহুদিন ধরে তাকে একটার পর একটা ধাপ্পা দিতে দিতে শেষটায় একদিন আর না বলে পারল না আংটির গুপ্ত রহস্য। ব্যাস্। আর যায় কোথায়? পরদিনই নয়ানতারা সদাগর পুত্রকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বেঁহুশ করে দিয়ে তার হাত থেকে অঙ্গুরিটি হস্তগত করে নেয় এবং পরদিনই সেনাপতির সঙ্গে গৃহত্যাগ করে···।"

এ ছাড়াও আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, কাহিনীর শেষের দিকে যেখানে হাচান অঙ্গুরী ফিরে পাবার পর রাজা, উজির সকলকে ডাকিয়ে তাদের সুমুখে এনে হাজির করল আসমানতারা এবং সেনাপতিকে এবং রাজা আত্মগ্লানীতে দগ্ধ হয়ে তলোয়ারের এক কোপে কুলটা কন্যা আসমাতারা এবং সেনাপতিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল :—

"এই সব না দেইখ্যা বাদশার·········রাজত্বে বসায়···।"পৃষ্ঠা ৮১ 'নয়ানতারা' লম্বাগীত বা আলাপনী গানে সেখানে গানের সুরে বলছে :—

"হারে কান্দিয়া আকুল হইলো নয়ানেরই বাপ,
বসুমতীর বুকে ওগো না সয় হেন পাপ।
না শুনিলা কাহারো মানা আইন করলো জারি,
অর্ধ অঙ্গ মাটিতে পোতে সেনাপতি আর কুলটা ঝিয়ারি।
ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ায় ছেনালী মাগীর,
চৌক্ষু দিয়া ঝরে পানি শয়তান সেনাপতির।
হারে এমন সুখের সংসার রাহুতে করল গ্রাস,
সদাগর পোয়ে রাজ্য দিয়া রাজা বনে করলা প্রবেশ।"

এই প্রসঙ্গে 'আসমানতারা' আর 'নয়ানতারা' সম্পর্কে একটা কথা বলা প্রয়োজন। 'আসমানতার' নামে যে গীতিকাটি এখানে সঙ্কলিত হয়েছে তার নায়ক বা নায়িকারা সকলেই মুসলমান সমাজের, কিন্তু 'নয়ানতারা'র কুশীলবেরা সকলেই হিন্দু।

এর একটা কারণ, মূল কাহিনীটি যে-ই বা যে সম্প্রদায়েরই রচনা হোক না কেন পরবর্তীকালে অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক আত্মস্মাৎ করা হয়েছে।

কিন্তু এতৎসত্বেও আরও একটা জিনিস ভেবে দেখা দরকার— 'নয়ানতারা'র কাহিনীর ভিতর কোথাও কোন মুসলমানী শব্দ বা চরিত্র নেই, কিন্তু আসমানতারা গীতিকাটির ভিতর হিন্দু সমাজের বহু চরিত্র এবং শব্দ ঢুকে পড়েছে ; যেমন—'ঘটক', 'রাজা', 'মন্ত্রী', 'সেনাপতি' প্রভৃতি। এতে সন্দেহ করা অন্যায় হবে না যে 'নয়ানতারা' রূপকথাটি অধিকতর পুরাতন। নতুবা এই গীতিকায় উল্লিখিত চরিত্রগুলি রাজার পরিবর্তে 'বাদশা' মন্ত্রীর পরিবর্তে 'উজির' ইত্যাদির ব্যবহার সঙ্গত হ'ত।

সংগৃহীত 'আসমানতারা' গীতিকাটি অবিকৃত ভাবেই 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৭০ বঃ অঃ শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

॥ ফুলবানু ॥

কাহিনী

সোনারপুরে জহিরুদ্দিন নামে ছিল এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান। দেশ-বিদেশে তার নাম ডাক যথেষ্ট। ঘরে ছিল অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী পরীবানু তার নাম। আর ছিল এক শিশুপুত্র।

পরীবানুর রূপের প্রশংসা সর্বত্র। কী তার চলন-বলন, কী সুন্দর তার মুখশ্রী। গায়ের রং যেন দুধে আলতা। এক কথায় রূপকথার রাজকন্যার মতোই তার দেহ সৌষ্ঠব।

এ-হেন পরীবানু যখন কলসী কাঁখে নিয়ে জলের ঘাটে যায়, যুবা বৃদ্ধ সকলেরই মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

একদিন পরীবানু যখন চলেছে জল আনতে হঠাৎ সে দেশের বাদশার নজরে পড়ে তার অসামান্য রূপ। বাদশা তখন থেকেই মনে মনে মতলব আঁটতে থাকে কী করে পরীবানুকে লাভ করা যায়।

পরদিন দরবারে ডেকে পাঠান জহিরুদ্দিনকে।

জহির সরল মানুষ। বাদশার ডাক পেয়ে মনে মনে পুলকিত হয়ে সে এসে হাজির হয় রাজসভায়।

বাদশা নানারকমের মিষ্ট সম্ভাষণের পর হঠাৎ প্রস্তাব দেয়,—দেখ ভাই জহির, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। অর্থাৎ তা'হলেই সে পরীবানুকে 'নিকাহ্' করতে পারে। এ-জন্য ধন-দৌলত সে যথেষ্টই দেবে।

জহির গরীব হলেও তার আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্রচণ্ড। বাদশার এই হীন প্রস্তাব শুনে সেই রাজসভার ভিতরেই দাঁড়িয়ে থুঃ থুঃ করে থুতু ফেলে বাদশার সুমুখ থেকে বেরিয়ে চলে আসে। বাদশাও সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুনিয়ে রাখে,—আচ্ছা দেখা যাবে।

জহির মনের দুঃখে ঘরে ফিরে স্ত্রীর কাছে সব খুলে বলে। শেষে দু'জনেই কেঁদে-কেটে ঘুমিয়ে পড়ে। আর সেই রাত্রেই বাদশার লোক

এসে জহিরকে হত্যা করে পরীবানুকে তুলে নিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় ঘরেও আগুন লাগিয়ে দিতে ভুল করে না। কিন্তু দৈব উপায়ে রক্ষা পায় তাদের শিশুপুত্র আত্তাপ।

রাজপুরুষেরা চলে যাবার পর তাদের বাড়ির পাশেই ছিল পরীবানুর এক দূর সম্পর্কীয়া বোন বাতাসী। সে এসে কুড়িয়ে নিয়ে যায় আত্তাপকে এবং সেই রাত্রেই সে শিশু সহ দেশান্তরী হয়ে চলে যায়। কালক্রমে লোকে দূর থেকে জহিরের পোড়া ভিটেটা দেখে আর শয়তান বাদশার কাহিনী স্মরণ করে মনে মনে তাকে গালাগালি করে, অভিশাপ দেয়।

দেখতে দেখতে জহিরুদ্দিন বা তার স্ত্রী-পুত্রের কথা লোকে ভুলেই গেল একরকম।

জহিরের কাহিনী এখানেই শেষ। শুরু হল নতুন কাহিনী।

সোনারপুরের কাছাকাছিই স্বরূপ নগর। বাতাসী আত্তাপকে নিয়ে এখানেই এসে আশ্রয় নেয় কোন এক বাড়িতে। বাতাসীর স্নেহে এবং পরিচর্যায় দিনে দিনে সে গাঁয়ের এক সেরা শক্তিশালী পুরুষ বলে গণ্য হতে থাকে। কাজ তার মাঠে মাঠে গরু চড়ান।

গরুগুলিকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে হিজল গাছের ছায়ায় বসে তন্ময় হয়ে আঁড়-বাঁশী বাজায় আর নজর রাখে মাঠের উপর পথের দিকে।

মাঠের পাশেই দীঘি। দীঘিতে জল ভরতে আসে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা। ফুলবানু সেই গাঁয়েরই মেয়ে। যেমনি অপরূপ তার চেহারা তেমনি সুমিষ্ট তার কণ্ঠস্বর। যে দেখে সেই মোহিত হয়ে যায়। জল নিতে এসে মুগ্ধ হয়ে শোনে আত্তাপের বাঁশী।

একদিন, দু'দিন করে একসময় চোখাচুখি হয় দু'জনের ভিতর। ইসারায় কী কথা হয় তা' তারাই জানে। তবে এরপর থেকে আত্তাপের বাঁশী না শুনলে ফুলবানু পাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। আত্তাপের অবস্থাও সঙ্গীন। ফুলবানুকে না দেখতে পেলে তার হাতের বাঁশী হাতেই থাকে—তা' থেকে আর সুর বের হতে চায় না।

অবশেষে এক নিভৃতে দুজনে দুজনের একান্ত কাছাকাছি এসে যায়।

চল্‌ল এইভাবেই কিছুদিন। হঠাৎ সেই দেশের যুবরাজ সন্তাপের নজর পড়ল ফুলবানুর উপর। সে গিয়ে ফুলবানুর বাবা কফিলদ্দির কাছে প্রস্তাব দিল তার মেয়েকে সে সাদী করতে চায়। সে বলে,—আমি বাদশা হ'লে তোমার মেয়েই হবে আমার প্রধানা বেগম।

সন্তাপ ভেবেছিল, তার এতবড় প্রস্তাব কফিলদ্দির মত নিঃস্ব কৃষাণের পক্ষে ঠেলে ফেলাত' সম্ভব হবেই না, উপরন্তু সে খুব খুশীই হবে।

কিন্তু কার্যকালে ফল হ'ল বিপরীত। কফিলদ্দি সাফ্ জানিয়ে দিল,—না। তোমার বাবা অত্যন্ত অত্যাচারী। খাজনা না দিতে পারলে প্রজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেশ ছাড়া করে দেয়। এ হেন লোকের ছেলের সঙ্গে কিছুতেই আমার মেয়ের সাদী দেব না।

জবাব শুনে সন্তাপ বেশ রাগ হয়েই ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু এর ক'দিন পরেই পিতার রাজকীয় ক্ষমতার দৌলতে একরকম প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এলো ফুলবানুকে। তারপর মোল্লা ডাকিয়ে সেই দিনেই বিরাট হৈ-চৈ-এর মধ্যে সাঙ্গ করল তার সাদী পর্ব।

এবারে সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু একটানা সুখ ভোগ বুঝি কারও বরাতেই জোটে না। সন্তাপের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম নয়। সে পিতৃ-ক্ষমতা বলে ফুল-বানুকে সাদী করে নিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু অমন যে ফুলের মত চেহারা, গোলাপের বর্ণ ফুলবানুর সব যেন অঙ্গারের মত কালো হয়ে যাচ্ছে দিনের দিন। দেখলে মনে হয়, বুঝি রাহুগ্রস্ত চাঁদ। সন্তাপ অনেক বোঝায়, কিন্তু কিছুতেই ফুলবানুর মনের নাগাল পায় না।

ফুলবানু যেন রাজপুরীতে বন্দিনী রাজনন্দিনী। আহারে রুচি নেই, পরিধানে নেই কোন পরিপাট্য, সংসারের উপরও নেই কোন আকর্ষণ। সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকে যেন কিসের জন্য।

হঠাৎ একদিন গভীর নিশিথে তার কানে আসে সেই প্রাণ মাতানো বাঁশীর সুর—যে বাঁশী শুনলে সে ইহকাল পরকালের কথা নিমিষে বিস্মরণ হয়ে যায়। রাজপুরীর অদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে

আত্তাপ বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। বাঁশার সুরে সুরে কত না কথা। ফুলবানুও বাঁশীর সুরের প্রত্যুত্তরে বলে ওঠে,—বন্ধু, তোমার বাঁশী শুনবার জন্যই ত আমি এখনও বেঁচে আছি। এ-জীবন, মন সবইতো তোমার জন্যই। আজ ভাগ্যদোষে আমার দেহটা এই চার দেওয়ালের মধ্যে আটকা থাকলেও আমার মন, প্রাণ সবইতো তোমাতে সমর্পিত। তুমি আমায় ভুল বুঝো না।

সে দিনের মত বাঁশী থেমে যায়। সন্তাপ আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করে। নিজের কাজের জন্য অনুশোচনা আসে। বলে, প্রিয়ে, পুরনো কথা সব ভুলে যাও। এখন থেকে নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা কর।

ফুলবানু তার কোন কথারই প্রতিবাদ করে না। কিন্তু পরের দিন আবার ঠিক সেই একই সময়ে শোনা যায় আত্তাপের বাঁশী। ফুলবানু ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে চলে,—বন্ধু, তোমার বাঁশী শুনে আমি পাগোল হয়ে গেছি। আজ আমার দেবার মত কিছু আর অবশিষ্ট নেই, তবু তুমি আমার অন্তরের ভালবাসাটুকুই গ্রহণ করে আমায় ক্ষমা কোরো।

দূরে দাঁড়িয়ে সবই লক্ষ্য করছিল সন্তাপ। কাছে এগিয়ে এসে দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে ফুলবানু।

সন্তাপ ফুলবানুর এক খানা হাত ধরে তার সুমুখে এনে বলতে থাকে,—কেন মিছি মিছি নিজের মনে কষ্ট পাচ্ছ? ভুলে যাও অতীতের সব কথা। নতুন ভাবে সবকিছুকে গ্রহণ করতে চেষ্টা কর।

এইভাবে সন্তাপ যখন ফুলবানুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে হঠাৎ শোনা গেল টিকারার ধ্বনি আর সেই সঙ্গে একটা শোরগোল,—'ডাকু আইছে—ডাকু—'।

সন্তাপ চেয়ে দেখে, দড়ির মই বেয়ে ছাতে উঠে আসছে ডাকাত দলপতি। হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে তার সমুখে এসে দাঁড়ায় আত্তাপ। ফুলবানুর মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সন্তাপও নিজের তলোয়ার নিয়ে গর্জে ওঠে।

শুরু হয় দুই পালোয়ানের তলোয়ারের লড়াই। একসময় সন্তাপ নিজের হাতের তরবারি ফেলে দিয়ে বলে ওঠে,—দেখ ভাই, এক আকাশে যেমন দুই সূর্যের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তেমনি ফুলবানুরও দুই প্রেমাস্পদ থাকা সম্ভব নয়। ফুলবানু আমাদের দু'জনের সামনেই উপস্থিত আছে, তাকেই জিজ্ঞেস কর, সে যাকে পছন্দ করে সেই হবে তার প্রকৃত মালিক।

সন্তাপের কথায় আন্তাপ সক্রোধে তলোয়ার নিয়ে তাকে তাড়া করে। সন্তাপ যদি প্রস্তুত না থাকত তা'হলে হয়তো আন্তাপের তরবারির এক আঘাতেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত তার মস্তক এবং দেহ।

সন্তাপ তার তরবারি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল আন্তাপের উপর। চল্‌ল দুই বীরের লড়াই সিংহ বিক্রমে। এক একসময় মনে হয় বুঝিবা সন্তাপ কখনও বা মনে হয় আন্তাপই শেষ হয়ে গেল। দূর থেকে নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকে ফুলবানু। হঠাৎ সন্তাপের তরবারির এক আঘাতে আন্তাপের মুণ্ডু খসে পড়ল তার দেহ থেকে।

এদিকে পাগলের মত নিচে থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয় সন্তাপের মা পরীবানু। কিভাবে যেন জানতে পেরেছে তার প্রথম যৌবনের প্রথম সন্তান আন্তাপ আজ এসেছে এতদিন পর—যাকে একবার মাত্র দেখবার জন্য বাদশার অগোচরে বহু অর্থ ব্যয় করেছে, কিন্তু তার দেখা পায়নি। কিন্তু বড়ই দেরী হয়ে গেল।

পরীবানু কাঁদতে কাঁদতে প্রকাশ করে, 'তার অতীত জীবনের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী। দু'জনেই শোকে অভিভূত। পরীবানু এগিয়ে যায় আন্তাপের মৃত দেহকে কোলে নেবার জন্য। দেখে, তাদের কথা-বার্তার ফাঁকে কোন এক মুহূর্তে ফুলবানু তার বিষ ছুরিকা দিয়ে আত্মঘাতী হয়ে ঢলে পড়েছে আন্তাপের বুকের উপর।

কান্না শুরু হয় পরীবানুর মৃত পুত্রের নির্জিব দেহটাকে কোলে নিয়ে। অদূরে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকে সন্তাপ।

।। কাব্য ।।

(এক)

আরে এ আহায় এ,
মোল্লা, মুন্সী, বাদশা, কাজী শোনেন দিয়া মোন,
সোনারপুরের বার্তা কিছু করি নিবেদন।
এই না ছ্যাশে ছিল মর্দ এক জহিরুদ্দিন যার নাম,
ছ্যাশে ধইন্য বিত্তাশ মাইন্য চৌদীঘালে[১] হের নাম।
ঝাউ বিরিক্ষের[২] মতন মাথা খাড়া[৩] আসমান[৪],
হস্তপদ য্যামুন ত্যামুন বক্ষটা পাষাণ।
(হারে) হেই না জহিরুদ্দিনের বিবি পরীবানু যের নাম,
রূপের কথা কতবা কমু অঙ্গডা সুঠাম।
সোনার বন্ন পরীবানুর নামে গুণে ধইন্যা,
চান্দের মতন বদন তার ওষ্ঠ ত্যালাকুচ্যা।
হস্তের আঙ্গুল দীঘাল দীঘাল[৫] ব্যালন বাইগুণের[৬] মত,
বক্ষের উপার পদ্ম দুইডা বিল্বি ফলের মত।
গলাতে হাঁসুলী তাঁর নাহে নাক ঠাশা,
হস্তের বাজু য্যামুন ত্যামুন কমরে গোট.ছড়া।
পন্থ দিয়া হাটে যহন মল খাড়ু পায় দিয়া,
বিষম খায় গাবুর[৭] মুনিষ্যে ছ্যাহে চাইয়্যা চাইয়্যা।
(হারে) একদিনেতে ব্যালা শ্যাষে পরীবানু চলে জলের ঘাটে,
সেই না কালে পন্থ দিয়া বাদশা চলে অশ্ব পৃষ্ঠে।
অশ্বপৃষ্ঠে রইয়্যা বাদশা ছ্যাহে জলের ঘাটে,
আহাশেরই[৮] চন্দর[৯] বুঝিবা নাইম্যাছে পাতোলে।

---

(১) চারদিকে, (২) গাছ (৩) সোজা (৪) আকাশ (৫) দীর্ঘ—বড়—ও লম্বা (৬) বেগুন (৭) যোয়ান (৮) আকাশ (৯) চাঁদ

কী হেরিল, কী শুনিল বাদশায় কিছুই নাই কয়,
নিশি-পরভাতে রাজসভাতে জহিররে বোলায়।
রাজ-সোমাচার[১০] পাইয়্যা জহির মোনে মোনে গোণে,
এতদিনে বুঝিবা বাদশার নেকনজরে পড়ে।
গদগদ ভাবে জহির দরবারেতে ধায়.
দেইখ্যা বাদশায় তারে বড় আসন ছায়।
বাদশা কয়, জহির মেঞা তুমি আমি
দোস্ত অনেক দিনকার.
একখান কর্ম করন লাগে (হেইলে)
সুখে থাকবা জীবনভর।
হাইস্যা কয় জহির মেঞা, কী কাম[১১] বা করমু,
তুমি মোরগো ছাশের মাথা যা কবা তা হুনমু[১২]।
বাদশায় কয়, শোন দোস্ত, কর্ম কঠিন কিছুই নাই কমু,
এই দণ্ডেই তালাক্ ছ্যাও তোমার বিবি পরীবানু।
ভাইব্যা দেইখ্যা দোস্ত, এই কইলাম সার,
যে কোনো দৌলাত[১৩] দিমু রত্তন বহুতর।
শুইন্যা বাদশার কথা, জহির মেঞা ওঠে তেইজ্যা
থুক্ কইর‍্যা ফ্যালায় ছ্যাপ[১৪] দরবার মইধ্যেখানে।
জহির কয়, দুষ্টামতি, অনাচারী তুমিই ছাশের পতি,
পরের ইস্তিরী[১৫] পাবার আশা কইরো না সম্প্রতি।
বাদশায় কয়, হাচা কথা. কইলাম মুই সার,
আমার থাবার থিকা তোর নিস্তার নাই আর।
জহির কয়, সেলাম অগো সেলাম তোমার পায়,
ধরে মুণ্ডু থাকা তক[১৬] মুই না ডরাই বাদশায়।

(১০) বার্তা—ডাক (১১) কাজ (১২) শুনিব।
(১৩) ধন-রত্ন, (১৪) থুতু (১৫) স্ত্রী-পরিবার (১৬) পর্যন্ত

(হারে) এই না কথা কইয়্যারে জহির ঘরে ফির‍্যা যায়,
ঘরে ফির‍্যা জহির মেঞা বিবিরে বোলায়।
জহির কয়, শোন পেয়সী, কহিগো তোমায়,
আইজ নিশি পোহাইলে আরত ত্থাখা না পাবা আমায়।
দুশমন্ রাজার রাজ্যে বাঁচন বিষম দায়,
রক্ষকই ভক্ষক হইয়্যা গিলা খাবার চায়।
তোমার রূপের সৌরব পাইয়্যাছে বাদ্শায়,
বান্দীর বাচ্ছা তোমারেনি নিহা করবার চায়।
পরীবানু কাইন্দা কয় একথা শোনালে গোণা[১৭] অয়,
নসিবে যা আছে হে ত' খণ্ডান না যায়।
এই কথা না কইয়্যারে দুইজন বৈষম[১৮] নিদ্রা যায়,
ছয় মাসের শিশু আত্তাপ মইধ্যেতে ঘুমায়।
হায় হায়রে হায়,
আমি কী কইমু নতুন কথা কওনও না যায়,
জহির মেঞার কথা শোনলে পাষাণ ফাইট্যা যায়।
সেই নিশাতে শ্যাষ পহের ম্যাঘে আন্ধার করে
তামাম দুনিয়া,
দুশমন বাদশার দাগাবাজীতে মরল জহিরুদিন মেঞা।
সুখে নিদ্রা যায় বুঝি জহিরুদ্দিন মেঞা,
চুলে ধইর‍্যা উঠায় তারে কাঁথার উপার থিকা।
(হারে) শোর[১৯] করনের আগেই তারা জহিররে কোপায়,
অষ্টজন মুনিষ্যে তহন পরীবানুরে পাল্কীতে ওঠায়।
পাল্কীতে উঠাইয়্যা কইন্যায় তারা ঘরে আগুন দ্বায়,
আন্ধারে কোলের পোলা ছাইঞ্চা[২০] তে গড়ায়।

---

(১৭) দোষ (১৮) বিষম—এস্থলে গভীর ঘুমে অচেতন।
(১৯) হাঁক ডাক—চেঁচামেচি। (২০) ঘরের বাইরের দিকের ভূমি সংলগ্ন অংশ।

(হারে) আসমান অইতে মা ফাতিমা দোয়া যে হরিল[২১],
হেই[২২] না দোয়তে এক অঘটন ঘটিল।
ঘরে আগুন দিয়া দুশমন দৌড়াইয়্যা পালায়,
আগুনের তরাশে [২৩] ঘর পুইড়্যা সারা হয়।
আধপোড়া না অইতে অইতে দেয়ার[২৪] পানীর জোরে,
আগুন বুঝি নিভ্যা গ্যাল জহির মেঞার ঘরে।
বাতাসী বিবি ছিল পরীবানুর এক বুইন,
নৌড় [২৫] পাইড়্যা আইলো হেথায় না করিল গৈণ।
ঘরের পিছে ছাইঞ্চাতলায় পোলার [২৬] কান্দন শোনে,
এদিগ ওদিগ দেইখ্যা বাতাসী পোলা বুকে টানে।
পোলা কোলে তুইল্যা নিয়া বাতাসী
বস্তুর [২৭] দিয়া ঢাকে,
নৌড় পাইড়্যা গ্যাল নিয়া আপনারি খামারে[২৮]।
দুশমনের ভয় ভাইব্যা বাতাসী তহন
দ্যাশ ছাড়ে রাইত পোয়াবার আগে,
গেরাম ছাড়া অইলে পরে কাক কুকিলায় শোরে।[২৯]
রাইত পোয়াইলো ফার্শা অইলো লাগল শোরগোল,
জহির মেঞার দ্যাহডা পানিতে ফুইল্যা অইল ঢোল।
দ্যাশের মুনিষ্যে চাইয়্যা দ্যাহে[৩০] জহিরের আবস্থা,
বাদশার কাণ্ড দেইখ্যা কেউবা করে ফিসফিসানি কথা।
জহির মেঞা চইল্যা গ্যাল মুইছ্যা গ্যাল নিচ্চিন্ন অইয়্যা,
দ্যাশ্যের মুনিষ্যে বচ্ছর পরে তারে গ্যাল বেস্মরণ[৩১] অইয়্যা।
প্রেস্তাবনা[৩২] সাঙ্গ অইলো জহির মেঞার কথা,
একমনে শোনেন বইয়্যা নতুন প্রেস্তাবনা।

(২১) পাট ভেদে 'করিল'। (২২) সেই (২৩) ঝেজে (২৪) বর্ষা=বৃষ্টি
(২৫) দৌড় (২৬) বাচ্চা=ছেলে (২৭) বস্ত্র=কাপড় (২৮) বাড়িতে
(২৯) ডাক। (৩০) দেখে (৩১) ভুলে যাওয়া=বিস্মৃত হওয়া। (৩২) কাহিনী

(দুই)

হায় হায়রে এ-আহায়-এ,
স্বরূপনগরের কথা কিছু করি নিবেদন,
এমন আজগুবি সোমাচার কেউ শোনেনি কখন।
সোনারপুরের পাশাইল্যা[৩৩] গেরাম স্বরূপনগর নাম,
হেইনা ছ্যাশে আত্তাপউদ্দিনের বড়ই ডাক নাম।
ডাঙ্গরপোলা আত্তাপউদ্দিন রূপেগুণে ধইন্য,
ছ্যাশের মইধ্যে সেরা মুনিষ্যি বেহেস্তেরও[৩৪] মাইন্য।
হেইনা ডাঙ্গর পোলায় গরু চড়াইবার যায়,
হিজল বিরিক্ষের ছায়ায় বইয়্যা আড়-বাঁশী বাজায়।
আড়-বাঁশী বাজাইয়া আত্তাপ জলের ঘাটে ছ্যাহে,
হেইনা ঘাটে কলসী কাঁখে ফুলবানুও আইসে।
ফুলবানু ফুলেরি কইন্যা পুষ্পেরই সোমান,
পিরথিম[৩৫] ছাড়াইয়্যা তার বেহেস্তে পরমান।
বাপ ও মায়ের একই কইন্যা রূপেতে মাধুরী,
ভরা গঙের মতন যৈবন কইন্যা বিদ্যাধরী।
হেইনা কইন্যার নজর পইলো আত্তাপের উপার,
থির হইয়্যা চাইয়্যা রইলো ফুলবানু সুন্দার।
চৌক্ষে চৌক্ষে কি-বা কথা দুইও জনায় কয়,
ফুলবানুরে না ছ্যাখলে আত্তাপের পরাণ রাখা দায়।
দিনে দিনে আইসে যায় চৌক্ষে চৌক্ষে কথা,
একদিনের হুলকেতে[৩৬] আত্তাপ, কয়
মোনের ব্যাথা।
পানি ভর সুন্দরী কইন্যা পানিতে দিছ মন,
কাইল যা কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।

(৩৩) পাশাপাশি। (৩৪) স্বর্গ (৩৫) পৃথিবী (৩৬) সুযোগ

এই না কথা শুন্যারে ফুলবানু মুখে না কইয়্যা কথা,
ইসারাতে সমঝাইয়্যা[৩৭] ত্থায় মনেরি বারতা।
বাঁশের বাঁশী হইতাম দূতী লো পাইতাম মনে সুখ,
বাজনেরি ছলে দেতাম বন্ধু তোমার মুখে মুখ।
(রে বন্ধু তোমার মুখে মুখ)॥
আহার নিদ্রা ছাইড়া আত্তাপ ফেরে বনে বনে,
ফুলবানুর বদনখানি মোনে মোনে গোণে।
ঘাটেতে আইস্যা ফুলবানু তহন এদিক ওদিক চায়,
বন্ধুরে না দেইখ্যা আইজ কান্দন জুইড়া ত্থায়।
আমার উদ্দিসে বন্ধুরে আরে দুঃক্ষু বাজাও মোহন বাঁশী,
আমার আসার আশেরে
আরে দুঃক্ষু থাক বিরিক্ষি তলে বসি।
কান্দিয়া বাঁশীর সুরে রে
হায়রে বন্ধু কও যে মোনের কথা,
তোমার কান্দন শুইন্যারে
আরে দুঃক্ষু আমার চিত্তে হইলো ব্যাথা।
হারে এইনা কথা কইয়্যারে কইন্যা কলসী নিল কাঁখে,
বিন্যা গাছের ঝোপের থিকা সুজন বন্ধু ত্থাখে।
আউগাইয়্যা সোনার বন্ধু হস্ত ধরে তার,
কলসী লামাইয়্যা কইন্যা কহে সোমাচার।
আউলাইয়া মাথার বেণী লোটাইয়া ভূমি তলে,
সুন্দরী কইন্যারে তুল্যা নিল আত্তাপ
নিজের বক্ষের পরে।
কয় মাস অইলো গত কিছুই নাই গণি,
জলের ঘাটে চলে সুন্দরী কক্ষেতে গাগরী।

(৩৭) জানাইয়া বা বুঝাইয়া দেয়

রাজার বেটা সন্তাপউদ্দিনের
নজরে পইলো ফুলবানু সুন্দরী।
সন্তাপউদ্দিন নাম তার রাজার কুমার,
ঘোড়াতে চাইপ্যা সে ফেরে দেশ দেশান্তর।
হেইনা কালে সন্তাপউদ্দিন একদৃষ্টে
থাহে চাইয়্যা চাইয়্যা,
আসমানেরই হুরী য্যামুন আইস্যাছে নামিয়া।
সেইনা কইন্যার রূপ দেইখ্যা সন্তাপ
হের বাজানেরে কয় বিনয় হইর‍্যা,
তোমার কইন্যার সাদী দিলে রাণী করমু
আমি রাজা হইয়্যা।
কফিলদ্দি যুয়ান মর্দ[৩৮] থ্যাশ বিথ্যাশে নাম,
সন্তাপের কথায় মেঞা অইলো খান্ খান্।
কফিলদ্দি কয়, মেঞা তোমারে সেলাম মান্য করি,
আমার মাইয়্যার আশা ছাড় এই আর্জি করি।
তোমার বাজান[৩৯] রাজা থ্যাশের
সগ্‌গল মুনিষ্যেই জানে,
খাজনা বাকী পরলেই পেরজার
তহন তহনি তারে বান্ধে।
হেইনা ঘরে শোন বাপু মাইয়্যা দিমুনা,
ঘরের ছাওয়াল[৪০] ঘরে যাও গৈণ[৪১] কইরো না।
আইচ্ছা মেঞা সাবাস বাই সজুত[৪২] হইয়্যা রইও,
কাইল নিশিথে লইয়্যা যাইমু
তোমার মাইয়্যা সামাল দিও।

---

(৩৮) পালোয়ান (৩৯) বাপজান—পিতা (৪০) ছেলে
(৪১) বিলম্ব—দেরী। (৪২) সাবধান

হায় হায়রে—

এই না কথা কইয়্যা সন্তাপ বাজানের ডে কয়,
বাজানের ক্ষেমতার চোটে ফুলবানুরে আনায়।
ফুলবানুরে আনাইতে সন্তাপ ষোল বেহারা জোড়ে,
পাল্কীতে না উইঠ্যা কইন্যায় হাপুস্ হুপুস্ কান্দে।
হারে ছাইড়্যা যায় চেনা ঘাট দীঘি ঘর দুয়ার,
দ্যাশের চৌহদ্দি[৪৩] ছাড়াইয়্যা' কান্দে ফুলবানু সুন্দার।
বন্ধুরে, আমি চললাম বিদ্যাশেতে
তুমি থাইকো সুখবাসে,
দিনান্তেতে আমারি নাম লইও।
ও বন্ধু পঙ্খী হইয়া যাইতাম উইড়্যা
মুই কুলের কুলবালা,
কইতাম আমার মোনের দুঃখু কান্দিয়া কান্দিয়া।
(রে বন্ধু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥)
সোনা নয়, রূপাও নয় যে অঞ্চলে রাখিব,
বসিয়া বিরলে বন্ধু চাঁদ-মুখ দেখিব।
(রে বন্ধু চাঁদ-মুখ দেখিব ॥)
আসমানে চাইয়্যারে বন্ধু রাখিও স্মরণে,
তোমারে না পাইয়্যা মুই না বাঁচি পরাণে ;
তুমি হইও হিজল গাছ বন্ধু, আমি তো গুলঞ্চলতা,
তোমারে জড়াইয়্যা রইমু মুই দুইও বাহু দিয়া।
(রে বন্ধু আমার বাহু দিয়া ॥)
দুশমন রাজার লোক নিদয়া পাষাণী,
তোমারে না পাইয়্যা মুই, পাইলাম পেরসানী[৪৪]।
(রে বন্ধু পাইলাম পেরসানী ॥)

---

(৪৩) সীমানা (৪৪) কষ্ট

(হারে) ফুলবানুরে আনাইয়্যা সন্তাপ একদিন সাদী যে করিল,
রাজপুরীতে বাইদ্যভাণ্ড বাজিতে লাগিল।
পাশাখেলা, সিন্দুর খেলা, শরবৎ খাওয়া খাউই,
সগল কর্ম সমাধা কইর‍্যা সন্তাপ মোছে কপালের পানি।

(তিন)

হায় হায়রে এ আহায় এ
ম্যাঘের শ্যাষে চান্দের উদয় য্যামুন খড়ার[৪৫]
শ্যাষে বাইষ্যা[৪৬],
রাজপুরীতে আইয়্যা কইন্যা কান্দে রইয়্যা রইয়্যা।
খায়-দায় সুখে আছে চৌদিগে দাস দাসী,
ফুলের নাগান[৪৭] বিবি পাইয়্যা সন্তাপও অয় খুশী।
চাষার মাইয়্যা ফুলবানু য্যামুন বোনের পঙ্খী ছানা,
বাঁশের খেঁচায় বন্দী হইয়্যা গুটাইয়্যা থুইছে ড্যানা।
যে দিগেতে ছ্যাহে চাইয়্যা নয়া ধন দৌলাত,
দেইখ্যা দেইখ্যা আলগোছে কইন্যা করে ফাৎ ফাৎ।[৪৮]
হারে একওমাস, দুইওমাস, তিনও মাস যায়,
সুন্দরী কইন্যার রূপ বাতাসে মিশায়।
সোনার বন্ন অইলোরে কালা শুকাইয়্যা শুকাইয়্যা,
আবডালে[৪৯] খাড়াইয়্যা সন্তাপ ছ্যাহে চাইয়্যা চাইয়্যা।
হারে কতনা দিন অইলো গত কিছুই নাই সে গণি,
এক রাইতে জাইগ্যা কইন্যায় শোনে বংশীধ্বনি।
না লইও না লইও সখি আন্তাপেরি নাম,
তোমার নিকটে মোর শতেক সেলাম।

---

(৪৫) গ্রীষ্মের দিন (৪৬) বর্ষাকাল (৪৭) অনুরূপ
(৪৮) দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ। (৪৯) গোপনে—আড়ালে।

এই না বাঁশী শুইন্যারে কইন্যার চৌক্ষে আইসে জল,
নিচ্চুপেতে[৫০] আইসে ছাতে না বাজে পায়ের মল।
চাইয়া ছাখে সুজন বন্ধু বিরিক্ষের তলে
রইয়্যাছে খাড়াইয়্যা,
দেইখ্যা তারে কয় কথা কান্দিয়া কান্দিয়া।
সুখেরি কইর‍্যাছি বৈরীরে বন্ধু দুঃখেরে দোসর,
তুই বন্ধুর পিরীতে মইজ্যা আপন অইলাম পর।
কুলেরে করিলাম বৈরীরে মুই অবলা রমণী,
তোর না পিরীতে ডাইক্যা কলঙ্কেরে আনি।
ঘরেতে লাগিল আগুন বন্ধু দোয়ারেতে কাঁটা,
সাধ কইর‍্যা খাইলাম বন্ধু পিরীত গাছের গোটা।
যে-জন খাইয়্যাছে বন্ধু পিরীত গাছের ফল,
কলঙ্ক মরণ বন্ধু, জীবনও সফল।
হায় হায়রে নসিবেতে দুঃখু থাকলে খণ্ডান না যায়,
উচিত বাক্য শোনলে পরে মন্দ মোনে লয়।
দুঃখের বার্তা শুইন্যা কইন্যার, আত্তাপ উল্টা বুঝ বোঝে,
বংশী বাজান ক্ষ্যান্ত দেয় রাত্রি নিশাকালে।
হেইনা রাইত অইতে কইন্যা, পঙ্খীর মত শুকায়,
হস্তে ধইর‍্যা সন্তাপ মেঞ্জায় কত না কথা কয়।
চম্পা বন্ন অইলোরে আঙ্গার[৫১] য্যামুন শুখ্‌না
বিরিক্ষের পাতা,
ম্যাঘের মতন কালা ক্যাশে বান্ধাইলো জটা।
নিদ্রা নাই, আহার নাই, ক্যাবল চায় ফ্যাল ফ্যালাইয়্যা,
ঠাড্ডা[৫২] পড়া মাইনষের নাগান[৫৩] জীয়ন্তেতে মড়া।

(৫০) চুপি চুপি। (৫১) এখানে মলিনবর্ণ
(৫২) বাজ (৫৩) অনুরূপ

শয়ন মুন্দিরে সন্তাপ সুখে নিদ্রা যায়,
ফোঁপানীর[৫৪] শব্দে তার ঘুম ভাইঙ্গা যায়।
জাইগ্যা ছ্যাখে বাদশার পোয়, ফুলবানু নাই ঘরে,
আলগোছে আইয়্যা খাড়ায়, ছাতের আইলসা ধইরে।
ধমকে ধমকে কান্দে কইন্যা দুরের পানে চাইয়্যা,
চৌক্ষু ফাইট্যা আইসে জল, সন্তাপ
শোনে খাড়াইয়্যা।
মুই তো অবলা নারী, বন্ধু অইলাম অন্তর পুরা,
কুল ভাঙ্গিলে নদীর জল, মধ্যে পড়ে চড়া।
বইস্যা কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়্যা কান্দে কাগা,
শিশুকালে করলাম পিরীত, যৈবন কালে দাগা।
(রে বন্ধু যৈবন কালে দাগা ॥)
সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম ল্যাঠা,
ভাল ফুল তোলতে গ্যালে অঙ্গে লাগে কাঁটা।
লাজ বাসি মোনের কথা কইতে না সে পারি,
বুকেতে লাইগ্যাছে আগুণ, বন্ধু ছ্যাখাই কারে চিড়ি।
কইতে নারি মোনের কথা ঘরের লোকের কাছে,
তোমারি পিরীতে আমার অন্তর পুইর‍্যা গ্যাছে।
জলের ঘাটে অইতো ছ্যাখা কাঙ্খেতে কলসী,
ঐছন কইর‍্যা গ্যাল তোমার মোহন বাঁশি।
ঘরের বাইর অইতে নারি কুলমানের ভয়,
পিঞ্জরা ছাইড়্যা মোন বাতাসে উড়ায়।
কত কইর‍্যা বুঝাই পাখি নাই সে মানে মানা,
ভরা কলসী অইলোরে বন্ধু দিনে দিনে উনা।
কাইন্দা মোনের কথা ফুলবানু পিছান দিকে চায়,
লাজেতে মরিয়া গিয়া সোয়ামীরে ছ্যাখতে পায়।

(৫৪) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না

হস্তে ধইর‍্যা ফুলবান্নুরে সে বুঝায় কত না কথা,
এমন কইর‍্যা ক্ষয় অইওনা খাও আমার মাথা।
আমার বাজান বাদশা ছাশের সগ্‌গল লোকের মাথা,
তোমার লইগ্যা কি-না করমু শোন আমার কথা।
ভুইল্যা যাও আগের কথা, হাইস্যা কথা কও,
অধরে অধর থুইয়্যা রসের গীত গাও।
পিছের কথা পিছে থাকুক দুঃখু পাবা মোনে,
তোমার দুঃখু দুর করমু যা থাকে নসিবে।
এই পর্যন্ত বাক্য সন্তাপ কইবার যেই পারে,
ডুম্‌ডুমাডুম্ ঢুডুম ঢুডুম্ বাইগু কানে আসে।
চাইয়্যা ছাখে সন্তাপউদ্দিন রাজার ব্যাটা বটে,
বাড়িতে পইড়্যাছে ডাকাইত সজাগ হইয়্যা ওঠে।
দড়ির চঙ্গ[৫৫] বাইয়্যা ডাকাইত ছাতে আসে চইল্যা,
তরুয়াল হাতে লম্ফ দিয়া সামনে আসে খাড়াইয়্যা।
সর্দার ডাকাইতে কয়, শোন, মুই আত্তাপউদ্দিন্
এই দুনিয়ায় ফুলবান্নুর একই প্রেমিক
থাকবে চিরদিন।
মুখের ঢাকনা খুইল্যা আত্তাপ যহন চাইয়্যা ছাখে,
খুশীতে ডগমগ হইয়্যা ফুলবান্নুতেও হাসে।
আত্তাপের বাক্যে সন্তাপ ওঠে গর্জন কইর‍্যা,
ব্যালা শ্যাষে দেয়ার ডাকে যেমুন আসমান
কাঁপে থর থরাইয়্যা।
দুশমন ডাকুয়া তুইরে বুঝিলাম সার,
এই-জন্মের তলুয়ার খেলা তোর খেলাইমু আইজ।
এই-না কথা কইয়্যারে সন্তাপ নিজের অস্ত্র ধরে,
আত্তাপউদ্দিন ক্রোধ কইর‍্যা পাল্টা মাইর মারে।

(৫৫) মই

ঝনর ঝন্ ঝনর ঝন্ বাজে তলুয়ার,
বাঘে মৈষে লাইগ্যাছে লড়াই গ্যাখতে চমৎকার।
কতক্ষণ অইলো গত কিছুই নাই গণি,
খানিক পরে সন্তাপ মেঞায়
ফ্যালাইয়া দেয় নিজের তরবারি।
সন্তাপউদ্দিন ডাইক্যা কয়, শোন মেঞা বাই,
তোমার লগে কাজিয়া নাই আপোষ মুই চাই।
ফুলবানু খাড়াইয়্যা রইছে আমাগের সামুনে,
কার লগে যাইবে কইন্যায় বোলাও[৫৬] না উনারে।
একই আহাশে তুইও সূর্য্যি ক্যামুন অসম্ভব পেরস্তাব,
পরের ধনে পোদ্দারীতে ক্যেমুন
ঘোনাবে[৫৭] মনস্তাপ[৫৮]।
সন্তাপের বাক্যে আত্তাপ, তলুয়ার ধরে কইস্যা,
গাজী গাজী কইয়্যা সন্তাপ খাড়ায় লম্ফ দিয়া।
ঝনার ঝন্ ঝনার ঝন্
তলুয়ারে তলুয়ারে লাগল ঠোনাঠুনি,
তুই মর্দের কেরেজ[৫৯] দেইখ্যা ভাবে ফুলবানু সুন্দরী।
হাই হাই কইর্যা আত্তাপ তরুয়াল উচাইলো,
এক কোপে একই দণ্ডে সন্তাপের
মস্তক বুঝি দো-খণ্ড[৬০] করিল।
না না পারে নাই আত্তাপ, সন্তাপ যে হুশিয়ার আছিল,
পাশ কাডালে[৬১] সইর্যা গিয়া
আত্তাপেরে তরুয়াল মারিল।
হায় হায়রে একই কোপে দুখাণ্ড অইলো
আত্তাপেরি মাথা,

(৫৬) জিজ্ঞাসা করা। (৫৭) এগিয়ে আসবে (৫৮) মনঃকষ্ট (৫৯) বিক্রম
(৬০) দ্বিখণ্ডিত করা। (৬১) একপাশে

লামার[৬২] থিকা খবর পাইয়্যা তার
মায়ে আইলো ধাইয়্যা।
সন্তাপের মা জননী পরীবানু কান্দিতে লাগিল,
কান্দিয়া কান্দিয়া ক্ষেদে সব কহিতে লাগিল।
পরথম যৈবনের নিধি আন্তাপ যে আমার,
তোর না বাপের দুশমনীতে ছাইড়্যা দিলাম তার।
শিশুকালে হাজী ছাইব অর হস্তে
নাম যে কুন্দাইছিলো[৬৩],
এইনা বইল্যা হস্তে ধইর‍্যা আন্তাপের
ড্যানা[৬৪] দেখাইলো।
হস্তের উপর আন্তাপের নাম দেইখ্যা সন্তাপ
চমকাইয়্যা উঠিলো,
ভাবে, বিধি আইজ কী খেলা না দ্যাখাইলো।
পিছন ফির‍্যা চাইয়্যা দেখে ফুলবানু ঢইল্যা পড়ছে
আন্তাপেরি বুকে,
কেউ জানেনা কহন যেন মারছে ছুরি
নিজের কলিজার উপারে।
আহারে কি দারুণ কথা কওনশুনা যায়,
চতুর দিগে ওঠে কান্না থামান অইলো দায়।
সোরগোল কইর‍্যা কান্দে সন্তাপেরি মায়,
কইয়্যা দ্যায় পূর্ব কথা পেত্যয়[৬৫] না অয়।
পরীবানু কয়, শোন্ তুই যে রাজার ব্যাটা,
এটটুর লইগ্যা আইজ তুই বাধাইলি এ কোন্-ল্যাঠা।
এই না কইয়্যা পরীবানু তহন আন্তাপের ছাহ
কোলেতে তুলিল,
কোলে লইয়্যা মড়া পোলা কান্দিতে লাগিল।

(৬২) নিচুতলা হইতে। (৬৩) নাম লিখে দিয়েছিল (৬৪) হাত (৬৫) বিশ্বাস।

(হারে) আত্তাপেরি ছাইড়্যা আমি দেখি যে আন্ধারা,
যৈবনকালে হারাইলাম তোরে, মুই কপাল পোড়া।
(হারে) আমার দুঃখুতে ঝরয়ে বিরিক্ষের পাতা,
তোমরা সবাই সাক্ষী রইয়্যা শুইন্যো সে বারতা।
কী-করলি কী-করলি সত্তাপ গায়ে দিলি হাত,
না জাইন্যা না শুইন্যা ভাইয়ের লগে করলিরে বিবাদ।
কইয়্যা দেরে তোরা মোরে দেরে দেখাইয়্যা,
আবাগী হারাইলাল আঁখি কান্দিয়া কান্দিয়া।
(রে বন্ধু কান্দিয়া কান্দিয়া॥)
(হারে) কান্দিতে কান্দিতে রাইত অইলো পরভাত,
কাক কুকিলায় করে শোর, সত্তাপ করে ফাৎ ফাৎ[৬৬]।
আত্তাপেরে লইয়্যা গ্যাল আসমানেরি হুরী,
বিপদ কালে জাইন্যো বন্ধু তানারেই কাণ্ডারী॥

॥ আলোচনা ॥

আলোচ্য গীত-কথাটি একটি পুরোদস্তুর রোমান্টিক ধর্মী গীতি-নাট্য। এটি আমি সংগ্রহ করি ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) টাঙ্গাইল মহকুমাস্থ করোটিয়া গ্রাম নিবাসী আপ্তাবুদ্দিন সেখের কাছ থেকে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে কার্যোপলক্ষে আমি যখন অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহাকুমাস্থ পদ্মা-পাড়ে "ঘিওর বাজারে" অবস্থান করছিলাম তখনই এটি সংগ্রহ করি। উক্ত আপ্তাবুদ্দিন সেই সময় ঐ অঞ্চলে জনৈক ঠিকাদারের অধীনে অত্যন্ত সাধারণ (দিন মজুর) কাজ করত।

কিন্তু এই একই কাহিনী ঐ বছরের অক্টোবর মাসে ফরিদপুরের গোয়ালন্দ মহাকুমার মেগচামী গ্রামের জনাব সেখ সোলেমানের

(৬৬) ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার শব্দ।

কাছে যেভাবে শুনেছিলাম তা ভিন্নরূপ। শেষোক্ত রূপটি নাকি ঐ অঞ্চলে "আত্তাপ সত্তাপের কিস্‌সা" নামেই পরিচিত।

এই কিস্‌সাটি'র বৈশিষ্ট্য হল এটি "পরন কথা" (রূপকথা)র মতই কিছুটা কথায় কিছুটা বা গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে থাকে। "আত্তাপ সত্তাপের" কিস্‌সা ও বর্তমান সংগৃহীত "ফুলবানু" গীত-কথার গল্পাংশও হুবহু এক। এমনকি এর সংগীতাংশও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় একই বলা চলে।. অনুমান করা যায় এই "ফুলবানু" লোক-গীত-কথাটিই কালক্রমে লোক মুখে মুখে আলাপনী-গানে বা পরুন (পুরাতন কাহিনী) কথাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অবশ্য এর বিপরীত মতবাদও কেউ কেউ মনে পোষণ করতে পারেন। আমরা এখানে ঐ ধরণের বিতর্কমূলক আলোচনায় বিশেষ অগ্রসর না হয়ে বাংলার লোক-সাহিত্যের নবতম সংগ্রহ হিসেবে যেমনটি শুনেছি ঠিক তেমনটিই এখানে উপস্থিত করলাম।

বলা বাহুল্য এর রচয়িতার নাম কোন ক্ষেত্রেই পাওয়া সম্ভব হয়নি বা কেউ এর রচয়িতা বলে দাবীও করেনি।

-অবশ্য গল্পাংশ এক হলেও সংগীতাংশে মাঝে মাঝে একটু আধটু ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যদিও "ফুলবানু"র সঙ্গীতাংশ বা কাব্যাংশই প্রধান এবং "আত্তাপ সত্তাপ" কিস্‌সায় কথার ভাগই বেশী, তথাপি কিছু কিছু ব্যাতিক্রম যা নজরে এসেছে তা সর্ব সাধারণের গোচরে আনার প্রয়োজন মনে করি।

যেখানে সত্তাপ পিতার ক্ষমতাবলে জোর করে ফুলবানুকে তার পিতার আশ্রয় থেকে ষোল বেহারার পাল্কীতে চাপিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে:—"ফুলবানুরে আনাইতে সত্তাপ···তুইও বাহুদিয়া" পৃঃ ৯৭ সেখানে ফরিদপুররের (বাংলা দেশ) "মেগচামী" গ্রামে শোনা "আত্তাপ সত্তাপ" পালাগানে রয়েছে :—

"বেলা দুপ্পহরে ওরে দোলা যায়রে চলি,।
দোলাতে রইয়্যা কইন্যা করে আকুলি বিকুলি।

দোলা যায়, যায়রে দোলা ষোল বেড়ার কাঁধে,
দোলার ভিতার ফুলবানু গুড়িগুড়ি কাঁ'দে।
মা বাপেরে মনে পড়ে পরিজনের মুখ,
ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুইন্যা তার—
কাঁপি উঠছে বুক।
আগে পিছে সেপাই যায়রে, যায় ধীরে ধীরে,
দখিনা বাতাস পাইয়্যা দোলার কাপড় উড়ে।"

এইস্থানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। "ফুলবানু" গীত-কথায় বা "আত্তাপ সত্তাপ" কিস্‌সায় পাল্কীর উল্লেখ থাকলেও ফরিদপুরের সংগৃহীত গানটিতে পাল্কীর পরিবর্তে দোলার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই দোলা "ডুলির"ই নামান্তর কি-না বলা চলে না। কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে একমাত্র রাজা মহারাজা অথবা পৌরানিক কাহিনী, কিংবা রূপকথা ছাড়া—

"দেলায় আসি দোলায় যাই,
সোনার দর্পনে মুখ দেখাই—"

আর কোথাও বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় না। সাধারণতঃ ধনী, মধ্যবিত্ত বা অবস্থাপন্ন লোকেরা পাল্কীতে এবং নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা তাদের পর্দানশীন স্ত্রীলোকদের যাতায়াতের ব্যবস্থা ডুলিতেই করাত। ডুলির প্রচলন পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশে) এখনও রয়েছে কোন কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে। তবে ডুলি বইতে ষোল বেহারা খুব বেশী বলেই মনে হয়। কারণ, ডুলি বইতে দু'জন খুববেশী হলে চার জন বেহারাই যথেষ্ট। কাজেই এক্ষেত্রেও আর একটা খটকা থেকে যায়, তা হলে দোলার উল্লেখ কেন ডুলির পরিবর্তে? এটা কি রূপকথার প্রভাবে অথবা লোক-কবিদেরই স্বকপোল কল্পনায়?

"আত্তাপ সত্তাপে"র কিস্‌সাটি ইতিপূর্বে ১৯৫৩ খৃঃঅঃ আমার "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। আর তা ছাড়া "ফুলবানু" সম্পূর্ণ গীতিকাটিও "চতুষ্কোণ" পত্রিকার ১৩৭০ বঃ অঃ (মাঘ-চৈত্র) সাধারণ সংখ্যায় অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশ করেছি।

॥ সোহাগী বাইদ্যানী ॥

কাহিনী

চন্দ্রদ্বীপের মুন্সী বাড়ি। বিরাট অবস্থা। একদিন এক বেদে বহর এলো সেখানে সাপ খেলা দেখাতে। সাপ খেলা দেখাচ্ছিল যে বেদেনী যুবতী নাম তার সোহাগী। অপূর্ব তার চেহারা। যেমনি গায়ের রং তেমনি মুখশ্রী। টানা টানা চোখ, সুতীক্ষ্ণ নাসিকা, আঁট করে খোঁপা বাঁধা, পরনে সবুজ শাড়ী। হাতে তালি বাজিয়ে সাপ নাচাচ্ছে আর ছড়া কাটছে।

কত রকম সাপই যে আছে তার ঝাঁপিতে—জাতী, গোখরো, কাল কেউটে, শঙ্খচূড় আরও কতনা নাম জানা-না জানা সাপ-এর মেলা বসেছে যেন। এক একটা বিষধর সাপ বেদেনীর ঝুড়ি থেকে বের হয়ে ফনা তুলে দাঁড়ায় আর মুন্সী বাড়ির দালানের বারান্দায় বসে থাকা সব লোকেরা ইস্-ইস্ করে মুখে শব্দ করে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

বেদেনী-সাঁপের ঝাঁপি বন্ধ করে এই বার সকলের কাছে গিয়ে ঘুরে ফিরে দর্শনী আদায় করতে থাকে। ঐ দর্শকদের ভিতর বসে ছিল মুন্সীবাড়ির ভবিষ্যৎ মালিক—সুজন।

বয়স তার বাইশ কি তেইশ হবে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে খেলা দেখছিল। আর বোধ হয় তার চাইতেও বেশী করে দেখছিল বেদেনীকে।

বেদেনী যে মুহূর্তে তার কাছে গিয়ে ইনাম বকশীশের জন্য হাত পাতলো, সে যেন যন্ত্রচালিতের মত তার হাত থেকে খুলে দিল তার সোনার অঙ্গুরী।

বেদেনী মুচকি হেসে—'আবার অইবো দেখা' বলে বিদায় নিল।

বেদেনী বিদায় নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চুরি করে নিয়ে গেল সুজনের মনটিকেও। তাই বেদে বহর সে গাঁ ছেড়ে চলে যাবার পর

থেকে সে দিন রাত কেবল ভাবতে থাকে সোহাগীরই কথা। অবশেষে এক গভীর রাত্রে পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশের পথে। মনে সংকল্প করল সোহাগীকে তার পেতেই হবে।

খেয়ালের বসে নিশি রাত্রে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু ভোর হবার সাথে সাথে সুজন অনুভব করতে থাকে—সে কত অসহায়।

হাটতে হাটতে এসে পৌঁছয় শঙ্খ নদীর পাড়ে। উপরে মেঘের গর্জন, সুমুখে ভয়াল নদীর প্রচণ্ড কল্লতান। সুজন চিন্তা করে, এবার কোন্ দিকে সে যাবে ?

সুজন যখন প্রায় দিশে হারা, ঠিক সেই সময় অনেক দূরে দেখা যায় একখানা ষোল মাল্লাই বেবাজিয়া নৌকো। সুজন সংকেত জানানোয় নৌকা ধীরে ধীরে পাড়ের কিনারে এগিয়ে আসে।

নৌকো ঘাটে, এসে ভিড়লে সে লক্ষ্য করে, নৌকোর মাঝি মাল্লা ব্যতীত আরোহীরা সকলেই বিভিন্ন বয়সের মেয়ে। এবং দলের প্রত্যেকটি মেয়েই অপূর্ব সুন্দরী এবং যুবতী। এরই মাঝে সে আবিষ্কার করে ক'দিন আগেকার দেখা সেই রূপসী বেদেনীকে নাম যার সোহাগী।

সুজন তাদের সাথে ভাব জমিয়ে নিয়ে সেও সেই নৌকোতে চেপে পড়ে। তারপর তাদেরই সঙ্গী হিসেবে সেও যাত্রা করে যেখানে তারা চলেছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই সোহাগীর সাথে সুজনের হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। রাত্রে সবাই যখন নেশা ভাঙ করে বেহুঁস, সেই সময় সোহাগী এসে চুপি চুপি সুজনকে ডেকে নিয়ে যায় তার নিজের বিছানায়।

এই ভাবে ক'দিন যাবার পর, যখন সুজনের হাতের টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে গেল, তখন থেকেই দলের যে সর্দার কুটনী তার উপর আরম্ভ করল অবহেলা, অনাদর। এরও পরে শুরু হল অবজ্ঞা এবং পরিশেষে নির্যাতন।

সুজন সোহাগীর জন্য সব নির্বিবাদেই সহ্য করে চলে।

সারা দিনে যদিও কুটনীর কড়া শাসনের জন্য সোহাগীর সঙ্গে কোন কথাই বলা সম্ভব হয়না, কিন্তু রাত্রে, দু'জনের মিলনে সে-সব কষ্ট দুঃখ দু'জনেরই মন থেকে মুছে যায়।

কিন্তু এদের দু'জনের অন্তরঙ্গতা কুটনীর চোখ এড়ায় না। সোহাগী হ'ল দলের সেরা বেদেনী। সুন্দরীও যেমনি কাজেও তেমনি। একে দেখিয়ে সে অনেক রোজগার করে থাকে। পাছে সোহাগী এর সঙ্গে পালিয়ে যায়, এজন্যে সে সর্বদা এদের উপর খড় দৃষ্টি রেখে চলেছে।

একদিন সোহাগী বলে, বন্ধু, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, সুযোগ এলেই আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব।

একদিন নতুন গঞ্জে এসে যখন বেদে বহরের সবাই নেশা গ্রস্থ হয়ে ঘুমে অচৈতন্য, সেই অবসরে সোহাগী একখানা কোশডিঙা বের করে সুজনকে নিয়ে তড়িৎগতিতে বেদে বহর ছেড়ে পাড়ি জমায় অনির্দেশের পথে।

সারা রাত নৌকো বেয়ে বেয়ে তারা ভোরের দিকে এসে পৌঁছয় এক চড়ে। চড়ে কিছু কিছু বাড়ি ঘর দেখে উভয়ের মনেই বেশ আশার সঞ্চার হয়—যাক, আপাততঃ তা'হলে এখানেই একটা আশ্রয়ের সন্ধান মিলতে পারে।

দু'জনে নৌকো চড়ায় রেখে দিয়ে পাড় দিয়ে হাঁটতে থাকে। সামনেই যে বাড়িটা পাওয়া যায় সে বাড়িতেই অতিথি হয়।

বাড়ির কর্ত্রী এক বুড়ি। সেত' তাদের দেখে মহাখুশী। মহাসমাদরে তাদের খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

আসলে এটা হ'ল চড়ুয়া ডাকাত মোঙ্গল সর্দারের বাড়ি। সে ঘরে ফিরতেই বুড়ি বলে, দেখ ব্যাটা, ঘরে আজ কারা এসেছে। এদের সঙ্গে টাকা পয়সাত' আছেই, তা'ছাড়া রয়েছে এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী রত্ন। যদি ওই মেয়েটাকে ভোগ করতে চাশ, তা'হলে এখনই তার ব্যবস্থা কর।

মার কথায় মোঙ্গল ওদের যে ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছে সেই ঘরের বেড়ার ফাঁকা দিয়ে চেয়ে দেখে, চাঁদের আলো গিয়ে পড়েছে ঘরের ভিতর। জোছনা লুটোপুটি খাচ্ছে সারা ঘরময়। সে আলোকে স্পষ্ট দেখা যায় সোহাগীর মুখ। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে দু'জনে অঙ্গাঙ্গিভাবে।

সোহাগীর রূপ দেখে মোঙ্গলের যেন আর তর সয়না। তক্ষুনি সে কালকেউটে ভর্তি একটা বাঁশের চোঙ এনে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঠিক তাক্ করে ছুঁড়ে মারে সুজনের পায়ের কাছে—যাতে বাঁশের চোঙটা মাটিতে পড়ামাত্রই এর যে মুখটা কাপড় দিয়ে আটকানো তা' খুলে যায় এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এক কাল কেউটে এবং যদি একবার সে সুজনের পায়ে দংশন করতে পারে, ত'হলে তাকে আর ইহজগতে বাস করবার জন্য বেঁচে থাকতে হবেনা।

বাঁশের চুঙ্গি পতনের শব্দে সোহাগীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে দেখতে পায় সুজনের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে একটা বাঁশের চুঙি!

সোহাগী এক লহমায় এক লাথিতে চুঙ্গিটা সরিয়ে দেয় খানিকটা দূরে। লাথির চোটে চুঙ্গির আলগা মুখটা খুলে যায় আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে কাল নাগিনী।

কেউটে ফনা তুলে দুলতে থাকে দংশন করবার জন্য। সোহাগী তিলমাত্র দেরী না করে চট্ করে সাপের গলা টিপে ধরে সুজনকে ডাকতে থাকে। সাপও এদিকে প্রবল আক্রোশে সোহাগীর হাত পেঁচিয়ে ধরতে থাকে।

সোহাগীর ডাকে সুজনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ তুলে ঘরের ভিতর যে দৃশ্য দেখে তাতে ত' তার চক্ষু স্থির !!

সোহাগীর ডাকে সুজন তাড়াতাড়ি করে ছুরি দিয়ে সাপের দেহটা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। সোহাগী আর কালবিলম্ব না করে সুজনকে নিয়ে ঘরের বার হয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে নিজেদের ডিঙায় চেপে বসে।

টের পেয়ে মোঙ্গল সর্দারও ওদের পিছু ধাওয়া করে। দৌড়তে দৌড়তে সে যখন ওদের ধরবার জন্য নদীর ঘাটে এসে পৌঁছেছে, ওরা ততক্ষনে প্রায় মাঝ নদীতে।

মোঙ্গলও ভাল সাঁতার জানত। সেও আগুপিছু কিছু না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে নদীতে দেয় ঝাপ। খুব দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে চলে নৌকোর দিকে। একেত বর্ষার দিন তার উপর জোয়ার। হঠাৎ জোয়ারের টানে মোঙ্গল গিয়ে পড়ল এক কুমীরের মুখে। তার আর ওদের কাছ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছনো সম্ভব হলনা, ততক্ষণে সে তলিয়ে গেছে জলের তলায়।

এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে সোহাগী আর স্বজন নৌকো ছেড়ে পাড়ে উঠে শুরু করল হাঁটতে। সোহাগী বলে, দেখ এখান থেকে সোজা উত্তর দিকে চললেই তোমার দেশে গিয়ে পৌঁছনো যাবে—এই বলে দুজনে এগুতে থাকে। হাটতে হাটতে সন্ধ্যের সময় এসে আশ্রয় নেয় এক গাছের তলায়।

সোহাগী বলে, দেখ, রাত না পোহালেত' আর চলা যাবে না, তার চাইতে এই গাছতলাতেই রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে সকালেই আবার যাত্রা শুরু করা যাবে। তবে দু'জনেত একই সঙ্গে জেগে থাকাও সম্ভব নয়, ঘুমোনোও সম্ভব নয়। তার চাইতে প্রথম রাত্রে আমি জেগে তোমাকে পাহারা দেই, শেষে আমার ঘুম পেলে তোমাকে ডেকে দেব, তুমি বসে পাহারা দিও, আমি ঘুমোব।

সোহাগীর কথায় স্বজন তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। সোহাগী স্বজনের মাথা কোলে নিয়ে আকাশ পাতাল অনেক কিছুই চিন্তা করে চলে। হঠাৎ কানে আসে যে গাছের তলায় তারা আশ্রয় নিয়েছে, সেই গাছেরই নীচু ডালে বসে এক জোড়া শুকপাখি অবিকল মানুষের মত পরস্পর আলাপ করে চলেছে। সোহাগী কান খাড়া করে শুনে চলে ওদের কথপোকথন। শুনতে শুনতে এমন তন্ময় হয়ে পড়ে যে স্বজনকে আর ডাকবার কথা তার মনেই আসেনা। সারারাত সে

একাই জেগে কাটায়। ভোর হতে আবার শুরু হয় তাদের পদ যাত্রা।

হাঁটতে হাঁটতে বেলা শেষে দু'জনায় এসে পৌঁছয় চন্দ্রদ্বীপের শেষ প্রান্তে। সোহাগী আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করে সে দিকে দেখিয়ে বলে, বন্ধু, ঐ দেখ তোমার দেশ। এইবার এখান থেকে তুমি তোমার দেশে যাত্রা কর, আমি আমার নিজের পথ ধরি।

সুজন অবাক হয়ে বলে, সে কি কথা ? আমি আশা করে রয়েছি তুমিও আমার সঙ্গেই যাবে, দেশে ফিরে তোমায় বিয়ে করে আমি সুখে দিন কাটাব। এত দিন কি তা'হলে এই জন্যই তোমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়িয়েছি ? আর তুমিই যদি আমার সঙ্গে না যাও তা হলে আমারও আর দেশে ফেরার কোনো দরকার নেই।

সোহাগী অনেক বোঝায়। সুজন সোহাগীর কোন কথাই শুনতে রাজী নয়। শেষটায় সোহাগী সুজনের কাছে এক বিষম প্রস্তাব দেয়। বলে, দেখ, দেশে ফিরে আমায় বিয়ে করবে বলে যখন মনস্থ করেছ বেশ কথা, তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মতিও দিচ্ছি কিন্তু সেই সঙ্গে আমারও একটা সর্ত আছে, তোমাকেও সেটি পালন করতে হবে।

সুজন সঙ্গে সঙ্গে বলে, বেশ, বল তোমার সর্ত, আমি নিশ্চয়ই তা পালন করব, এর কোনরূপ অন্যথা হবে না।

সোহাগী বলে, বেশ, তা হলে অঙ্গীকার কর, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে ঠিকই, তবে বিবাহের পর থেকে আমরা দু'জনে কিন্তু থাকব পৃথক ভাবে। কোন দিন তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবেনা। আর যদি তেমন কোনদিন সে চেষ্টা কর, তা হলে সেই দিনই আমি চলে যাব—আমায় আটকাতে পারবেনা।

সুজন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সোহাগীর কথায় রাজী হয়ে যায়। তারা এসে পৌঁছয় চন্দ্রদ্বীপে। এবং এর ক'দিন পরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে এদের বিবাহাদি পর্ব সম্পন্ন হয়।

দেখতে দেখতে বিয়ের পর ক'মাস চলে গেল। দু'জনে থাকে পৃথক দুই ঘরে। সুজন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সোহাগীর ব্যবহারে। একদিন

রাত্রে আর ধৈর্য ধরতে না পেরে এসে ঢোকে সোহাগীর শয়ন কক্ষে।

সোহাগী সুজনকে দেখে মিষ্টি কথায় জিজ্ঞাসা করে, একি বন্ধু এত রাত্রে এখানে যে-ঘুমোও নি ?

সুজনের তখন অস্থির অবস্থা। বলে, তুমি কি এতই নিষ্ঠুর, আজ এতদিন হ'ল আমাদের বিবাহ হয়েছে, একদিনের জন্যও কি তুমি আমার কাছে আসতে পারলে না ? বল কেন, কী কারণে আমি তোমার অযোগ্য।

সোহাগী বলে. কেন বন্ধু আমি তো আগেই তোমাকে দিয়ে শর্ত করিয়ে নিয়ে ছিলাম,—বিয়ের পর আমরা তু'জনে থাকব আলাদা ভাবে, তা'হলে আজ কেন সে শর্ত ভঙ্গ করতে চাইছ ?

সুজন রাগত ভাবেই বলে, বুঝেছি, তুমি নিশ্চয় অন্য কোন পুরুষকে ভালবাস, তাই আমার কাছে যেতে চাওনা। বল, কে সে ব্যক্তি আমি আজই তার একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব।

ছল ছল চোখে সোহাগী বলে, দেখ বন্ধু, তোমাকে আবারও বলছি এ কথার অর্থ জানতে চেওনা। নেহাৎ যদি শুনতেই চাও তা'হলে বলতে পারি, তবে তারপর আর আমায় ফিরে পাবে না।

সুজন অধিকতর রাগান্বিত ভাবে বলে, সে যাই হোক, আমি আজ সব কথা শুনতে চাই, কে তোমার সেই নাগর যাকে তুমি আমার চাইতেও বেশী ভালবাস।

সোহাগীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে ঝড়ে পড়ে জল। পরে হাত দিয়ে তা মুছে নিয়ে বলে, যদি একান্তই সে কথা শুনতে চাও, তাহলে চল নদীর ঘাটে—বলে তু'জনে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

নদীর ঘাটে এসে সোহাগী আবার বলে, বন্ধু, এখনোও ভেবে দেখ তুমি আমাকে চাও না আমার কথা চাও। এখনও বলছি, আমার কথা শেষ হলে আর এক দণ্ডের জন্যও আমি বেঁচে থাকব না।

সুজন তথাপি জোর দিয়ে বলতে থাকে, না, না আমি শুনতেই চাই সে গোপন কথা।

—বেশ, তবে তাই হোক—এই বলে সোহাগী একে একে আকাশের চাঁদ, মা বসুমতী, জাঙ্গুলী দেবী (মা মনসার অতি প্রাচীন নাম) কে বন্দনা করে, বন্দনা করে অলক্ষিতের মাতা এবং পিতার। পরে ধীরে ধীরে নামতে থাকে জলে। হাঁটু জলে নেমে বলতে শুরু করে এক অপূর্ব কাহিনী। মুগ্ধ বিস্ময়ে পাড়ে দাড়িয়ে শুনতে থাকে সুজন।

হুশুমপুর গাঁয়ে সুবুদ্ধি চাঁদ নামে ছিল এক বনিক। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সে একদিন বিদেশ যাত্রা করল। ঘরে রইলো তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বাতাসী আর তার দুই জমজ শিশু সন্তান একটি ছেলে অপরটি মেয়ে।

অনেকদিন গত হয়েছে। সে বছরে শ্রাবণ মাসে এমন বন্যা হল যে মাঠ ঘাট সব তলিয়ে গেল। ঝড়, বৃষ্টি ও প্লাবনের যেন আর শেষ নেই। বন্যার প্রকোপে অসংখ্য ঘর বাড়ি গেল ভেসে। দুই শিশু সন্তান নিয়ে বাতাসী পড়ল বিষম বিপাকে।

দেখতে দেখতে বানের জল তার ঘরের ভিটি ছাড়িয়ে ভিতরেও এসে ঢুকতে আরম্ভ করল। বাচ্চাদের বুঝিবা আর বাঁচাবার পথ নেই। বাতাসী ওদের নিয়ে মাচাঙের উপর উঠলো। কিন্তু সেখানেও যখন ওদের রক্ষা করা সম্ভব হল না, তখন বিড়ালের মত বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে নিজের দেহের সঙ্গে ভালভাবে বেঁধে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সুমুখ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল কারও ঘরের একখানা চালা। ভগবানের নাম স্মরণ করে বাতাসী চেপে বসল তার উপর।

সারারাত এইভাবে চলার পর ভোরের দিকে বৃষ্টি এবং বাতাস গেল বন্ধ হয়ে। মেঘ কেটে গিয়ে ফুটে উঠলো সূর্যের আলোক। সূর্যালোকে বাতাসী এইবার গায়ের ভিজা কাপড় একটু নিংড়ে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখবার ফুরসুৎ পায়। দেখে, কাছাকাছি একটা নদীর ঘাট, আর তার পাশেই রয়েছে একটা বটগাছ। সে তাড়াতাড়ি সন্তানদের নিয়ে পাড়ে নেমে শিশু দুটিকে গাছ তলাতে শুইয়ে দিয়ে

মাথার চুল খুলে দিয়ে ঝাড়তে থাকে, আর কাপড়ের এক আঁচল পরে অন্য আঁচল রোদে শুকোতে থাকে। হঠাৎ নজরে পড়ে, দূরে একখানা সুদৃশ পানসী নৌকো সেদিকেই দাঁড় টেনে এগিয়ে আসছে।

বাতাসীর মনে আশা জাগে—হয়ত বা এই নৌকোতেই তার স্বামী বিদেশ থেকে বাণিজ্য করে ফিরে আসছে।

দেখতে দেখতে পানসী এসে সেই ঘাটেই ভেড়ে। বাতাসী জলে দাঁড়িয়েই নৌকোর জানালায় উঁকি মেরে দেখে—তার ভিতর খাট, পালঙ্ক, কত না শৌখিন সামগ্রীতে বোঝাই।

ইতিমধ্যে নৌকো থেকে নেমে আসে দুই মাঝি। নেহাৎ ভাল মানুষের মত তারা তার কাছে এগিয়ে এসে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করে,
—এটা কোন্ দেশ গো সুন্দরী ?

বাতাসী সে কথার জবাব দেবার আগেই তাদের ভিতর থেকে একজন হঠাৎ বাতাসীর মুখে কাপড়ের আঁচল চাপা দিয়ে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে উঠে পড়ে সেই বোম্বেটে জলদস্যুর নৌকোয়। সঙ্গে সঙ্গে নৌকো দেয় ছেড়ে, বাচ্চা দু'টো পড়ে রইলো বটগাছের তলে।

পানসীর ভিতর ঢুকে বাতাসী অবাক হয়ে যায়। কত যে দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে এর ঘরের ভিতর তার আর লেখাজোকা নেই। বুঝি বা ইন্দ্রের ইন্দ্রপুরী! ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে লালমুখো এক পর্তুগীজ জলদস্যু। চোখ দুটো নেশার ঘোরে জবাফুলের মত লাল। মুখে বিশ্রী একটা উগ্র গন্ধ। সে ঘরে ঢুকবার সাথে সাথেই দস্যুটা এগিয়ে আসে তাকে আলিঙ্গন করতে।

বাতাসীর হাত চেপে ধরে তাকে কাছে টানতেই সে তার হাতে দিল এক মরণ কামড়।

কামড়ের চোটে বোম্বেটেটা তার হাত একটু আলগা করতেই বাতাসী এক ঝটকায় তার দেহ মুক্ত করে নিয়ে এক দৌড়ে ঘরের

বাইরে চলে আসে। পিছন থেকে বোম্বেটে আর মাঝি মাল্লারা ধর্ ধর্ বলে তাড়া করে আসে।

বাতাসী আর কোন উপায় না দেখে নৌকো থেকে জলে দিল এক লাফ্। কোথায় যে সে তলিয়ে গেল সেই ভরা গাঙের ভিতর, আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না অনেক চেষ্টা করেও।

বাতাসীর যখন জ্ঞান হল সে চেয়ে দেখে, সে পড়ে রয়েছে এক চরার বুকে। কতক্ষণ যে সে ওইখানে ওই রকম অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল তা আর মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে সে চেয়ে দেখে, কাক এবং অন্যান্য পক্ষীরা তাকে মৃত মনে করে ঠোকরাচ্ছে। বস্তুতঃ পাখীদের ঠোকরানীতেই তার জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু জ্ঞান ফিরবার সাথে সাথেই মনে পড়ে তার বাচ্চাদের কথা। মনে পড়ে নৌকোর কথা—নদীতে ঝাঁপ দেবার কথা। হঠাৎ মাথা ঘুরে যায়। মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঘুরে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। লোকে বলে, পাগলী। যাকে দেখে তাকেই বলে, আমার পোলা কই, আমার মাইয়া কোথায় ?

তার কথাবার্তায় কারও কারও মনে দয়া হয়। কেউ কেউ কিছু খেতেও দেয়। কেউ কেউ এক আধখানা ছেঁড়া কাপড়ও দেয়। এই ভাবেই সম্পূর্ণ পরের দয়ার উপর নির্ভর করে ঘুরে বেড়ায় এক রাজ্য ছেড়ে আরেক রাজত্বে।

এদিকে বাতাসী অপহৃতা হবার পর সেই ঘাটে এসে ভিড়ল এক বেবাজিয়া নৌকা। ঝড় তুফানে তারাও বে-সামাল হয়ে পড়েছে। এটা কোন্ গাঁ বুঝবার জন্য দলনেত্রী কুটনী বুড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতেই তার কানে আসে শিশুর কান্না ওই ঘাটপাড়ের বটগাছতলা থেকে।

কুটনী শিশুর কান্না শুনে পাড়ে উঠতেই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে গাছের তলায় শুয়ে রয়েছে একজোড়া শিশু, তার ভিতর একজন ছেলে অপরটি মেয়ে।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। সে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাচ্ছে। দূরে এক কাল কেউটে সাপ ফনা ধরে রয়েছে তার মাথার কাছে সূর্যালোককে আড়াল করবার জন্য।

কুটনীর পায়ের শব্দ পেয়ে সাপটা আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে যায়।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে কুটনীর মনে সন্দেহ জাগে, এ মেয়ে নিশ্চয়ই মা মনসার চর, তা না হলে এমনটি ত' হতে পারে না।

চারিদিকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে কুটনী ক্ষিপ্রগতিতে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে নৌকোয় ফিরে এসে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থান ত্যাগ করে।

এই পর্যন্ত কাহিনী বলে সোহাগী অনুনয় করে বলে, বন্ধু এইখানে ক্ষান্ত দেও, বাকীটা আর নাই বা শুনলে—'

সুজন বলে, বেশ বলছ ত', যখন এই পর্যন্তই বলতে পেরেছ তখন বাকীটা না শুনে আমি ছাড়ছি না।

সোহাগী বলে, বেশ তাই হো'ক। এর উপসংহারটুকু শুনবার জন্য তৈরী হয়ে নাও। কিন্তু মনে রেখো, এই কাহিনী শেষ হবার সাথে সাথেই আমি প্রাণ বিসর্জন দেব।

সুজন বলে, আচ্ছা সে দেখা যাবে, আগে কাহিনী ত' শুনি, তারপর অন্য কথা।

অগত্যা সুজনের পীড়াপিড়িতে সোহাগী আবার বলতে শুরু করে।

বেলা আরও বাড়ে। এরই কিছুক্ষণ বাদে সেই ঘাটে স্নান করতে আসে সেই গাঁয়েরই জমিদার গিন্নী বিদ্যাবতী। ধন দৌলতের কিছুরই অভাব তার নেই, কেবল দুঃখ সে নিঃসন্তান।

হঠাৎ গাছতলায় এই অপরূপ সুন্দর শিশুকে দেখে ভগবানের দান হিসেবে তক্ষুণি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে যায় এবং সেই থেকে এই শিশু তারই সন্তান রূপে পরিচিত হতে থাকে।

এই পর্যন্ত বলে সোহাগী করুণ কণ্ঠে বলে, বন্ধু, আশাকরি এর পরের ঘটনাটুকু তুমি বুঝতে পেরেছ, এই পর্যন্তই থাক।

সুজনেরও তখন জীদ চেপে গেছে। কাহিনীর বাকী অংশটুকু না শুনে সে কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা সোহাগী পুনরায় আকাশের চাঁদ, মাতা বসুমতী, গহীন গাঙ, মা মনসার নাম স্মরণ করে সুজনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, শোন বন্ধু, ঐ যে শিশুর কথা বললাম যাকে বিদ্যাবতী ঘরে তুলে নিয়ে গেল, সেই শিশুই পরবর্তী-কালে সুজন মুন্সী নামে খ্যাত হ'ল অর্থাৎ সেই শিশুই তুমি। আর বাইদ্যানী যে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল, সে আমি ছাড়া আর কেউই নয়। যেদিন থেকে শুকপাখীর মুখে আমাদের কৈশোরের বৃত্তান্ত জানতে পেরেছি সেই দিন থেকেই তোমার সঙ্গে আমার পূর্বকৃত অপরাধের জন্য মনে মনে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে এ পাপ স্খালনের চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু তোমার উপর ভালবাসার টানে সেচ্ছায় প্রাণ ত্যাগও করে উঠতে পারছিলাম না। আজ আমার পথ মুক্ত—এই আমি বিদায় নিলাম—এই পর্যন্ত বলতে না বলতেই সোহাগী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অতলে তলিয়ে গেল। সুজনেরও এতক্ষণে মোহভঙ্গ হয়। সেও সোহাগী, সোহাগী করে তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

দু'জনের কেউই আর জীবিত অবস্থায় জল থেকে উঠল না।

এরই কিছু পরে, রাত ভোর হবার সাথে সাথে সেই ঘাটে এসে ভিড়ল ষোল মাল্লাই এক বিশাল বজরা নৌকো। তারও পিছনে আসে এক বেবাজিয়া বহর।

বড় নৌকো থেকে প্রথমেই নেমে এলো রাজা সুবুদ্ধি চাঁদ রায় আর তার পত্নী বাতাসী।

মাঝি মাল্লারা ধরাধরি করে পাড়ে নামিয়ে নিয়ে এল দু'টি জলে ডোবা মৃত দেহ—একটি সুজন মুন্সীর অপরটি সোহাগীর।

রাজা কাঁদে, রাণী কাঁদে, কাঁদে বিদ্যাবতী। আর অদূরে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকে বাইদ্যানী বুড়ি।

রাজা প্রচার করলেন, যেখান থেকে তার কন্যা আর প্রাণাধিক পুত্র আত্মঘাতী হয়েছে—সেদিন থেকে সেই ঘাটের নামকরণ করা হল "সোহাগী বাইদ্যানীর ঘাট"।

॥ কাব্য ॥

—ঃ এক :—

হায়, হায়রে, হায়. চন্দরদ্বীপের একখান পরস্তাব
শুনেন মহাশয়,
আমি কী কইমু দরুণ বিধি কখনও না যায়,
চৌউখু ফাইট্যা ঝরে পানি বক্ষ ভাইস্যা যায়।
(হায় গো হায়) ॥
এ হায়রে হায় সুজন মুন্সী আরও ওই সোহাগী সুন্দরী
কী অইলো শ্যাষ কাড়ালে শুনিবেন এহনি।
ধন্য ধন্য রব পইর‍্যাছে চন্দরদ্বীপের ঘরে,
নতুন এক বাইদ্যানী আইছে সাপ খেলা দেখাইবারে।
সাপ খেলা অনেক অইছে যুয়ান বুড়ায় কয়,
অমন সুন্দার যৈবতী রত্তন কচিৎ দৃষ্ট অয়।
জাতি সাপ, খৈয়া গুক্ষুর কত সাপও ছিল,
কুলা চক্কর ফনা মেইল্যা তামাসা দ্যাখাইলো।
তামাশা দ্যাখায় বাইদ্যানী ছেমরী হস্তে তালি দিয়া,
ডাইনে বায়ে মাথা লাড়ায় সোজা খাড়া হইয়্যা।
হস্ত ঘুরাইয়্যা মাজা ঢুলাইয়্যা যহন খেলায় সাপ,
ইস্ ইস্ বইল্যা কয় তামাম ছাওয়াল বাপ।
(অগো) হরিতালের বন্ন বাইদ্যানীর চোউখে কাজল টানা,
পান খাইয়্যা ওষ্ঠ রাঙাইছে পইর‍্যাছে সবুজ ট্যানা।[১]

(১) তেনা=ন্যাকড়া, এ স্থলে বস্ত্রাংশ।

মাথার পরে খাড়ুয়া খোপা, কানেতে মাকুড়ি,
চোউখু মেইল্যা যারে গ্যাখে ধরে তারই ফাপড়ি।[২]
হাসির ঠমকে বাইদ্যানীর পরানে ওঠে ত্রাস,
ভাবে, এই বারেইবা ঘটাবে কোন্ সব্বনাশ।
সাপের ঝাঁপি বন্ধ কইর‍্যা বাইদ্যানী যহন
হাইস্যা কথা কয়,
বক্কিলের[৩] ও বুকের রক্ত তরল হইয়্যা যায়।
(অগো) এইনা বাইদ্যানী যে নামেতে সোহাগী
সাপ খেলা দেখাইতে আইলো মুন্সী বাড়ি।
মুন্সী বাড়ির দালান কোঠা চৌদিকে পাহাড়া,
লোক-লস্কর, পাইক, মের্দা আছে অইয়্যা খাড়া।
সুজন মুন্সী ডাংগর[৪] পোলা কর্তার একই না পুত্তুর,
রূপেগুণে গ্যাশ ধইন্যা নাই কোন শত্তুর।
(হারে) এইনা মুন্সী বাড়ির যত দৌলাত আছে,
সুজন মুন্সী সেই সগ্‌গলের ওয়ারিশিনাই বটে।
সুজন বুঝি বইস্যা ছিল দালানের কিনারে,
সোহাগী হের কাছেতে হস্ত বাইর করে।
সোহাগীর মুখের কথায় চৌক্ষের দিকে চাইয়্যা,
অনায়াসে খুইল্যা দিল হের অঙ্গুরী কোনো রা না কইর‍্যা।
(হারে) ইনাম পাইয়্যা সোহাগী তহন ত্যারছা চৌক্ষে চায়,
'আবার অইবো দেখা' বইল্যা ফির‍্যা ফির‍্যা চায়।
তামাম মুনিষ্যে খাড়াইয়্যা ক্যাবল রংতামাশা গ্যাখে,
কানাঘুষা করে মাইনষে ছ্যামরাডারে খাইছে।
(হারে) চইল্যা গ্যাল বাইদ্যানী ছেড়ী[৫] ইনাম বক্‌শিশ লইয়্যা,
সুজন বুঝি চাইয়্যা গ্যাখে, তার পরাণও গ্যাল লইয়্যা।

(২) মাথা গোলমাল হয়ে যায়। (৩) কৃপন (৪) সেয়ানা = বয়স্ক
(৫) ছুকরী = মেয়ে

(হারে) একদিন. দুইদিন. তিনদিনের দিনে
ঘুমের থিকা জাইগ্যা ওঠে সুজন
নিশুত মইধ্য রাইতে।
চৌক্ষু চাইয়া সুজন তহন চতুরদিকে চায়,
আহাশের চান্দের মইধ্যে সোহাগীর
বদন ছ্যাখতে পায়।
(অগো) মন সাগরে উঠ্যাছে তুফান সহন না যায়,
ঝম্প দিয়া পরবে কেডা উদ্দিসও না পায়।
স্বপ্নের ঘোরে সুজন তহন বিছানা ছাইড়্যা আসে,
নিশায় পাওয়া মাইনষের নাগান[৬]
হারা উদ্দিশে ভাসে।
হারা রাইত হাটে সুজন বে-খেয়ালের ঘোরে,
শ্যাষ নিশাতে আইস্যা খাড়ায় শঙ্খনদীর ধারে।
আসমানে দেয়ার গর্জন নদীতে ডাকে বান,
সুজন ভাবে বিধির ফ্যারে[৮] যাবে বুঝি প্রাণ।
সুজনের ধন্দ্ব[৯] লাগে মোনে,
এতদূর আইয়্যা এহন ফিরমু বা ক্যামনে।
(হারে) ঘর গ্যালে, জমিন গ্যালে সগল পাওয়া যায়,
তামাম দুঃক্ষু সইবার পারি পিরীত যদি পাই।
সুজন কয়, শোন ওগো অচেনা সুন্দরী,
তোমারে না পাইলে আমার ডোববে জীবনতরী।
আমার অন্তরে বিন্ধ্যাছে দারুণ বাণ,
যদি কাষ্ঠের কয়লা গো অইতো.
জ্বইলা পুইড়্যা নিভা যাইতো,
যাইতো আমার মোনের আগুন,
হায়গো, তোমায় ছাড়া রইতো না মোর প্রাণ।

---

(৬) মতন, (৭) বিভ্রান্তের মত, (৮) ভ্রুকুটি। (৯) সন্দেহ হওয়া।

(অগো) এই কথা না কইয়্যারে সুজন কান্দিতে লাগিল,
ছ্যাখতে ছ্যাখতে ছোড রাইত শ্যাষ অইয়্যা গ্যাল।
রাইত পোয়াইলো ফার্শা অইলো সগ্‌গল ছ্যাখা যায়,
উড়াল দিয়া আইছ্যাছে এক পানসী ষোল মাল্লাই।
নাও দেইখ্যা সুজন তখন ঘন ঘন ডাকে,
সুজনের ডাকের চোটে পান্‌সী ঘাটে আসে।
সুজন ছ্যাখে সামুনে আইস্যাছে বেবাজিয়া এক তরী,
মাঝি মাল্লা সগল ছাড়া সগ্‌গলডিই[১০] নারী।
নানা ঠশকের যৈবতী নারী নায়ের পাটাতনে,
কারে থুইয়্যা কারে বা ছ্যাহে সুজন ভাবে মোনে মোনে।
ইয়ার মইধ্যে এক ষোড়শী যোবতী কইন্যা কনক চম্পা ফুল,
মাজা বাইয়্যা পড়ে কইন্যার ম্যাঘ বরণ চুল।
আউলাইয়্যা সেইনা ক্যাশগো কইন্যা চোখ ঠারিয়া চায়,
সাপিনীর মণি য্যান হৃদয়ে দংশায়।
ভাল নজর কইর‍্যা ছ্যাখে সুজন, কুন্দকলির শোভা,
সোহাগিনীর মুখের হাসি মণির মনোলোভা।
(অগো) কাঁচির আগা য্যামুন ব্যাকা যেমুন তার ধার,
ত্যারছা কোনে ছ্যাখলে পরে রক্ষা নাই যে আর।
পরাণ কাড়ে, পরাণ ফাঁড়ে না ছ্যাখে উপায়,
সগল ফ্যালাইয়্যা বুঝি ঝম্প ছ্যায় তার গায়।
(অগো) পিছাল পদ্মের পাত জল উছলি যায়,
পরম সুন্দারী কইন্যা নয়ন জুড়ায়।
(অগো) শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলা য্যামুন পড়ে দ্বাদশীতে,
ত্যামুন যোবতী কইন্যার রূপেতে ছ্যাশ ফাটে।
(অগো) আস্তে আস্তে সুজন নায়ের কিনার আসে,
বাইছ্যানীরে ডাইক্যা কয় মিষ্ট মধুর ভাষে।

---

(১০) সকলেই।

কোন্‌বা দ্যাশে ঘরগো তুমার কোন্‌ বা দ্যাশে থানা,
তোমার লাইগ্যা দিল যে আমার হইয়্যাছে দিওয়ানা।
তুমারে দ্যাখলাম বন্ধু ডউয়াতলীর খালে,
আমারে বান্ধিলা তুমি তোমার মায়া জালে।
আমার মোনের সাক্ষী উইযে আসমানেরই তারা,
সাক্ষী রইছে চন্দর সূরয হিজল গাছের ছায়া।
(অগো) কাল নাগিনী বন্ধুগো তুমি আমার বুকের জ্বালা,
তুমার গলায় দিমু বন্ধু বকুল ফুলের মালা।
চিকন চুমা আইক্যা দিমু বন্ধু তোমার রাঙা ঠোঁটে,
আমার বুকের মধু দিমু বন্ধু তোমার দরাজ বুকে।
সুজনের বাক্য শুন্যা সোহাগী তহন নায়ের কিনারে আসে,
গাছকোমর[১১] কাপড় পইর‍্যা চৌখ ঘুরাইয়্যা হাসে।
হাসির ঠমকে কইন্যার গালে পরে টোপ,
সুজন ভাবে ছেমরি এহনই মারে বুঝি এক কোপ্‌।
সোহাগী কয়, বন্ধু তুমি অনেক কালের চেনা,
তুমি আমার মাথার মণি আমি তোমার কেনা।
ময়ুরপঙ্খী নাও ভিড়াইয়্যা আইলাম তুমার কাছে,
সুতের কোলে নাও যে দোলে, আমার পরাণ ক্যামুন করে।
ম্যাঘ বরণ ক্যাশ আমার টানা টানা ভুরু,
আসমানি শাড়ি দিবা, দিবা চুড়ি সরু।
ভিনদ্যাশের কইন্যাগো আমি সোহাগী আমার নাম,
তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম।
সত্য কইর‍্যা কইগো বন্ধু ধরি তুমার পায়,
একবার আইয়্যা লইয়্যা যাইও তোমারি আস্তানায়।
এই না কথা শুন্যারে সুজন তহন চতুরদিকে চায়,
সোহাগীর হস্ত ধইর‍্যা নায়ে উইঠ্যা যায়।

(১১) কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে আঁটসাট করে কাপড় পরে।

—ঃ তুই ঃ—

হায় হায়রে চইল্যাছে বাইছ্যানীর নাও ভাটী গাঙ দিয়া,
রঙিলা বাদামের নাও বাতাসে মিশিয়া।
দিনের সূরয ঢইল্যা পড়ে সাইজ সইন্ধ্যা কালে,
নিশির পর পরভাত অয় সূরযু ছাখা দিলে।
(অগো) দিন গ্যাল, রাইত গ্যাল, গ্যাল চাইর মাস,
সুজন মুনসী অইয়্যা গ্যাল বেবাইজ্যাগো দাস।
যতদিন ছিল সুজনের ট্যাহা, কড়ি, সোনা,
জামাই আদরে রাখত তারে কুটনী করত না আর মানা।
কিছুদিন অইলো গত সুজন অইলো ফোঁপরা[১২],
সগল মাগী তুচ্ছ করে বইতে না দেয় মোড়া।
সোগাহী বাইছ্যানী সে যে বহরের সেরা নারী,
কিবা চৌউখে যে দেখছিলো তারে দেবতা মান্য করি।
গঞ্জেতে ভির‍্যাইয়া নাও বাইছ্যানীরা যহন লামে পাড়ে,
মুনিবের মত কুটনী তহন হেরে দিয়া
নতুন ফরমাইজ করে।
বস্ত্র কাঁচে, বাশুন মাজে, মান্ধারীর[১৩] অধম,
পালাবার পথ নাই কুট্‌নী আছে যোম।
পাড়েতে লামনের কালে সোহাগী কয় আবডালে ডাইক্যা,
কষ্ট কইর‍্যা রও এটটু, আমু জলদি কইর‍্যা।
নিশিরাইতে নদীর কূলে বাইছ্যানীর আসর,
কেউ খায় মদ, গাঁজা নিশায় বে-ভোর।
সুলুক[১৪] বুইজ্যা সোহাগী তহন সুজনেরে ডাইক্যা নেয়,
নিজের বিস্তারায়[১৫] শোয়াইয়্যা হেবে আলিঙ্গন জানায়।
হারাদিনের কষ্ট দুঃখু পরবত পরমান,
এক ছ্যাটকায় চাঙা অয় সুজন পরধান।

(১২) ফাঁপা—বিত্তহীন। (১৩) কৃতদাস (১৪) সুযোগ (১৫) বিছানা

সোহাগী কয় আর কয়ডা দিন সবুর কর গঞ্জে যাইয়্যা লই,
তোমার লগে চম্পট দিমু দেখবা ত নিচ্চয়ই।
একদিন, দুই দিন, কয়দিন যে গ্যাল,
এক নিশাতে কুটনী মাগীব টণক নড়িল।
ট্যার পাইয়্যা কুটনী তহন সোহাগীরে ডাকে,
ডাক শুন্যা সোহাগীর বুকের মইধ্যে কাঁপে।
পিছমোড়া দিয়া বান্ধে কুটনী সোহাগী সুন্দরী,
সুজনের হেনেস্থার[১৬] নাই কোনো জুড়ি।
নিজের কেলেশ ভুইল্যা সুজন দেখে
কান্দে ওই যে সোনার পুতুলা,
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা পদ্মের চক্ষু অইছে ফুলা ফুলা।
কুটনী বুড়িব মন কিগো পাষানেতে গড়া,
সোহাগীর কষ্ট দেইখ্যা খোয়াবে দিশা হারা।
সুজন মুন্সী কান্দে আরও সোহাগী সুন্দরী,
খোপেতে বইস্যা কান্দে কতুরা কতুরী।[১৭]
(অগো) তিন দিন, তিন রাইত এইমত গ্যাল,
নতুন গঞ্জের ধারে আইস্যা সোহাগীরে
খালাস কইর‍্যা দিল।
(অগো) নিশায় বেভোর হইয়া কুট্নী যহন অইলো অচেতন,
সোহাগী কয়, বন্ধু তুমি এই ক্ষেণে না কর ক্যান গমন।
(অগো) সংসার ঘুমাইয়্যা রইছে গভীর নিশাকালে,
কোশাডিঙা খুইল্যা সোহাগী সুজনেরে ডাকে আবডালে।
ডিঙাতে উঠ্যা দুইজনে বৈঠা মারে জোরে,
দণ্ডে দণ্ডে তরাস লাগে ধরা বুঝি পড়ে এই বারে।
(অগো) বাইছা[১৮] ভালো বাইদ্যানী ছেরী পুরুষের মাথা খায়,
কিছুদুর গিয়া ডিঙ্গা ঠ্যাকল এক চরায়।

(১৬) অপমান, (১৭) পারাবত, (১৮) যারা নৌকা বায়—মাঝি

(অগো) আগে কে জানত যে
এইখানেতে হবে বুঝি বৈষম বিপদ,
রাইত পোয়াইলেই দুইজনায় সাজল দুই বলদ।
রাইত পোয়াইলো, ফার্শা অইলো জমিন ছাখা যায়,
সুজনের হস্ত ধইর‍্যা সোহগী চলিল ডাঙ্গায়।
নাও থুইয়্যা ডাঙ্গায় উইঠ্যা চলে দুইওজন,
পথের পাশে কুটির দেইখ্যা করিল গমন।
(অগো) নরুণপুরের জবর ডাকাইত মোঙ্গলের এই বাড়ি,
দিন দুপুরে খারাখ্খারি[১৯] মারে বুকে ছুরি।
এ হেন মোঙ্গলের মায় তহন এক ফিকির[২০] যে জুড়িল,
ঘরের বাইর হইয়্যা আইস্যা দুইওজনায় কুটুম্বিতা করিল।
(অগো) অবসাস্ত[২১] দুইওজনেই শয়তানের মার ফাঁদে দিল পাও,
মার থন[২২] মাসীর দরদ ছাখায় মোঙ্গলেরই মায়।
(অগো) এইনা বুড়ি তহন ঘরের পিছায় বাঁশের ঝোপে দিল লাড়া,
নিশানা বুইঝ্যা মোঙ্গল তহন ঘরে আইলো ত্বরা।
বুড়ি কয়, শোন্ ব্যাটা বান্দীর বাচ্ছা, শোন্ দিয়া মোন,
রূপচান পঙ্খী ঘরে আনছি কুলে[২৩] ল' এহন।
মার কথায় মোঙ্গল তহন ব্যাড়ার ফাঁশা দিয়া ছাখে,
আসমানেরই চন্দর বুঝি আইস্যাছে তার ঘরে।
(অগো) এইনা যোবতীর আমি সোয়াদ যদি না পাই,
মিছাই আমার টাড়িবাড়ি[২৪] সর্দারীর কাম নাই।
(অগো) নাস্তা খাইয়্যা সুস্থ হইয়্যা মোঙ্গল সরদার,
বেড়ার ফাঁশা দিয়া চাইয়্যা বুঝি অইলো চমৎকার।
আহারে কি সুখের নিদ্রায় ঘুমাইছে দুইজন,
চাঁদের আলো মুখে পড়ছে ছাহায় মোমের মতন।

(১৯) যখন তখন—দেখতে না দেখতেই। (২০) কৌশল (২১) অবসন্ন
(২২) মার চাইতে (২৩) কোলে (২৪) জারিজুরি।

সোহাগীর যোবন দেইখ্যা মোঙ্গল জ্বইল্যা মরে,
ভাবে ঐনা বুকে এই দণ্ডেই ক্যামনে ডুইব্যা মরে।
ভাইব্যা চিন্তিয়া মোঙ্গল তহন এক বাঁশের চুঙ্গি যে আনিল,
চুঙ্গির মইধ্যে ইতফাক্[25] কইর‍্যা এক জাইত সাপও ভরিল।
সাপ ঢুকাইয়্যা মোঙ্গল তহন চুঙ্গির মুখ কৌশলে বন্ধ করে,
নিঃশ্বাস বন্ধ কইর‍্যা তায় অরগে ঘরে ফিক্যা মারে।
(অগো) চুঙ্গির পতনে সোহাগীর নিদ্রা ভাইঙ্গা যায়,
ধরমর্ কইর‍্যা উইঠ্যা বসে নিজের বিস্তারায়।
(অগো) চান্দের রোশনাইতে[26] সোহাগী তহন ছাখে চাইয়্যা চাইয়্যা,
চুঙি পইড়্যাছে সুজনের পায়ের লামা দিয়া।
বিপদ গইণ্যা বাইদ্যানী ছেড়ি তহন চুঙ্গিতে মারে লাথি,
লাথির চোটে চুঙ্গি থিকা বাইরাইলো এক জাতি।[27]
(অগো) চরুয়া দুশমনেগের এমন কর্ম
সোহাগীর অনেক জানা আছে,
চক্ষু মেইল্যা চাইয়্যা ছাখে, কাল নাগিনী
আইত্যাছে তার কাছে।
সাপ দেইখ্যা বাইছ্যানী তহন নিজের মূর্তি ধরে,
চৌক্ষের পলক ফ্যালাবার আগেই সাপের গলা টিপ্যা ধরে।
(অগো) বাইছ্যানীর হস্তে বন্দী সাপ তহন
এদিগ উদিগ মোড়ায়,
ল্যাজ দিয়া বাইছ্যানীর হাত বেড়িয়া পেঁচায়।
(অগো) সাপ ধরণের ছলকলা বাইছ্যানীতে জানে,
এক হস্তে ধইর‍্যা সাপে সুজনেরে ডাকে।
ওঠ বন্ধু ওঠগো এহন বিলম্ব না কর,
অস্তর দিয়া কাইট্যা সাপে মোর প্রাণ রক্ষা কর।

(২৫) কৌশল (২৬) আলোকে
(২৭) জাত সাপ=ভয়ানক বিষধর সর্প/কাল কেউটে।

(ওগো) সোহাগীর ডাকে সুজনের নিদ্রা ভাইঙ্গা যায়,
অন্তর বাইর কইর‍্যা সাপের গ্যাহেতে পৌঁচায়[২৮]।
মরা সাপ ফ্যালাইয়া দুইজনে তহন ঘরের বাইরে আসে,
আসমানের সদয়া চাঁদ মিটির মিটির হাসে।
(অগো) রাইত পোয়াইলো ফার্শা অইলো
কাক কুকিলায় লাগাইলো সোরগোল,
ঘরের ঝাঁপ খুইল্যা মোঙ্গলের কাটল বৈষম ভুল।
মুখের গরাশ[২৯] গ্যালে য্যামুন বাঘের কোর্ধ[৩০] অয়,
সোহাগীরে হারাইয়্যা মোঙ্গল উন্মাদ হইয়্যা যায়।
(অগো) চাইর দিগে জলের থিতি মইধ্যে বিশাল চর.
তামাম মুলুকের রাজা অইলো এই মোঙ্গল সরদার।
হস্তে লইয়্যা কাতরা সড়কি মুখে ছাড়ে হাক,
ধর্ ধর্ ব্যাটা মাগীরে যেই ওখানে থাক।
হায় হায় কইর‍্যা মোঙ্গল তহন নদীর ঘাটে যায়,
সোহাগীর কোশাডিঙা উদিগে পবন বেগে ধায়।
(অগো) সাঁতার ভালো জানা ছিল মোঙ্গল সরদারের,
আগে পাছে না দেইখ্যা ফাল[৩১] দিল সে জলে।
(হারে) একেত বাইষ্যার[৩২] কাল তায় কাডালের[৩৩]সোমায়,
হঠাৎ কইর‍্যা পড়ল গিয়া এক কুমাইরের[৩৪] মাথায়।
(অগো) কুমাইরের ল্যাজের ঝাপটায়
মোঙ্গলের গ্যাহ অইলো খান্ খান্,
মাঝ দরিয়ায় গিয়া সুজন কয়,
তোমার লইগ্যাই ফির‍্যা পাইলাম আমার এ পরাণ।

(২৮) পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে ফেলা, (২৯) গ্রাস (৩০) ক্রোধ = রাগ
(৩১) লাফ্ দিল। (৩২) বর্ষাকাল। (৩৩) জোয়ার (৩৪) কুম্ভীর।

—: তিন :—

(হারে) ও আমার মন পবনের নাও,
হিজল কাষ্ঠের নাও গো তোমার সুন্দৈরা কাষ্ঠের গুড়া,
(হারে) পিত্তলের গলুইগো তোমার মাথায় ময়ুর পাখ্খা।

(হারে) এই না নাও বাইয়্যারে সুজন ভাটির ছ্যাশে চলে,
রঙিলা বাদামে তার বাতাস আইস্যা দোলে।
হারাদিন বায় নৌকা সুজন আর ওই সোহাগী সুন্দরী,
সাঁঝ বাতি দেবার কালে ওঠলো নাও ছাড়ি।
সোহাগী কয়, চল বন্ধু উত্তর হ্যাশে যাই,
ঐ না ছ্যাশে গ্যালে বরাবর তোমারগে হ্যাশ পাই।
(অগো) এই না ভাইব্যা তুইওজনে চলে উত্তার ছ্যাশে,
কিছুদুর গিয়া শ্যাষে পৌছাইলো এক ছ্যাশে।

(অগো) নিশি রাইতে পথ চলা ভাল মোনে না লয়,
রাইতভক কাটায় এক বট বিরিক্ষের তলায়।
সোহাগী কয়, সুজন বন্ধু নিদ্রা যাও এহন,
রাইত ফুরাইলে যাত্রা মোরা করমু বিলক্ষণ।

(অগো) বিধির নিবন্ধ বোঝে কে-বা, কে খণ্ডাইতে পারে,
সেইনা বিরিক্ষে ছিল জোড়া ময়না
কিচির মিচির করে।
ময়না পখ্খীর সুমিষ্ট স্বরে ভুবন ভোলায়,
হায় হায় শুন্যা সে পখ্খীর কথা,
সোহাগীর মনে তয় অন্য ভাব উদয়।
সংসার সোমাজ আছে, আছে পরিজন,
অনিত্যের মইধ্যে দেখ নিত্য নিরঞ্জন।
কে কার, তুমি কার, কে বুঝিতে পারে,
তামাম জগৎ চলে দেখ হেনারই বিচারে।

(অগো) রাইত পোয়াইলো ফার্শা অইলো
কাক কুকিলায় করল কত শোর,
সুজনের হস্ত ধইর‍্যা সোহাগী চলে নিরন্তর।
(অগো) এক দণ্ড, দুই দণ্ড, ব্যালা তিন দণ্ডের কালে,
দুইওজনে আইলো গিয়া চন্দরদ্বীপের মূলে।
নিজের ছ্যাশের নিশানা ছ্যাখাইয়্যা
সুজন তহন সোহাগীরে কয়,
আইজ নিশিথেই মোরগো ছ্যাশে পৌঁছাইমু নিচ্চয়।
কিছুদূর গিয়া সোহাগী তহন কয় বিনয় করি,
সুজন বন্ধু ঘরে ফের মুই অন্য রাস্তা ধরি।
সুজন ভাবে সোহাগী বুঝি জুইড়্যাছে মস্করা,
হস্তে ধইর‍্যা কয় তারে এ ক্যামুন আস্কারা?
ছ্যাশে ফিব্যা বন্ধু তোমায় করমু আমি বিয়া,
তোমারে রাখিমু মুই দই ও দুগ্ধ দিয়া।
সোহাগী কয় কাতর কণ্ঠে, না করিও মান,
বাইভ্যানীর মাইয়্যা মুই করিমু পরস্থান।
বন্ধু, ভালবাস, ভালবাসি, মানলাম ভাল-বাসা-বাসি,
তোমার ইষ্ট লাইগ্যা মোরে ত্যাজ্য কর
মুই এই বারে আসি।
সুজন কয় কইণ্যা তুমি এতই পাষাণ,
তোমার হস্তেই সঁইপ্যা দিছি মোর জান পরান।
(অগো) এই না কথা কইয়্যারে সুজন তহন কান্দিতে লাগিলো,
কান্দিতে কান্দিতে তখন রাত্র অধিক হইলো।
(হারে) সুজন কান্দে, সোহাগী কান্দে, কান্দে বোনের তরুলতা,
কপোত কপোতী কান্দে শুন্যারে এ বারতা।
আষাইঢ্যা মাসের নয়া ম্যাঘ য্যামুন গগন আন্ধার করে,
তেমনি সোহাগীর মুখ দুভাশে থমৃথম করে।

(অগো) কান্দিয়া বাইগ্যানী মাইয়্যা সোহাগী সুন্দরী,
সুজনেরি হস্তে ধইর‍্যা কয় বিনয় করি।
অগো বন্ধু সত্য কর, কর অঙ্গীকার,
বিয়া যাই কর, কর, মোরে না ছুঁইও আর।
আমারে কইরো বিয়া কিন্তু থাকমু দুইজনায় দুই ঘরে,
ত্যাল পানীতে যাামুন মিশ খায়না কোন কালে।
এ হেন সইত্য যদি তুমি কইরবার পার,
অবশ্য আমারে লইয়্যা যাত্রা করতে পার।
সুজন ভাবে, এমন অসম্ভব কথা কেউনি শুন্যাছে,
মস্করা[৩৪] নিচ্চয় করছে বাইগ্যানী তার লগে।
সোহাগীর বাক্যে রাজী সুজন মুন্‌সী তাই,
দুইজনায় ঘরে ফেরে যাান কোন ক্ষেদ নাই।

—: চার :—

(হারে) ডুম্ ডুমা ডুম্ বাইদ্য বাজে, বাজে জয় ঢাক,
সেঁতারা চৌতারা বাজে, জগঝম্প মাঝে মাঝে
কাঁসি, বাঁশী, সারিন্দাদি সাঁনাই।
বাজে জয়ের বাজনা বাজে সুজন মুন্‌সীর বিয়া,
সগল পরজায় গীত গায় পান তাম্বুল খাইয়া।
(হারে) চেরাগ[৩৫] জ্বলে, নিশান ওড়ে পুরীর চাইর ভিতে,
হগ্গল আইওতে জোকার[৩৬] দ্যায় কুলা লইয়া হাতে।
(হারে) দ্যাখতে দ্যাখতে দিন গ্যাল, গ্যাল পক্ষ কাল,
সোহাগী সুজনে বসতি করে মইধ্যে মস্ত খাল।
একদিন, দুইদিন কইর‍্যা সুজন কতবা সবুর করে,
এক নিশাতে ঢোকল গিয়া সোহাগীর শয়ন মন্দিরে।

(৩৪) ঠাট্টা, (৩৫) আলো (৩৬) উলুধ্বনি।

সুজনেরে দেইখ্যা সোহাগী কয় মিষ্ট মধুর ভাষে,
এত রাইতে ক্যান বা আইছ আমার শোয়ার ঘরে।
সুজন কয় সোহাগী তুই নিদয়া পাষাণী,
বিয়া কইর‍্যা তরে ছাইড়্যা ক্যামনে রই
কও দেহি যাদুমনি।
তোর লইগ্যা মুই যে গো জীয়ন্তেতে মরা,
কোন্‌বা দোষে অইলাম আমি আকুটা কপাল পোড়া।
সইবার না পারি মুই রিপুর যাতনা,
তুমি আইয়া বুকে লও যাউক এ বেদনা।
সোহাগী কয়, বন্ধু তুমি নি হইয়্যাছ বেস্মরণ,
বিয়ার আগে যে কীরা কাটছিলা নাই কি তা স্মরণ।
তুমি আমার, আমি তোমার জন্ম জন্মের সাথী,
তোমার লইগ্যা পরাণ দিতেও তুচ্ছ জ্ঞেয়ান করি।
সগল বস্তু দেবার পারি যৈবন ক্যাবল বাদ,
ওই বস্তু চাইলেই বন্ধু ঘটবে বিসম্বাদ।
ঘরে যাও সোনাবন্ধু ধরি দু'টি পাও,
আর যদি খার‍্যাইয়্যা থাহ আমার মাথা খাও।
সুজন কয়, ছাড় ও সব কথা,
আইজ নিশিথেই শ্যাষ করমু বুকের এ যাতনা।
ছলা কলা জান ভাল বাইস্থানী নাগরী,
কোন আল্‌গা মাইন্‌সে মন দিছ কও দেহি সুন্দরি।
আমার থিকা বড় নাগর কেবা অইলো তোর,
হেই সগল বিত্তান্ত কথা কও দেহি সত্বর।
সুজনের বাইক্যে সোহাগীর চৌক্ষে ঝরে পানি,
করজোড়ে কয় কথা, মাপ কর আপনি।
সোহাগী কয়, হগল কথা কইবার পারি যদি শোনতে চাও,
হের পরে এ অভাগীর জীবন আর না ফির‍্যা পাও।

সগল কথা কইবার পরে আর বাচমু না মুই,
এই সইত্য করলে পরে কমু সব নিচ্চয়ই।
সুজন কয়, ওসব ভোক্কা[৩৭] কথা থোও,
কীয়ের লইগ্যা ছল চাতুরী হেই কথাডাই কও।
সোহাগী কয়, বেশ কথা বইল্যাছ সুজন,
কইমু সগ্‌গল কথা খারাও এট্টুকক্ষণ।

এই কথা কইয়্যা সোহাগী তহন পালঙ্ক ত্যাজিল,
সুজনের হস্ত ধইর‍্যা পুরীর বাইরে গ্যাল।
ঘরের বাইর হইয়্যা সোগাগী তহন চলে নদীর ঘাটে,
মুখে কোন রা নাই দুক্ষুতে বুক ফাটে।

(অগো) নদীর ঘাটে আইয়্যা দুইজন, চায় চান্দের দিকে,
চতুরদশীর দীঘলা চাঁদ বুঝি হেই দেইখ্যা কান্দে।
হাপুস নয়নে কাইন্দা কাইন্দা সোহাগী জিগায়,
শ্যাষবার কও বন্ধু কী তুমি চাও,
আমারে না পাইবা তুমি কথা যদি পাও।
সুজন কয়, বাইদ্যানী তোর ছলা কলা রাখ,
সগ্‌গল কথাই শুনমু আমি হেই কথাডাই থাক।

ভাল, ভাল, ভাল বন্ধু বইল্যাছ তুমি ঠিক,
এই বইল্যা সোহাগী তহন চলে ঘাটের দিক।
ঘাটলাতে লাইম্যা সোহাগী তহন চতুরদিগে চায়,
বলে, বন্ধু তোমার লগে আমার মিলন
অইবার উপায় নাই।
সোহাগী কয়, শোন বন্ধু, শোন দিয়া মোন,
এই কিস্‌সা[৩৮] শ্যাষ অইলেই মোর
থাকবে না আর জীবন।

(৩৭) বাজে কথা=মিথ্যা কথা। (৩৮) কাহিনী,

ওগো কোথায় গো মা, শোন গো মা, নিদয় হইওনা,
তোমার নামে কিরা[৩৯] কাইট্যা মিছা কিছুই কইমুনা
(অগো) হুগুমপুরের সুবিদ্ধি চাঁদ বৈস্থাশেতে গ্যাল,
তার না ঘরে ডাঙ্গর বউ এক পাথারে[৪০] ভাসিল।
(অগো) এইনা আবার মাসে সাধু গ্যাল বৈস্থাশেতে,
ঘরের নারী একলা ঘরে ক্যামনে রইতে পারে।
(হারে) ঘরের পিছে বাঁশের ঝারে পাগলা বাতাস ছাড়ে,
আবাইগ্যা নারীর প্রাণ বুঝি আন্‌ছান করে।
(হারে) দেয়ার পানি ঝরঝরাইয়্যা অঝোর ঝইর‍্যা পরে,
হুতাশী যৈবতীর প্রাণে বুঝি শ্যাল বিন্ধে।
(হারে) বৈস্থাশেতে গাছেরে সাধু মোনে নাই কি তার,
উগার তলে বইয়্যা কাটায় কিছু শুকনা
নাই যে আর।
(হারে) হাড়ুম হুড়ুম ঠাডা পরে ব্রেক্ষ উলটায় কত,
মর্‌মর কইর‍্যা ভাঙ্গে ঘর দুয়ার যত।
দেয়ার পানী আইলো বুঝি
আইলো বাইয্যা পোতা[৪১] সই সই,
বে-আক্কেইল্যা মাইনষের কথা কার লগে বা কই।
(হারে) কতদিন অইলো গত কিছুই নাই গনি,
একমনে কহি শুন বাতাসীর কাহিনী।
(হারে) আসমানে বিজলী হানে ডরে ভাঙ্গে বুক,
সাপ, ব্যাঙ লইয়্যা কাটায় বোঝ ক্যামুন সুখ।
(হারে) চালের বাতা বাইয়্যা পানী ভিজায় সব্ব অঙ্গ,
পোলাপানেগো কোথায় রাখে পায়না কোন সন্দ।
(হারে) ভিজিল সগল অঙ্গ ক্যাম্‌নে বাঁচায় জান,
আটু সমান অইলো পানী ঘরের মইধ্যখান।

(৩৯) দিব্যি (৪০) বিপদে। (৪১) ঘরের ভিত

(হারে) একমাস, দুইমাস কতদিন না জানি,
বাণিজ্যে গ্যাছেরে মানুষ ফেরবার নাম করেনি।
শাবনমাসে গ্যালরে যুয়ান ঝোমরা মুড়ায় দিয়া,
(ও তার) কাঁচি, কাঁথা, হুক্কা তামুক নিল সঙ্গে কইর‍্যা।
ভাদ্দর মাসে নাও দৌড়ানি সগ্‌গল লোকে জানে,
বে-বুইঝ্যা ঘরের মানুষ তাও বুঝি না গোনে।

(হারে) ভাদ্দর গ্যাল, আশ্বিন আইলো পানিতে পইলো টান,
নয়া আশা লইয়া কাটায় যৈবতী পরাণ।
কাতিক মাসে হইলদা[৪২] কীষ্যি বাড়ুইতে রোয় পান,
ঘরের মানুষ ঘরে আইলে বইয়্যা করতাম মান।
আইলোরে আঘান মাস ক্ষ্যাতে পাকা ধান,
বরণ দেইখ্যা সোনার ধানের জুড়াইতো পরাণ।
নয়া ধানের নবান্নের চাউল গেরহস্তে কোটে,
ঘরের বন্ধু নাইরে ঘরে দুক্ষে পরাণ ফাটে।
পৌষ মাসে নয়া গুড় খাওয়ার সোয়াদ কত,
রসের পায়াস রাইন্ধ্যা দিত বন্ধু যদি আইতো।
মাঘ মাসের বাঘা শীতে কইন্যার গায়ে নাইরে কাঁথা,
ঘরের বন্ধু ঘরে আইলে জুড়াইতো যাতনা।
ফাগুন মাসে বসন্তকালে নানা পুষ্প ফোটে,
এমন সুন্দইর‍্যা দিনে কইন্যার দুঃখে বুক ফাটে।
ফাগুন গ্যাল, চত্তির আইলো
আইলো খড়াইন্যা[৪৩] কাল,
কালা বন্ন অইলোরে কইন্যার লাগিয়া ঝামাল।
চত্তির মাসে কান্দে কইন্যা পন্থ পানে চাইয়া,
উক্কি[৪৪] দিয়া চাইয়া থাকে বৈদেশী দেইখ্যা।

(৪২) হরিদ্রা বর্ণের (৪৩) শুকনোর দিন (৪৪) উকি দিয়ে দেখা,

বৈশাখ মাসে জালি পাট কিষ্যাণ[৪৫] নিরায় ভূমি,
লাউ কুমারের ডোগা দিয়া কইন্যা রান্ধে তরকারী।
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম, গাছে কালাজাম,
যৈবতীর বদন চুয়াইয়্যা পরে গ্রীষ্মের ঘাম।
আষাঢ় মাসে বগা[৪৬] জল ক্ষ্যাতে ডাঙ্গর পাট,
খালা, বিলা, নদী, নালা ডুবায় পথ ঘাট।
এই-না মাসে গ্যালরে বন্ধু আসিব বইল্যা,
অভাগিনী বইয়্যা রইলো পন্থ পানে চাইয়্যা।
(অগো) ছ্যাখ্, ছ্যাখ্ কইর‍্যা পানি ওঠলো মাচাঙের পর,
স্নুতের ঠ্যালায় ভাইস্যা গ্যাল পুরান ছোনের ঘর।
এই না সময় বাতাসী তয় এক ফিকির যে জুড়িল,
বিলাইয়ের নাগান পোলাপানগো লইয়্যা
বাইরাইয়্যা আইলো।
ঘরের বাইর হইয়্যা বাতাসী তহন চতুরদিগে চায়,
আসমানে ম্যাঘের ঘটা শব্দ শোনা যায়।
দিশা বিশা না পাইয়্যা বাতাসী তহন ভাসাচালে ওঠে,
জয় মা, জয় মা বইল্যা তহন নিদানের ডাক ছাড়ে।
(ওগো) আহাশে পাগলা হাওয়া তাহে দেয়ার পানী,
কতদূর যে পার অইলো কিছুই নাই গণি।
(ওগো) এক দণ্ড, দুই দণ্ড, চাইর দণ্ডও যায়,
পানী কৌড়ির নাগান[৪৭] ভিজ্যা বাতাসী তহন
আসমান দিকে চায়।
(ওগো) ভিজিল সগল অঙ্গ পানী আর বাতাসে,
কোলে থাইক্যা পোলা মাইয়্যা চিকরাইলো ক্ষিধাতে।
(হারে) কাইট্যা গ্যাল কালা ম্যাঘ ভানুর উদয়,
একদিগেতে উদয়গো ভানুর, দশ দিকে পাসর।

(৪৫) কৃষাণ, (৪৬) নতুন=ঘোলাটে জল। (৪৭) মত=অনুরূপ

ভানুর উদয়ে অঙ্গ অইলো তাপিত.
সোয়াস ছাইড়্যা বাতাসী তয় চোখের পাতা যে মেলিল।
চৌক্ষু চাইয়্যা বাতাসী তহন এদিক ওদিক চায়,
নাগালের মইধ্যে একখান ডাঙ্গা দেখিবারে পায়।
ডাঙ্গায় নাইম্যা বাতাসী তহন বস্তর শুক্না করে,
একখোট পইর‍্যা বস্তরের ঐন্য খোট সে ঝাড়ে।
গাঙের পাড়ে ডাঙ্গারপরে বটবৃক্ষ একটি দেখা যায়,
আশ্রয় ভাইব্যা বাতসী তহন পৌছাইলো হেথায়।
কোল থিকা নামাইয়্যা পোলা মাইয়্যা
বাতাসী তহন আশ্রয়ের তালাশ করে,
ভাটী গাঙের বুকের পরে এক পান্সী দেখিবারে পারে।
পান্সী দেইখ্যা বাতাসী তহন ভাবে মনে মনে,
ওইনা নায়ে আইত্যাছে বুঝি তারই পতিধনে।
নদীর বসন্তকালে যেমুন ভাইঙ্গা লামায় মাটি,
নারীর যৈবন কালে তাই পুরুষ গলার কাঠি।
(হারে) এ-হেন যৈবন যার ধইর‍্যাছে জোয়ারে,
কোহানে[৪৮] রাখিমু তারে সজুত[৪৯] করিয়ে।
সোয়ামীর চিন্তায় বাতাসী তাই বান্ধে দিব্য[৫০] খোঁপা,
যুৎ[৫১] কইর‍্যা পরল কাপড় দুইও ফেত্যা দিয়া।
ত্থাখতে ত্থাখতে পান্সী আইলো ঘাটের কিনারা,
উকি মাইর‍্যা চায় বাতাসী ছইয়ের ফোকর দিয়া।
ছইয়ের ভিতার ত্থাখে বাতাসী সোনার লঙ্কাপুরী,
ভাবে নিচ্চয়ইবা অইবে কোন্ পরদেশী ব্যাপারী[৫২]।
নাও লাগাইয়্যা মাঝি কয়জন লামে জমিনের উপার,
ভাল মাইনষের মতন জিগায় ত্থাশের সোমাচার।

(৪৮) কোথায়=কোনস্থানে (৪৯) সোজা=আয়ত্বে রাখা (৫০) সুন্দর
(৫১) ভাল করে, (৫২) সওদাগর.

উজ্জানী বাতাসী তহন ভাইব্যা চিন্তা কয়,
কথার ছলে দুইও মাঝিতে নিকটে ঘোনায়।
(অগো) দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা ঘনইয়্যা বসে কাছে,
কথা দিয়া কথা নেয় প্রাণে মারে শ্যাষে।
কথা কয় দুই মাঝিতে ভাল মাইনষের মত,
পিছান থিকা দুই মাঝিতে ধরল তারি অঙ্গ।

(অগো) চিক্‌রাইবার আগেই তারে নায়ের উপার তোলে,
চৌক্ষের পাতা ম্যালবার আগেই নায়ের বাদাম খোলে।
ছাড়িলো বোম্বাইট্যা নাও রত্তনদ্বীপের পথে,
উথালী পাথালী কান্দে বাতাসী নায়ের পাটাতনে।
পাছাড় খাইয়্যা পড়ে বাতাসী ঝম্প দিবার চায়,
আউল্যা ক্যাশে ছইয়ের মইধ্যে পাষাণ হইয়্যা রয়।
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা ফুলায় চক্ষু কয় দুঃখের কথা,
পরাণ থাকলে খইয়্যা পরত নায়ের চালির বাতা।

(হায়রে) দুশ্‌মন বোম্বাইট্যা সাধুর ধলা গায়ের রং,
চৌক্ষু দুইডা লাল তার য্যামুন চত্তির মাইস্যা সঙ।

(হায়রে) মস্তকে ট্যারছা টোপ্পি কোমরে তরুয়াল,
পাও প্যাচাইয়্যা পরছে কামিজ দ্যাখতে কী বাহার!

(হারে) বিষ খাইয়া বিষের ত্যাজে য্যামুন কালনাগিনী ঢোলে,
হেই রকম বোম্বাইট্যা সাধু তরতাগাদায়[৫৩]
হেরি হস্ত ধরে।

সুরাব গোন্ধে বাতাসীর নাড়ীতে ছ্যায় পাক্‌,
ওয়াক্‌ থু কইর‍্যা তার গায়ে দ্যায় ছ্যাপ।[৫৪]
হ্যাঃ হ্যাঃ কইর‍্যা হাসে বোম্বাইট্যা সদাগর,
আউগাইয়্যা গিয়া তারে করে সোমাদর।

---

(৫৩) চটুপট (৫৪) থুতু।

জ্বইল্যা ওঠে অগ্নি য্যামুন বাতাশের স্বোয়াদ পাইয়্যা,
তেইজ্যা ওঠে ফণি য্যামুন হইয়্যা মণি হারা।
বাতাসী তেমন বুঝি উন্মাদ হইয়্যা যায়,
অঙ্গলগ্ন হইয়্যা তারে মরণ কামুড় দেয়।
দাঁতের বিষের চোটে বোম্বাইট্যা তহন
নিদান ডাক ছাড়ে,
এক্কই ঠ্যালায় পড়ল গিয়া দরজার কিনারে।
দরজা খোলা পাইয়্যা বাতাসী তহন দিল বিষম দৌড়,
ধর্ ধর্ কইল্যা তোলে বিষম শোরগোল।
পিছান ফিরা য্যামুন ছ্যাহে আইতাছে শয়তান,
আগে পিছে না ভাইব্যা বাতাসী নদীতে ছ্যায় ভাসান।
গ্যাল, গ্যাল, ধর্, ধর্, মহা শোরগোল,
নদীর কাড়ালে[৫৫] বাতাসী গ্যাল রসাতল।
(হারে) একদণ্ড, দুই দণ্ড, কত দণ্ড যে গ্যাল,
জালুয়ার জালে তার হদিস না পাইলো
হাতরাইয়্যা উপায় না দেইখ্যা
বোম্বাইট্যা নাও তহন গঞ্জের দিকে ধায়,
নতুন পরস্তাব এহন কিছু শোনেন মহাশয়।
সোহাগী কয়, সুজন বন্ধু কী কব আর অধিক,
সুতোরি শ্যাওলা হইয়্যা বাতাসী ভাইস্যা গ্যাল খানিক।
ভাইস্যা ভাইস্যা বাতাসী তহন চরের কিনারায় যায়,
মরা মানুষ ঠাউরিয়া কাক পঙ্খীতে ক্যাবলি ঠোকরায়।
(অগো) ঠোকরানীর জ্বালা বাতাসী সইতে না পাইর‍্যা,
খানিক পরে ওঠে জাইগ্যা চ্যাতনা পাইয়্যা।
জ্ঞান ফির‍্যা পাইয়্যা বাতাসী তহন টালু মালু চায়,
মতিচ্ছন্নের[৫৬] লক্ষণ কিছু বুঝিবা পরকাশ পায়।

(৫৫) বিষম ঘূর্ণী স্রোতে। (৫৬) পাগোল

মতিচ্ছন্ন ব্যাশে বাতাসী এ ছ্যাশ ওছ্যাশ ফেরে.
বাইশ বচ্ছর কাটলে শ্যাষে গ্যাল সুবন্নপুর রাইজ্যে।
(অগো) ধইন্য রাজার পুণ্য ছ্যাশ সুখ শান্তিতে ভরা,
তামাম ছ্যাশে এমুন রাজা নাইরে আরেক জোড়া।
(হারে) বিধির কি নিব্বন্ধ ছ্যাখ এমুন যে সোনার রাজা,
বিয়া না করল রাজা দুঃখে কান্দে পরজা।
(হারে) রাজার ছিলো অনেক গুণ চৌদিগে তার ছটা,
ব্যাভার তার য্যামুন ত্যামুন কথা গুলা মিঠা।
মুন্ত্রী বলে, এক নিবেদন রাখি মহারাজের ঠাঁই,
বয়সত অনেক অইলো এহন বংশ রক্ষা চাই।
সুন্দরী যোবতী কইন্যা ছ্যাশে আহাল কিছু নাই,
আজ্ঞা করলে ঘটকের পোয় জোটাইবে নিচ্চয়ই।
চৌদিগে ম্যালাইয়্যা আসর, রাজ বইছে মইধ্য খানে,
অযুত নিযুত তারার মইধ্যে চন্দ্র য্যামুনতর শোভে।
মুন্ত্রীর বাক্যেতে রাজার চিন্তিত আনন,
সগল কথা সমাচারে করেন শ্রবণ।
হেনকাল আমদরজায় এক নারীর কান্না বুঝি শোনে,
মোনে মোনে পুরান কথা নানাভাবে গোনে।
রমনীর কান্না শুন্যারে রাজা তহন মুন্ত্রীরে পাড়ে হাঁক,
কান্দে কেডা ওই রমনী হেরে[৫৭] সভার মইধ্যে ডাক।
মুন্ত্রী কয় এক পাগলী রমনী রত্তন,
মহারাজের লগে সাক্ষাৎ কইর‍্যাছে মনন।
রাজার আদেশ শুন্যা কেউ কেউ পাগলীরে ডাইক্যা আনে;
সভায় আইয়্যা পাগলী তহন হিঃ হিঃ কইর‍্যা হাসে।
বলে, শোন রাজা শোনগো তুমি হাচা কথা কও,
কোন্ বা ছ্যাশে ঘরগো তুমার মিছা নাহি কও।

(৫৭) তাহাকে

রাজা কয়, পাগলী তুই ভিন্‌দেশী কোন্ নারী,
আকিঞ্চন[৫৮] থাকলে কিছু মুই দেবার পারি।
পাগলী কয়, রাজা মোর যাচনা কিছু নাই,
আমার পোলা মাইয়্যা রইল কই হেগো তল্লাস চাই।
বাইশ বচ্ছর অইলো গ ও ত্থাশ-বিত্থাশে ঘুরি,
পতি গ্যাল বৈত্থাশেতে পোলাপান গ্যাল চুরি।
ত্থাশ বিত্থাশে পাগল হইয়্যা বেড়াই ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা,
বাতাসী আমার নাম ত্থাখ স্মরণ কইর‍্যা।
এই কথা না কইয়্যা বাতাসী তহন নিজের কথা বলে,
সগল বিত্তান্ত শুন্যা রাজা তারই হস্ত ধরে।
রাজা কয়, শোন ওগো বাতাসী সুন্দারী,
বিধির ইচ্ছায় মিলাইছে তোমায়
এবার মাইয়্যা পোলার খোঁজ করি।
রাজা তহন মুন্ত্রীরে কয় ডাইক্যা,
সপ্তডিঙা সাজাইয়্যা ত্থাও মুই দেখমু তাল্লাস কইর‍্যা।
সোহাগী কয়, সুজন বন্ধু বইল্যাছিত' অনেক,
এহনও যদি না বুইঝ্যা থাহ কী কব বা অধিক।
পোলা মাইয়্যা ফ্যালাইয়্যা বাতাসী
যহন নায়ে উইঠ্যা গ্যাল,
হেয়ার পরেই সেইনা ঘাটে এক বাইত্থানী নাও আইলো।
তফাৎথিকা ত্থাহে বাতাসী তার দুইডা শিশু সন্তান,
বিরিক্ষের তলাতে তারা রইয়্যাছে শয়ান।
রৌদ্দুর আইয়্যা পরত্যাছে ত্থাহে মাইয়্যাডার চোহে মুখে,
কোথায় ছিল অজগর সাপ এক
আইয়্যা তার ফণ্যা মেইল্যা ধরে,
(ঠিক হের মস্তকের উপার)।

---
(৫৮) প্রার্থনা

এ-হেন তাজ্জব বিত্তান্ত দেইখ্যা কুটনী তহন
মোনে মোনে গোনে,
এই-না কইন্যা বুঝি কোন্ ছাবতা না হবে।
(অগো) মুনিষ্যের আতার[৫৯] পাইয়্যা সাপ তহন
গদের[৬০] মইধ্যে ঢোকে,
সোনার দলা মাইয়্যাডা কুটনী তহন তুল্যা নিল কুলে।
মাইয়্যা নিয়া কুটনী তহন নায়ের বাদাম খোলে,
দণ্ডখানেক পরেই এখানে আরেক ঘটনা ঘটে।
সোহাগী কয়, এহনও ক্ষ্যান্ত দেই তুমি যদি কও,
হে না[৬১] অইলে শ্যাষ কথা শোনার লাইগ্যা
খাড়া অইয়্যা রও।
সুজন কয়, ভাল কথা বইল্যাছ বাইছানী,
এতই যহন কইতে পারলা শ্যাষ কথা খানও শুনি।
সোহাগী কয়, ভালকথা বইল্যাছ সুজন,
এই বাক্য শ্যাষ অইলেই ত্যাজিব জীবন।
সাক্ষী রইও চন্দর সূরয, সাক্ষী রইও বোনের তরুলতা,
বনাবিবি কইরো কীরপা সুখে থাউক মোর মাতা পিতা।
জাংগুলি[৬২] দেবীরে বন্দি বন্দি পাহাড় পব্বত,
আহাশের তারারে বন্দি, বন্দি তামাম জগৎ।
(অগো) বাইষ্যা গ্যাল রৌদ্দুর ওঠলো হাসল বসুমতী,
সেইও না ঘাটে সিনানে আইলো
মুন্সীবউ নামেতে বিদ্যাবতী।
(অগো) বিদ্যাবতীর অনেক গুণ ছাশ বিদ্যাশে নাম,
বাঁঝা নারী হইয়্যা দুঃখে কাটায় দিবস যাম।

(৫৯) আগমন সংবাদ (৬০) গর্ত, (৬১) তাহা না হইলে।
(৬২) মনসা দেবীর প্রাচীন নাম।

ঘাটেতে আইয়্যা ঠাইরন্ পোলার কান্দন শোনে,
শুন্যা না সেই কান্দন দুঃখেতে বুক ফাটে।
(ওগো) দ্যাবতার লীলাখেলা বল কে বুঝতে পারে,
কারবা শিশু না জাইন্যাই পোলা কুলে করে।
এই পর্যন্ত না বইল্যা সোহাগী তহন জলেতে পাও দ্যায়,
চৌক্ষু বাইয়্যা পড়ে পানি ফির্যা ফির্যা চায়।
মাজাজলে নাইম্যা কইন্যা তহন করে নিবেদন,
এহনও ক্ষ্যান্ত দাও পরাণ-বন্ধু না কর বাদন।
সুজন কয়, বাইদ্যানী তুই চতুরা খুবই মানি,
আদত কথা ভাইঙ্গা ক' সুস্থির হইয়্যা শুনি।
সোহাগী কয়, সুজন বন্ধু মোনে মোনে গনিও এহন,
ঐ না পোলা আর কেউনা বিনা মুন্সী সুজন।
(অগো) চাঁন্দের মতন ওইনা পোলা তুমি যদিগো হও,
আমি সোহাগী সেইনা কইন্যা তোমার বুইনতো নিচ্চয়।
যেদিন থিকা ময়না পঙ্খীর মুখে শুইন্যাছি
মোরগো আদত পরিচয়,
সেইও থিকা মোন করছি ত্যাজমু এ জীবনও নিচ্চয়।
অজ্ঞানে অনেক পাপ কইর্যাছি বাইদন,
ডালি দিয়া এ জীবন করমু সকার্য সাধন।
(অগো) মোর বাক্য প্রত্যয় কইরো কুটনী মাগীর কাছে,
বাকী খানিক শুইন্যা নিও জননী বিদ্যাবতীর ধারে।
এই কথা না কইয়্যা সোহাগী তহন সুজনের
পায়ে হস্ত দেয়,
হস্ত দিয়া সেবা দিয়া জলে ফাল্ দেয়।
(অগো) জলেতে ফাল্[৬৩] দিয়া সোহাগী তহন অকুলে তলায়,
বুইন বুইন বইল্যা ডাক ছাইড়্যা সুজনও ফাল্ দ্যায়।

(৬৩) লাফ্ দেওয়া

(অগো) গাঙের পানীতে ছিলো বৈষম কাডাল্[৬৪],
তুইজনারে লইয়্যা গ্যাল শেতল পাতাল।
(অগো) সোহাগী বাইগ্যানীর কথা কণ্ডনো না যায়,
গ্যাখতে গ্যাখতে নিশি পরভাত অয়।
(অগো) রাইত পোয়াইলো ফার্শা অইলো লাগল শোরগোল,
তামাম গ্যাশের মুনিষ্যে আইলো মহা হট্টগোল।
(অগো) যেইনা ঘাটে ডুইব্যা মরছে অরা তুইজন,
সেইও ঘাটে আইলো এক বজরা বিষম।
বজরা থিকা নাইম্যা আইলো সুবুদ্ধি কুশারী,
হেরও পিছনে দেহা দিল বাতাসী সুন্দরী।
(অগো) বাতাসীর পেছন পেছন তুইলাশ নিয়া আইলো
মাল্লা ষোল জন,
একটা সোহাগীর গ্যাহ আর একটা সুজন।
হারে মরা পোলা দেইখ্যা কান্দে সুজন মুন্‌সীর মায়,
সোমাচার জাইন্যা কান্দে সুবুদ্ধি চাঁদ রায়।
হারে হাপুস নয়ানে কান্দে বাতাসী সুন্দরী,
ফারাকে খারাইয়্যা কান্দে পরদেশী বাইগ্যানী।
(হারে) কান্দে রাজা, কান্দে পরজা আরও ওই জননী বিদ্যাবতী,
ঘরের চালে বইয়্যা কান্দে কপোত ও কপোতী।
রাজা কয়, যেইনা ঘাটে ডুইব্যাছে কইন্যা মোর
আদরের তুলারী,
সেই না ঘাটের নাম অইবে 'ঘাট-সোহাগী'।
অধম নিবারণ কয় বিনয় কইরে,
এ-ভবে কারে কে চিনতে পারে,
চিন্তমনি রয় যে হৃদে স্মরণ তারে গ্যাওনা ক্যানে।

---

(৬৪) স্রোত।

আলোচনা

উপরোক্ত গীত-কথা (Ballad) টি আমি সংগ্রহ করি ১৯৪৭ খৃঃ অঃ মার্চ মাসে ধুবুলিয়া (রানাঘাট, নদীয়া) উদ্বাস্তু শিবিরের বাসিন্দা হারান চন্দ্র দাস বৈরাগীর কাছ থেকে। এই গীত-কথাটির সম্ভবতঃ শেষ গায়ক হারান চন্দ্র দেশ ভাগের পর (১৯৪৭ খৃঃ অঃ) পশ্চিমবাংলায় এসে নানা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেন এবং শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাজীবি হয়ে উদ্বাস্তু শিবির পরিত্যাগ করেন এবং নদীয়া জেলার চাকদহে দুর্গানগর গ্রামে তার দেহাবসান ঘটে।

গীত-কথাটির ভণিতায় রচয়িতা হিসেবে নিবারণ দাস করের নাম পাওয়া যায়। যতদূর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতে জানা গেছে নিবারণ দাস করের পূর্ব নিবাস ছিল পূববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার বুড়ুরা থানার অন্তর্গত সাউদমারা গ্রামে।

গীতিকার কাহিনীটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ সোহাগী বাইস্থানী, দ্বিতীয় অংশ বাতাসীর কাহিনী।

কাহিনীর প্রথম অংশের সাথে পূর্ব ময়মনসিংহের প্রচলিত অনেক 'লম্বাগীত' বা ৺চন্দ্রকুমার দের সংগৃহীত (৺দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত) মহুয়া পাল গানের খানিকটা মিল পাওয়া যায়। কাহিনীটি যদি শুধু মাত্র সোহাগীর ঘটনায়ই সীমাবদ্ধ থাকত বা বাতাসীর দুঃখের কাহিনীই বর্ণিত থাকত তা'হলে আমাদের চিন্তার কিছু ছিলনা। এই দু'টি কাহিনী একত্রে জুড়ে থাকায় স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—দু'টি কাহিনী কি একই রচয়িতার রচনা কি না।

স্বীকার করে নেওয়া যাক এটি একই লোকের রচনা, কালক্রমে মুখে মুখে প্রচারের ফলে মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ ভাবে কিছু কিছু অসঙ্গতিও নজরে এসেছে। যেমন ধরা যাক, সুবুদ্ধি চাঁদ বাণিজ্য করতে গেল কিন্তু তার পরের ঘটনা বা কী করে যে সে অন্য দেশের রাজা হয়ে বসল তার কোনো বিবরণ নেই। মনে হয় এই অংশটি মূল পালা থেকে বাদ গেছে।

গল্পের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় (রূপকথায় অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়) সে বাণিজ্য করতে এসে কোন এক দেশের রাজা হয়ে বসে গেল। কিন্তু কী ভাবে ? তা জানবার জন্য পাঠকের মনে প্রশ্ন থেকেই যাবে। লোক-গীত-কথা আর রূপকথা এক নয়। রূপকথায় অনেক অসঙ্গতি থাকলেও সেটা ধর্তব্যের মধ্যে কেউ ধরেনা, কিন্তু লোক-গীত-কথা (Ballad)র পাঠক তেমন অসঙ্গতি বা বাস্তব বহির্ভূত কোন কিছু চট্ করে স্বীকার করে নিতে চায়না।

গীতিকার শেষ অংশে যেখানে সোহাগী শুক পাখির (ময়না পাখি) মুখ থেকে তার এবং সুজনের জন্ম বৃত্তান্ত জানতে পারল—এরূপ ঘটনা রূপকথায় পাওয়া যায় বটে, বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মনে হয় গীতিকার ঐ অংশটুকু গীতিকার মূল পাঠ থেকে বিচ্যুত।

এরপর প্রশ্ন আসে কাহিনীটি কোন্ যুগের ? এর ভিতর নির্দিষ্ট কোন ধর্মের কথা না থাকলেও তখন যে আমাদের সমাজে 'সমাজ ব্যবস্থা' চালু হয়ে গেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অধীনস্থ হয়নি সে সমাজের লোকেরা। তখনও বোধ হয় শৈব ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্মেরত কথাই নেই। কাজেই মনে করা অসঙ্গত নয় যে কাহিনীটি বৌদ্ধ যুগেরই। কারণ, এর ভিতর যে দু' একটি দেব দেবীর কথা পাওয়া যায় তারা সবই বৌদ্ধ যুগের বলেই মনে হয় যেমন, জাঙ্গুলী দেবী (জঙ্গলের দেবী) হলেন মনসা—যিনি অনেক পরে হিন্দু সমাজে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলেন। সুতরাং কাহিনীটি নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্য সমাজের আধিপত্যের পূর্বেকার।

কিন্তু এসব ছাপিয়ে যে প্রশ্নটি মনে জাগে তা'হল কাহিনীকার বা গীতিকার এখানে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রেম চিত্রটি অঙ্কন করলেন কেন ? তা'হলে কি এটি আর্য সমাজেরও আগেকার কাহিনী পরে আর্য সমাজ তথা হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে এসে নায়িকার মনে অপরাধ বোধ জাগ্রত করে আত্মাহুতি দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটান হয়েছে ?

প্রাচীন মিশরে সহোদরা ভ্রাতা ভগ্নীর বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু ভারতীয় সমাজে এরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় কিনা গবেষণার বিষয়। সুতরাং মনে করা সঙ্গত-মূল কাহিনীটি আর্যপূর্ব যুগের অর্থাৎ আদিম সামাজিক যুগের, পরে এটি আর্য সমাজের ভিতর এবং আরও পরে হিন্দু সমাজের ভিতর প্রবেশ লাভ করার পরে কিছু শোধন হয়েছে। এ কাহিনীটি যেন সেই আদিম সমাজ ব্যবস্থারই প্রতিবাদ স্বরূপ। গল্পের climaxও এইখানেই।

মূল কাহিনী যাই হোক না কেন, আমরা হারাণ বৈরাগীর মারফৎ নিবারণ দাস করের রচিত বা বর্ণিত যে কাহিনীটি পেয়েছি সেটি কাহিনী হিসেবে সত্যই অপূর্ব। বাংলা লোক-গীত-কথার সংগ্রহের ভাণ্ডারের অন্যতম রত্ন বল্‌লে ভুল হবেনা।

কাহিনীর কথা বাদ দিলেও এর রচনা শৈলী এবং উপমা এবং রূপকল্পও কম প্রশংসার দাবী রাখেনা।

উদাহরণ স্বরূপ বেদেনী বেশী সোহাগীকে দেখে সুজনের মনের ভাব অতি সাধারণ কথায় কীভাবে প্রকাশ করেছেন লোক কবি :—

"(অগো) মন সাগরে উঠ্যাছে তুফান সহনও না যায়,
ঝম্প দিয়া পড়বে কেডা উদ্দিসও না পায়।"

কিংবা :—"(অগো) অন্তরে বিন্ধ্যাছে দারুণ বাণ,
যদি কাষ্ঠের কয়লা গো অইতো,
জ্বইল্যা পুইড়্যা নিভা যাইতো,
যাইতো আমার মনের আগুন দূর।"

এ-ছাড়া সোহাগীর রূপ বর্ণনায় কবি বলছেন :—

"ইয়ার মইধ্যে ষোড়শী যোবতী কইন্যা কণক চম্পা ফুল,
মাজা বাইয়্যা পড়ে কইন্যার—ম্যাঘ বরণ চুল।
আউলাইয়্যা সেইনা ক্যাশ গো
কন্যা চোউখ ঠাউরিয়া চায়,
সাপিনীর ফণি য্যান হৃদয়ে দংশায়।

ভাল নজর কইর‍্যা সুজন ছাখে, কুন্দকলির শোভা,
সোহাগিনীর মুখের হাসি মণির মনোলোভা।
(অগো) কাঁচির আগা য্যামুন ব্যাঁকা যেমুন তার ধার,
নয়ন কোণে ছাখলে পরে রক্ষা নাই যে আর।
পরাণ কাড়ে, পরাণ ফাঁড়ে না ছাখে উপায়,
সগ্‌গল ফ্যালাইয়া বুঝি ঝম্প ছায় তার গায়।
(অগো) পিছল পদ্মের পাতা জল উছলি যায়,
পরম সুন্দরী কইন্যা নয়ন জুড়ায়।
(অগো) শুক্ল পক্ষের চন্দ্রকলা যেমুন পড়ে দ্বাদশীতে,
তেমনি যোবতী কইন্যার রূপেতে ছাশ ফাটে।"

এই ধরণের উপমা বা রূপকল্প কাব্যের ভিতর আরও অনেক রয়েছে। এইবার বিচার্য বিষয় এটিকে লোক-গীত-কথা আখ্যা দিতে কোন বাধা আছে কিনা? Ballad বা লোক-গীত-কথার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে নারী চরিত্র প্রধান কিনা সে বিষয়ে দেখা দরকার। এই কাহিনী বা গীতিকাটি যে নারী চরিত্র প্রধান এ বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই। বলাই বাহুল্য সোহাগীর আবির্ভাবে সুজনের চরিত্র অনেকাংশেই নিষ্প্রভ।

লোক গীত কথার অন্যতম লক্ষণ হ'ল নায়িকার সম্বৎসরের দুঃখ বর্ণনা বা বারমাস্যা। সে দিক থেকেও বাতাসীর বারমাস্যাটি লোক-সাহিত্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন।

এক কথায় বলা যায় "সোহাগী বাইদ্যানী" লোক-গীত-কথাটি বাংলার 'লোক-গীত-কথা'র ভাণ্ডারে একটি নবতম সংযোজন। গীতিকাটি "লেখা ও রেখা" পত্রিকার ১৩৭৭ বঃ অঃ বৈশাখ—আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

।। সাকিনা বিবি ।।

কাহিনী

হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হাসান এবং হোসেন। বড় ভাই হাসান জয়নাব নামে এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করলেন। কিন্তু তার অধস্তন এক কর্মচারীর পুত্র এজিদ এই জয়নাবের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। এজিদের দিবারাত্রি চেষ্টা চলতে থাকে কীভাবে জয়নাবকে লাভ করা যায়। একদিন কৌশলে হাসানের পানীয়তে সে বিষ মিশিয়ে দেওয়ালো—যার ফলে ইমাম হাসানের মৃত্যু ঘটল। হোসেন দেখল মহা অনুপায়। সে মদিনা পরিত্যাগ করে পরিবার বর্গ নিয়ে যাত্রা করল কুফারী শহরের দিকে।

হাসান মৃত্যু কালে ভাই হোসেনকে বলে গেল, তার মৃত্যুর পর তার পুত্র কাশেমের সঙ্গে যেন হোসেনের কন্যা সাকিনার বিবাহ দেওয়া হয়।

হোসেন দাদার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবার বর্গ নিয়ে যাত্রা করল বিদেশের পথে। পথিমধ্যে পড়ে কারবালা মরু প্রান্তর।

এদিকে পিছন পিছন ছুটে আসছে এজিদের সৈন্য সামন্ত। তারা এসে ঘিরে ধরেছে হোসেনের লোকজন, সৈন্য সামন্তকে।

মরুভূমির মাঝে পানীয় জলের একমাত্র ব্যবস্থা ফুরাৎ নদী। কিন্তু সে নদীর জল পাহাড়া দিচ্ছে এজিদের সৈন্য সামন্তরা। একেত' গ্রীষ্মের দিন তাতে পিপাসায় কাতর সকলেই। জলের জন্য শিবিরে শিশু, বৃদ্ধ, নারীর কান্নার রোল উঠেছে। ওদিকে এই খবর মদিনায় পৌছতে সেখানকার সকলে গর্জে উঠল। তরবারি নিয়ে তারা এগিয়ে এলো হোসেনের সাহায্যার্থে।

লড়াই চলতে লাগল দু'পক্ষে। তুমুল লড়াই। এরই মাঝে এক সময় হোসেন ডাক দিলেন ভাইপো (বড় ভাই হাসানের পুত্র)

কাশেমকে। স্মরণ করিয়ে দিলেন হাসানের মৃত্যুকালীন আদেশের কথা। হোসেন বললেন, তুমি এই মুহূর্তেই আমার কন্যা সাকিনাকে বিবাহ কর।

কাশেম বীর। সে উত্তর দিল, এখন চলেছি শত্রু নিপাত করতে। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে আমি বিবাহ করব সাকিনাকে।

কিন্তু হোসেনের আদেশ, তুমি এই মুহূর্তে সাকিনার সঙ্গে বিবাহ কর্ম সমাধা করে খুশীমনে যুদ্ধ যাত্রা কর।

কাশেম পিতৃ আজ্ঞা স্মরণ করে, সেই মহা সংকটময় মুহূর্তেই সুন্দরী সাকিনাকে বিবাহ করল, আর ঠিক সেই সময়েই বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা। বিবাহের বাসরে কাটানো আর তার ভাগ্যে ঘটে উঠলো না। নবলব্ধ প্রিয়তমা পত্নীর মুখ চুম্বন করে তলোয়ার হাতে এগিয়ে চলল রণক্ষেত্রের দিকে। কিন্তু অতি অল্পক্ষণ পরেই কাশেমের ঘোড়া ফিরে এলো একাকীই। কান্নার রোল পড়ে গেল তাঁবুর ভিতরে। সদ্য বিবাহিতা বিবি সাকিনা স্বামীর মৃতদেহ বুকে নিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

এপক্ষ প্রায় বীর শূণ্য। এইবার যুদ্ধে যাত্রা করলেন স্বয়ং হোসেন। হোসেন অতুল বিক্রমে লড়াই করে চললেন। অসংখ্য শত্রুও নিপাত করলেন। এজিদের সৈন্যরা সাময়িক ভাবে ফুরাৎ নদীর অপর পাড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। তৃষ্ণার্ত হোসেন এইবার নদীতে নেমে জল পান করতে গেলেন। কিন্তু তক্ষুনি তার মনে পড়ল, এই জলের জন্যই তার আত্মীয় পরিজনেরা প্রাণ ত্যাগ করেছে। চোখের সুমুখে যেন তাদের মুখগুলি দেখা দিতে লাগল। হোসেন দু'হাতে আঁজলা ভরা জল নিয়ে তাদের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন। মনের আক্ষেপে হাতের জল ফেলে দিয়ে নদী ছেড়ে পাড়ে এসে উঠলেন।

একে তৃষ্ণার্ত তায় পরিশ্রান্ত। বেশী দূর আর তার চলবার শক্তিও নেই। ফুরাৎ নদীর কূলের বালুকারাশির উপরেই আছড়ে পড়ে গেলেন। আর এই সুযোগে এজিদের সিপাইরা যারা দূরে দাঁড়িয়ে

ছিল তারা এগিয়ে এসে ঘিরে ধরল হোসেনকে। নির্দয় ভাবে সকলে মিলে একত্রে আক্রমণ করল মুমূর্ষু ইমামকে।

আর বেশীক্ষণ যুঝবার শক্তি রইলো না হোসেনের। নির্দয় দুশমনের দল অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল তাকে।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে বনের পশু-পাখি, আকাশ, জমিন সব বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল। নদীর প্রবাহও বুঝি বিপরীত দিকে বইতে শুরু করল।

শোকে, দুঃখে সবাই প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠ্‌ল। আর ঠিক সেই সময়ে হোসেনের বন্ধু রাজা হানিফা খবর শুনে ভীম বেগে এগিয়ে এলো সেই ঘটনাস্থলে।

বীর বিক্রমে শত্রু সেনা সংহার করে চল্‌ল রাজা হানিফা। যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করল এজিদকে।

আবার শান্তি ফিরে এলো মদিনা শহরে।

।। কাব্য ।।

(এক)

আমি বন্দন করি ফাতেমার চরণ হে
ফাতেমার চরণ।
আমি পরথমে বন্দনা করি পূবের ভানুশর
একদিগে উদয়গো ভানুর চৌদিগে পাশর (১)
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাস শিখর,
যেখানে খেলাইতো আলী মালাম্মের পাথর।
পচ্চিমে বন্দনা করি সব্বতীর্থ স্থান,
যে দিগে জানায়গো সেলাম হিন্দু মুসলমান।

(১) প্রকাশ।

আমি দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর,
যেখানে বানিজ্য যাইতো চান্দ সদাগর।
চৌকোনা পিরথিমী বানালাম মন করিলাম থির,
সুন্দরবন সহিত বানালাম গাজী জিন্দাপীর।
আমি অধমে ডাকি করিয়া স্মরণ
মাগো দেহ দরিশন (২)।
ফাতেমা তোর নাম করিয়া পার হব অকূল দরিয়া,
রাঙা চরণ দুটি করিয়া বন্দন মাগো দেহ দরিশন।
শুনগো ফাতেমা মাতা
পশুপক্ষি তরুলতা
শুনিয়া কারবালার কথা
করিছে রোদন
মাগো দেহ দরিশন।
নীল দরিয়া হৈল উতালা
কান্দিয়া উড়ে নদীনালা,
কারবালায় দাড়াইঞা কান্দে
পন্থেরি (৩) পবন
মাগো দেহ দরিশন।
দেহ দরিশন, আমি অধমে ডাকি
করিয়া স্মরণ মাগো
দেহ দরিশন।
হায়, হায়রে হাছান হইলো উদাসী
ই-উদাসী হইলো হাছান
জয়নাবের লাগিয়া গো
হায়, হায়, হায়রে হাছান হইলো উদাসী।

(২) দর্শন = দেখা (৩) পথ

পাগল হইলো হাছান মেঞা জয়নাবের লাগিয়া,
সেইনা বিবি তার ঘরে কে দিবো আনিয়া।
যে আনিতো পারে বিবি জাগির করবো দান,
ফরাশে বস্থন (৪) দিয়া বাড়াইবে মান।
ধন দিবে, মান দিবে, দিবে হাত্বী ঘোড়া,
ঢাল তলুয়ার দিবে, দিবে জামা জোড়া।
(হারে) স্থদিনে পালিল পখ্খি দুগ্ধ কলা দিয়া,
কুদিনে পালাইলো পখ্খি পিঞ্জিরা (৫) কাটিযা।
হাছানের লুডি (৬) খাইয়্যা এজিদ করিল হারামী
দুনিয়াতে আর শুনি নাই এতেক নাদানী (৭)।
বাপে বেটায় নকরী কইর‍্যা হেথায় মানুষ হইল,
কালসাপ হইয়্যা আজি বুকেতে দংশিল (গো)।
(বুকেতে দংশিল)॥

(দুই)

এজিদ নামে রাজা থাকে দামেস্ক শহরে,
সেই তো নাকি বিয়া করতে চাহে জয়নাবেরে!
বান্দীর বাচ্ছা বাদসা হইলো দামেস্ক দেশেতে,
কোন্ সাহসে হুকুম জারী করে মদিনাতে।
পয়জার (৮) মারিয়া তারে দিমু উডাইয়্যা (৯),
দামেস্ক সহর দিমু আগুনে পোড়াইয়্যা (গো)।
গালাগালি শুইন্যা এজিদ কোন্ কাম (১০) বা করিল,
হাছানেরে গোপনে বিষ খিলাইয়্যা (১১) দিল।
বিষের জ্বলনে পঞ্জর (১২) উঠিল জ্বলিয়া,
কৈরে হোছেন বইল্যা উঠিলো কান্দিয়া।

---

(৪) বসিবার আসন (৫) খাঁচা (৬) রুটি অন্ন (৭) অন্যায় কথা বেইমানীর কথা, (৮) জুতা (৯) শেষ-খতম করিয়া দেওয়া (১০) কর্ম (১১) খাওয়াইয়া দেওয়া। (১২) পাঁজরা-বুক।

সহিতে না পারি আমি বিষের জ্বলন,
এই বুঝি আছিল আমার কপালের লিখন (রে)।
শোন্‌রে হোছেন হায়,
কলিজা পুড়িয়া গ্যাল বিষের জ্বালায়,
বিষ বুঝি দিয়াছে হারে গোলাম (১৩) এজিদায়।
কাল বিষ খিলাইছে মোরে আর নিস্তার নাই,
মরণ কালে একখান কথা তোরে কইয়্যা যামু ভাই।
আমার বেটা কাসেম আলী তোর ভাইস্তা হয়,
তার লগে তোর বিটি সাকিনার সাদী যেন হয়।
কাসেম আমার যুয়ান মর্দ, ভয় ডর নাই,
সাকিনা বিটি যে তোর তুলনা হের নাই।
ত্বইজনাতে একস্ত্রেতে খেলাইছে কতনা খেলা,
সারা জীবন করুক খেলা কইয়্যা গ্যালাম শ্যাষ বেলা।
বিষে শরীল জ্বইল্যা মইলাগ সোমায় আর নাই।
এজিদা বান্দীর বাচ্ছারে প্রতিশোধ দেওয়া চাই।
এই পর্যন্ত কইয়্যা হাচান চক্ষু উল্টাইলো,
ভাই, ভাই কইর‍্যা হোছেন কান্দিতে লাগিল।
হায় হায়রে মদিনা শহর জুইড়্যা
তহন মাতম (১৪) পড়িল,
নারীর লালচে (১৫) হাছান পরাণ হারাইলো।
(হারে) নারী হাসি, নারী ফাঁসী, নারী মহাপাপ,
নারী খুশি, নারী ত্বষি, নারী অভিশাপ।
থুম থুমাইয়্যা হাটেগো নারী চৌখ পাকাইয়্যা চায়,
সেই না রাক্ষুসী নারী খসম (১৬) আগে খায়।
উচ্‌কপালী চিরল দাঁতী পিঙ্গলা মাথার ক্যাশ,
সেই নারী করলে বিয়া ত্বঃখের হয়না শ্যাষ।

(১৩) চাকর দাস (১৪) শোকের ছায়া (১৫) লালসায় (১৬) স্বামী

(হারে) সতী নারীর পতি যেমুন মজিদেরি চূড়া,
অসইত্যা নারীর পতি তেমুন ভাঙ্গা
নায়ের গুড়া।
এক জাইত্যা নারী হায়রে পাড়ায় পাড়ায় যায়,
এর কথা তারে কইয়্যা গুয়া (১৭) তাম্বুল (১৮) খায়।
নবীজির ১৯ কব্বরখানি করিয়া বন্দন,
রাত্রিকালে যাত্রা করে ফাতেমার নন্দন।
ভাই হারা হইয়্যা হোছেন দুঃখিত অন্তরে,
মদিনা ছাড়িয়া চল্‌লো কুফারি শহরে।
ফুরাৎ নদীর কূলে যবে আসিয়া পৌছিল,
এজিদ রাজার ফৌজ তারে ঘিরিয়া লইলো।
এই খবর পৌছে গিয়া মদিনা শহর,
গর্জ্জিয়া উঠিলো সবে বান্দিয়া কোমর
চল্‌ চল্‌ চলরে সবাই দামেস্কেতে যাবো,
এজিদ রাজার শক্তি কত লজরে দেখিব,
তলুয়ার২০ মারিয়া তারে ফুরাতে ভাসাব।
ঢোল বাজে, ভেরী বাজে, বাজে জয়ঢাক,
হাতী, ঘোড়া, সিপাই ফৌজে সাজে লাখে লাখ।
নিশান উড়ে ডঙ্কা বাজে রনথলির২১ মাঝে,
রণে যাবি কে কে তোরা রণের সাজন সাজগে।

(হায়রে) বাঘা লড়াই লাইগ্যা গ্যাল ফুরাৎ নদীর পাড়ে,
ধূলার ধূয়া উঠলো গিয়া আসমান মাঝারে।
লাউয়ের দরিয়া চলে ফুরাৎ নদীর কূলে,
হাতী২২ নাচে, ঘোড়া নাচে দামামারই তালে।

(১৭) সুপারী (১৮) পান (১৯) হজরত মহম্মদ (২০) তলোয়ার
(২১) রণস্থল যুদ্ধ ক্ষেত্র (২২) রণ হস্তী

ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা মারে কেহ মারে লাফে লাফে,
ধমকে[২৩] কারবালা জমীন থর থরাইয়্যা কাঁপে।
কাটা মাথার গড়াগড়ি কারবালার ময়দানে,
হাহাকার শব্দ হৈল পানীর কারনে (গা)।
একেতো খড়াইন্যা[২৪] দিন গো তাতে ধূপের[২৫] জ্বালা,
ভয়ঙ্কর বাজনীর[২৬] ধূমে কানে লাগে তালা।
ফুরাৎ নদী বন্ধ করল এজিদার সিপাই,
দিনে রাইতে তিন দিন অইলো খাবার পানি নাই।
পানির লাইগ্যা সবে করে হায় হায়,
কলিজা শুকাইয়্যা গ্যল জীবন রাখা দায়।

(তিন)

হায়, হায়রে কাশেম রণে যায়,
হায়রে কারবালায়,
রণের সাজে বিয়া করে বিবি সাকিনায়।
হায় হায়রে সাকিনা বিবির কথা কে কহিতে পারে,
বেহেস্তের হুরী বুঝি দেইখ্যা লাজে মরে।
সোনার বন্ন বিবি সাকিনার কপালে জ্বলে তারা,
রাঙা বরণ ওষ্ঠ দেইখ্যা ঘুইর‍্যা মরে ভোমরা।
যেমুন হোছেন তেমুন সাকিনা বাপের যুইগ্যা বেটি,
এজিদের দুশমনির কথায় জ্বইল্যা উঠলো খাঁটি।
শিশুকালে কতনা খেলা খেলাইছে দুইজনে,
আইজ নিশিথে অইবে বিয়া বীর কাশেমের সনে।
এইনা কথা শুইন্যা সাকিনার হরিষ অন্তর,
র‍্যাশমী ব্যাশে সাইজ্জ্যা গোনে তিন পহর।

(২৩) যোদ্ধ বৃন্দের আস্ফালন (২৪) গ্রীষ্মের দিনে (২৫) রৌদ্রের
(২৬) যুদ্ধের বাজনা

(হারে) এদিগেতে পানি বিনা নারী শিশু ভুগ্যা ভুগ্যা মরে,
কাশেম ক্যামুনে দেখিয়া ইহা থাকিবো শিবিরে।
রনের সাজে সজ্জ হইল কাশেম জুয়ান,
হোছেন ডাইক্যা তারে করে কন্যা সম্প্রদান।
কাশেম বলে আব্বাজান চইল্যাছি সমরে,
অবশ্য করিব বিয়া ফিরিয়া আসিলে।
হোছেন কয় বীর হাছানের শেষ ইচ্ছা ছিল,
তার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা সাকিনারে তুমি সাদী কর।
পিতার মনোবঞ্ছা পূর্ণ কইর্যা রণে তুমি যাও,
এজিদে বধিয়া তুমি দীর্ঘজীবি হও।
এইনা কথা শুন্যারে কাশেম তহন
সাদী করে বিবি সাকিনায়,
দরজায় দুন্দুভি বাজে সোমায়ত আর নাই।
সাজে কাশেম সাজে ডঙ্কা ঢোলক বাজে,
কান্দাকাটির রোল পইর্যাছে তাম্বুর মাঝারে।
(হারে) কান্দে সাকিনা খসম তুমি রণে যাইওনা,
তুমি খসম রণে গ্যালে আমি বাঁচবোনা।
যুদ্ধে যদি যাইবা তুমি মনে ছিল আশা,
কান্দাইয়্যা আমারে ক্যান করলা সর্বনাশা।
কাশেম বলে, শোন প্রিয়া বিধির লেখা
খণ্ডান না যায়,
বিয়ার রাইতে স্ত্রী রাইখ্যা কেউকি যুদ্ধে যায়।
কাইন্দোনা, কাইন্দোনা প্রিয়া না কান্দিও আর,
হাসি মুখে বিদায় ছাও, আসিব আবার।
এই কথা না কইয়্যা কাশেম
আলিঙ্গন জানায় বিবি সাকিনায়,
সোহাগে সাকিনা বিবি তারে চুম্বন জানায়।

(হারে) একদণ্ড হইলো গত কিছু না হয় দেরী,
ময়দানে বাজিয়া ওঠে লড়াইয়ের ভেড়ী।

(চার)

বেলা দিপ্পহর শুধু বালুচর
ধূপেতে কলিজা ফাটে পিয়াসে কাতর।
আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই
আল্লা ম্যাঘ দে।
আসমান অইলো টুডা টুডা[২৭]
জমিন অইলো ফাড়া[২৮]
ম্যাঘরাজা ঘুমাইয়্যা রইছে পানী দিব তোরে কেডা ?
আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে ছায়া দেরে তুই
আল্লা ম্যাঘ দে।
আলের[২৯] গরু বাইন্ধ্যা গিরজ[৩০] মরে কাইন্দ্যা,
ঘরের নারী কাইন্দ্যা মরে ডাইল খিচুরী রাইন্দ্যা।
আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই
আল্লা ম্যাঘ দে।
আমপাতা লড়ে চড়ে কাডল[৩১] পাতা ঝরে,
পানি, পানি কইর‍্যা বিলে পানী-কাউরী[৩২] মরে।
আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে ছায়া দেরে তুই
আল্লা ম্যাঘ দে।
ফাইট্যা ফাইট্যা রইছে কত খালা বিলা নদী,
পানির লাইগ্যা কাইন্দা মরে পঙ্খি জলধি।
কপোত কপোতী কান্দে খোপেতে বসিয়া,
শুক্‌না ফুলের কলি পড়ে ঝরিয়া ঝরিয়া।

(২৭) খণ্ডবিখণ্ড টুকরো টুকরো। (২৮) ফাটা চিড়খাওয়া
(২৯) হালের (৩০) গৃহস্থ (৩১) কাঁঠাল (৩২) এক প্রকারের পক্ষী

কান্দে সাকিনা দুয়ারে বসিয়া
হারে কে হরিল সোনার নিধি (গো)
বুকেতে বিন্ধ্যাছে যতি,(৩৪)
কালা ঘুমে ঢইল্যা পড়ছে (গো)।
ওঠ, ওঠ, ওঠ প্রিয়া কথা কইয়্যা জুড়াও হিয়া,
চক্ষু মেইল্যা ভ্যাখ অভাগীরে।
(হারে) সোনার বরন সাকিনা বিবি,
শোকে অইলো পাগলিনী,
মাটিতে পড়িয়া সতী, বিয়ার সজ্জ গ্যাল রসাতলে।
বলে, শুন ওগো প্রাণনাথ, করি আমি প্রাণত্যাগ,
আমিও খাইব জোহার বিষ।
পতির বিহনে সতী, কি-বা হবে আমার গতি,
পতি বিনা সতীর গতি নাই।
কান্দিয়া কান্দিয়া সতী, ভূমেতে পড়িল লুটি,
হইলো আন্ধার তামাম দশদিক।
এদিকে কদবানু কান্দি কয়, পরাণে আর কতবা সয়,
একে একে সবইত' বিদায়।
শুন হোছেন বলি তোরে, তুমি রণে গ্যালে পরে,
আমাগেরে(৩৫) কী হবে উপায়।
আমি রাড়ি (৩৬), ঝি রাড়ি, একই ঘরে তিন রাড়ি,
খালি হৈল সোনার মদিনা।
মানা হোছেন না মানিল, রণেতে চলিয়া গ্যাল,
সইতে নারে কেহ এ যাতনা।
নিশান উড়ে বাজনা বাজে, লক্ষ লক্ষ সিপাই সাজে,
ফুরাৎ কুলে লাগিল লড়াই।

(৩৪) একপ্রকারের অস্ত্র (৩৫) আমাদের (৩৬) বিধবা

হোছেন তলুয়ার মারে, হাজারে হাজারে মরে,
ভাগে যত দুশমন সিপাই।
ফুরাতে নামিয়া শাহা, পানি হাতে লইল আহা,
চাহে পানি মুখে তুলিবারে।
তখনি পড়িল মনে, সব মরিল পানি বিনে
কান্দে হোছেন হৈয়া জারে জারে (৩৭)।
কান্দে হোছেন পানি হাতে হায়, কামনে খাইব পানি,
সবারে হারাইয়া গো, কান্দে হোছেন পানি হাতে হায়।
ভাই বেরাদর (৩৮) সব মরিল পানির লাগিয়া,
একেলা খাইবো পানি ক্যামন করিয়া (গো)।
(কান্দে হোছেন পানি হাতে লইয়্যা।)
এই বইল্যা হাতের পানি জমিনে ফ্যালাইয়্যা,
ডাঙ্গাতে উঠিল আসিয়া, পিপাসায় অবসান্ত হোছেন,
পড়িল লুটাইয়্যা (গো)।
(ওগো) এজিদার সিপাই সেনা নিকটে আছিল,
পঙ্গপালের মত আইস্যা ঘিরিয়া লইলো (গো)।
কেহবা খঞ্জর মারে, তীর মারিছে কেহ,
জরা জরা কইর‍্যা দিল ঐনা সোনার দেহ (গো)।
কারবালার ময়দান খানি কাঁপিয়া উঠিল,
তরুলতা পশু-পঙ্খি কান্দিতে লাগিল (গো)।
আসমানেতে মা ফাতেমা জুড়িল কান্দন,
তাহারি কান্দনে কান্দে পন্থোর পবন (গো)।
(হারে) জন্মের মত গ্যাল হোছেন বিদায় লইয়্যা,
শোকে কালা হইয়্যা গ্যাল তামাম দুনিয়া।
পাহাড় পব্বত কান্দে জমিন আসমান,
দুঃখে নীল দরিয়ার পানি বহিল উজান (গো)।

(৩৭) জর্জরিত (৩৮) আত্মীয় পরিজন

(হারে) হোছেনের মরণ খবর হানিফা পাইলো,
পরতিশোধ লইতে বুঝি কমর বাইন্ধ্যা আইলো (গো)।
(হারে) হানিফ আইলো রাইত পোহাইলো
শোনরে সলোমান,
ফয়জরে(৩৯) উঠিয়া দেখি লাউয়েরই নিশান।
গোল(৪০) করিসনা ওরে তোরা পলাইবো বেইমান,
হানিফ আইলো রাইত পোয়াইলো শোনরে সলোমান।
রণস্থলে গ্যাল হানিফ অস্ত্র হাতে লইয়্যা,
হাজারে হাজারে সেনা চলিল কাটিয়া।
নিমিষে কারবালার ভূমি করিল ময়দান,
আসমানে উড়াইয়্যা দিল জয়েরই নিশান।
(হারে) হানিফ-রাজার জয় হইল এজিদা পালায়,
লম্ফঝম্প দিয়া নাচে তিন শয়তানের মায়।
বাজে জয়ের বাজনা বাজে কারবালা ময়দানে,
সাকিনার দুঃক্ষেতে কান্দে তামাম(৪১) মুনিষ্যে।
আসলাম আলেকুম।

॥ আলোচনা ॥

এই গীতিকাটি মূলতঃ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। মুসলমান ধর্মগুরু হজরত মহম্মদের দুই নাতিকে নিয়ে এই ইতিহাস। বড়ভাই হাসানের পুত্র কাশেমের সঙ্গে ছোট ভাই হোসেনের কন্যা সাকিনার বিবাহ হয়। বিয়ের দিনই যুদ্ধে গিয়ে কাসেম প্রাণ হারায়। তখন সদ্য বিবাহিতা সাকিনা পতির জন্য যে বিলাপ করেছিলেন এ গীতিকার মূল বিষয়বস্তু সেইখানেই নিবদ্ধ। যদিও আগাগোড়া কাহিনীর ভিতর সাকিনার উপস্থিতি খুবই নগণ্য, তা হলেও এই গীতিকাব্যের মারফৎ

(৩৯) সকালে (৪০) চেঁচামেচি—গণ্ডগোল, (৪১) সকলে।

যেটুকু তা'র পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতেই তা'র তেজস্বিনী মূর্তিটি আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

কাশেম তরুণ যুবা। বীরের পুত্র বীর 'পানি বিনা নারী শিশু ভুগ্যা ভুগ্যা মরে / ক্যামনে দেখিয়া ইহা থাকিবো শিবিরে' বলে প্রস্তুত হচ্ছিল যুদ্ধে যাবার জন্যে, তখনিই খুল্লতাতের (হোসেন) আদেশ এল, এই মুহূর্তেই সাকিনাকে বিবাহ করবার।

সকলেই জানে, এ রণ মরণ-মরণ। বেঁচে ফিরে আসার আশা খুবই কম। তক্ষুনি পিতৃ আদেশ স্মরণ করে কাশেম বিবাহ করে সুন্দরী সাকিনাকে। সাকিনাও এ যুদ্ধের পরিণাম জানে। তথাপি উপযুক্ত বাপের উপযুক্ত বেটির মতই সানন্দে সম্মতি জানায় এ বিবাহের।

কাশেম যুদ্ধে গেল, জীবিত অবস্থায় আর ফিরে এলোনা। এলো তার মৃত দেহ। মৃতদেহ দেখে সাকিনার সে মর্মস্পর্শী কান্নায় গাছের পাতা ঝরে যায়, বনের পশু পক্ষীও স্তব্ধ হয়ে থাকে।

সাকিনা স্থির চিত্তে মেনে নিল ভবিতব্যের লিখন। প্রথমে অবশ্য অন্যান্য সাধারণ নারীদের মতই প্রথমে স্বামীকে নিষেধ করেছিল যুদ্ধে যেতে। কিন্তু পরে দেশের কথা, প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে হাসিমুখেই বিদায় দিয়েছিল তার সদ্য বিবাহিত স্বামীকে এবং পরে যখন ফিরে পেল তার স্বামীর মৃতদেহ, তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এইটাইত একান্ত স্বাভাবিক।

লোক-কবি সাকিনার চরিত্রে অস্বাভাবিক কিছু না ফুটিয়েও যে ভাবে তার ছবিটি নিখুঁত ভাবে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেছে তা' একান্তই প্রশংসার দাবী রাখে। এর অতিরিক্ত কিছু হলেই বোধ হয় অস্বাভাবিক হয়ে উঠত। সাকিনার চরিত্র চিত্রণে লোক কবি এখানে সম্পূর্ণ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছে। এর সঙ্গে মহাভারতের উত্তরা-অভিমন্যুর উপাখ্যানটির তুলনা করা চলে। তবে আমাদের বিবেচনায় মহাভারতের ঐ কাহিনী অপেক্ষা কাশেম-সাকিনার কাহিনী আরও

হৃদয়গ্রাহী। কারণ, উত্তরা- অভিমন্যুও নব দম্পতি হলেও তারা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হলেও বিবাহিত জীবন যাপন করেছে, কিন্তু কাশেম শুধু মাত্র বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠানটুকুই সম্পন্ন করতে পেরেছিল. সাকিনার 'সুখের বাসর' জাগা আর হোলনা। নারী জীবনের এতবড় অভিশাপ বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার কথা জগতের আর কোনও সাহিত্যে আছে কিনা জানিনা। আর সে কারণেই সাকিনার ছবিটি চিরদিনই পাঠক হৃদয় জুড়ে থাকবে। মহরমের সমস্ত ঘটনার মধ্যে অনেক কথাই হয়ত লোকের মনে ঝাপসা হয়ে আসবে, কিন্তু সাকিনার স্মৃতি এবং সদ্য প্রয়াত পতির উদ্দেশ্য রচিত তার বিলাপ গাথা কোন দিনই লোকে ভুলবেনা।

তাই মহরম পরব এখানে একান্তই গৌণ হয়ে পড়েছে—বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে কাশেম-সাকিনার প্রেম-বিরহ ও নিয়তির বিধান। এ সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ করে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান। জনপ্রিয়তার দিক থেকে সেগুলিরও মূল্য নেহাৎ কম নয়। এই কাশেম-সাকিনার কাহিনী নিয়ে একাধারে যেমনি সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ছোট, বড়-গান, জারি-গায়কদের পালাগান তেমনি কোন কোন অঞ্চলে গীতি-কথাও রচিত হয়েছে। বলা চলে, এইসব টুকরো টুকরো স্বয়ং সম্পূর্ণ গানের সূত্র থেকেই এই ধরণের গীতিকাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছে।

এই গীতিকাটি আমি সংগ্রহ করি ইউসুফ মীর্জা নামে জনৈক ফকিরের কাছ থেকে। সে অবশ্য এর রচিয়তা নয়। সেও এটি কণ্ঠস্থ করেছিল তার গাঁয়ের (ময়মনসিংহ—বাংলাদেশ) জনৈক জোলা মীনাজদ্দি সেখের কাছ থেকে। ১৩৭১ বঃ অঃ "চতুষ্কোণ" পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়।

।। ক্যাশবতী কইন্যা ।।

কাহিনী

মালঞ্চী রাজপুত্র শঙ্খনাথ একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে এসে জলের উপর দেখতে পেল একটি চাঁপার ফুল ভেসে যাচ্ছে। কৌতূহল বশতঃ ফুলটা হাতে তুলে নিতেই রাজপুত্র দেখতে পায়, তাতে জড়ানো রয়েছে সুদীর্ঘ একগাছি কোঁকড়ানো কেশ। রাজপুত্র হাতে গুনে দেখে এর দৈর্ঘ অন্ততঃ পাঁচ হাত।

কুমার চুলগাছা হাতে নিয়ে চিন্তা করতে থাকে,-যে রমণীর এত দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি হতে পারে সে না-জানি কেমনই সুন্দরী! যে -নারী এই কেশদামের অধিকারিনী সে যেই হোক না—সে যদি কুমারী হয় তা হলে তাকেই সে বিয়ে করবে, অন্য কারুকে নয়।

এই ভেবে রাজপুত্র রাজপুরীতে ফিরে এসে তক্ষুনি ঘোষণা করে, তার পরদিনই সে বাণিজ্য যাত্রা করবে।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল রাজপুরীর ভিতর। সাজানো হ'ল সপ্তডিঙ্গা মধুকর। ছয় নৌকোয় বোঝাই হ'ল বাণিজ্যের বেসাতি, আর সর্ববৃহৎ মধুকরে চললো রাজপুত্র শঙ্খনাথ বন্ধুবান্ধদের নিয়ে।

দেখতে দেখতে রাজপুত্রের নৌকোর বহর ছাড়িয়ে চলল সপ্ত সাগর। দুধ সাগর, ক্ষীর সাগর, লোহিত সাগর। কৃষ্ণ সাগর পার হয়ে কুমারের নৌকো ধরল লবণ সমুদ্রের পথ।

কিন্তু এই লবণ সমুদ্রে এসে কুমারের বাণিজ্য-বহর পড়ল এক বিষম ঝড়ের কোপে। দেখতে দেখতে ঝড় বৃষ্টির প্রকোপে তার সপ্ত-ডিঙ্গাই জলের তলায় তলিয়ে গেল।

কুমার সুমুখে তারই নৌকোর একটা ভাঙ্গা মাস্তুলকে অবলম্বন করে ভেসে চলে। ভাসতে ভাসতে কতদূর, কত পথ যে সে অতিক্রম করল তার কোন ঠিক ঠিকনাই নেই। হঠাৎ বহুদূরে গাছপালা ও

তীরের রেখা দেখে মনে আবার বাঁচার আশা জেগে ওঠে। মনে মনে গঙ্গাস্তব করে প্রার্থনা করে, যেন কিনারে গিয়ে পৌঁছে এ যাত্রা সে রক্ষা পায়।

এক সময় মেঘ কেটে যায়, বৃষ্টিও বন্ধ হয়। দূর হয় রাতের অন্ধকার। কুমারের ভাঙ্গা মাস্তুল এসে ঠেকে পাড়ের কিনারে।

জল থেকে পাড়ে উঠতেই কুমারের চোখে পড়ে, সে যেখানে এসে পৌঁছেছে সেটা একটা নদীরই ঘাট। 'সাহানবান্ধা'।

কুমার মনে মনে চিন্তা করে, যখন সান-বাঁধানো ঘাট রয়েছে, তখন কাছে পিঠে নিশ্চয়ই জন বসতিও আছে। আর জনবসতি থাকলে প্রাণ ধারণের ব্যবস্থাও একটা নিশ্চয়ই হবে।

কিন্তু অজানা অচেনা জায়গায় হঠাৎ করে এগুনোও ত' ঠিক নয়। একটু অপেক্ষা করে চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়েই অগ্রসর হওয়া উচিত—এই ভেবে নদীর ঘাটে যে বটগাছটা ছিল সে তারই একটা ঝাঁকড়া ডালের উপর বসে চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগল। হঠাৎ নজর পড়ল, অনেক দূর থেকে সেই ঘাটের দিকেই এগিয়ে আসছে একদল সুন্দরী যুবতী। তাদের প্রথমে রয়েছে অপূর্ব সুন্দরী এক নারী আর তাকে অনুগমন করছে শতেক সহচরী।

যুবতী দল এসে ঘাটলায় বসে শুরু করল সেই নারীকে গন্ধ তেল মাখাতে। তেল মাখানো শেষ হলে এইবার স্নানের পালা। সহচরীরা কেউবা তার গা ডলে দেয়, কেউবা সোনার ঝারিতে করে জল এনে তার মাথায় ঢালে।

ক্রমে ক্রমে সকলের স্নান সমাপন হলে এইবার তারা ফিরে যাবার জন্য তৈরী হয়। প্রথমে সেই পরমাসুন্দরী যুবতী তার মেঘের মত কালো কেশ খুলে দিয়ে দাঁড়ায়, আর চার সারিতে সখীরা তার কেশরাশি সযত্নে হাতে তুলে দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

গাছের উপর বসে বসে কুমার সবই লক্ষ্য করে। ভাবে, কে এই নারী?

যুবতী দল চোখের আড়াল হতেই কুমার গাছ থেকে নেমে নগরে ঢুকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হয়।

দিন যায়। মাস যায়। দেখতে দেখতে বছরও ঘুরে গেল। কুমার বহাল তবিয়তে ব্রাহ্মণের বাড়িতে বাস করে। অনেক দিন ওই বাড়িতে থাকার ফলে সে যেন ওই পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে সে সংগ্রহ করে, সে দেশের সব খবরাখবর।

রাজ্যের নাম রূপনগর। বড় ভাল লোক ছিলেন প্রয়াত মহারাজ। কিন্তু মৃত্যুকালে অপুত্রক থাকায় একমাত্র কন্যা রূপ কুমারীই দেশের রাজা বলে স্বীকৃত হল। সেই থেকে সেও পুরুষের মতই সর্ববিদ্যা বিশারদ হয়ে দক্ষতার সঙ্গেই রাজত্ব চালাতে থাকে। কিন্তু এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও মনের মত পাত্র না পাওয়ায় আজও পর্যন্ত তার বিয়ে হয়নি।

রাজকুমারী নাকি ঘোষণা করেছে, -যে ব্যক্তি তাঁকে পাশা খেলায় হারাতে পারবে তাঁকেই তিনি বরমাল্য প্রদান করবেন এবং তিনিই হবেন এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা। কিন্তু পাশা খেলায় পরাজিত ব্যক্তির কপালে থাকবে অনন্ত দুর্গতি—তাকে রাজকুমারীর অধীনে কৃতদাস রূপে বাস করতে হবে সারা জীবন।

একেত রাজকুমারীর অত রূপ, তার উপর এত বড় একটা রাজত্বের লোভে পড়ে দেশ বিদেশের বহু রাজপুত্রই আজ তার ক্রীতদাস রূপে তারই অধীনে বিভিন্ন ধরনের নিকৃষ্ট কাজে নিয়োজিত।

কুমার তাকে তাকে থাকে। একদিন রাজপুরীর বাগানের দক্ষিণ দিক দিয়ে যাবার সময় সাক্ষাৎ ঘটে সেই বাগানে কর্মরত একদল বন্দী রাজপুত্রের সঙ্গে। তাদের কাছ থেকে শোনে রূপকুমারীর শয়তানীর ইতিহাস।

পাশা খেলার জন্য যে কেউ গিয়ে হাজির হ'লে প্রথমে তাকে মহা সমাদরে জামাই আদরে চোব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় দিয়ে আপ্যায়ণ করা হয়। তারপর গভীর নিশিথে রাজকন্যার শয়ন মন্দিরে গিয়ে

শুরু করতে হয় পাশা খেলা। খেলা যখন বেশ জমে ওঠে রাজকন্যা হারবার পূর্ব মুহূর্তে তার পাশ থেকে ছেড়ে দেয় তার পোশা ইঁদুরকে। সে গিয়ে খুট্‌খাট্ করে প্রদীপটা দেয় উল্টে.ঘর যায়, অন্ধকার হয়ে। দাসী এসে আবার আলো জ্বেলে দিয়ে যায়। রাজ কুমারী এইটুকু সময়ের মধ্যেই পাশার ঘুঁটির ঘর বদল করে নেয়। বলা বাহুল্য আলো জ্বেলে পুনরায় খেলতে বসে খেলোয়ার রাজপুত্র তার কাছে পরাজিত হয় এবং পূর্ব শর্ত অনুযায়ী সেই সময় থেকেই সে রাজপুরীর অন্যতম কৃতদাস রূপে বহাল হয়।

কোন কোন রাজপুত্র হয়ত এই পরীক্ষাও পাশ করে যায়। কিন্তু তাতেও তার নিস্তার নেই। পাশা খেলা জিতবার পর তাকে বরের বেশে সাজাবার জন্য সখীরা তেল মাখিয়ে অন্তঃপুরের জোড়াদীঘির ঘাটে নিয়ে যায়। সেইখানেই হ'ল তার চরম এবং শেষ পরীক্ষা।

অন্দর মহলে অবিকল একই রকমের দু'টি পুকুর আছে। তার একটিতে থাকে এক যক্ষী, অপরটি ভাল জলে ভর্তি। ভুলক্রমে যক্ষীর পুকুরে নামলে ত' আর কথাই নেই, রাজপুত্রের বিবাহের সাধ সেখানেই মিটে যাবে।

কুমার বিভিন্ন বন্দী রাজপুত্রদের কাছ থেকে রাজকুমারীর পাশা খেলা এবং অন্যান্য শয়তানীর খবর জেনে নিয়ে মনে মনে নানা রকমের চিন্তা করতে করতে ব্রাহ্মণের বাড়িতে ফিরে আসে তার কাছ থেকে একটা বিড়ালকে চেয়ে নিয়ে মনের মত করে শিক্ষিত করে তোলে। তারপর, এক সুপ্রভাতে বিড়ালটিকে তার উত্তরীয়ের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে রাজপুরীর সিংহ দরজায় টাঙানো ডঙ্কায় এসে ঘা দেয়।

ডঙ্কায় ঘা দেবার সাথে সাথেই এক নারী প্রহরী এসে তার কুশল জিজ্ঞাসা করে। রাজপুত্রও নিজের পরিচয় দিয়ে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

নারী প্রহরী বার্তা নিয়ে চলে যায় এবং অবিলম্বে ফিরে এসে সমাদরের সঙ্গে তাকে রাজসভায় পৌঁছে দেয়।

রাজকন্যা বলে, আপনার আগমন বার্তা এবং অভিপ্রায় আমি শুনেছি। এখন বিশ্রাম মন্দিরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। রাত নিশিথে আমার সখীরা এসে আপনাকে আমার শয়ন মন্দিরে নিয়ে যাবে, সেখানে বসেই পাশা খেলা হবে।

রাজকুমারী পুনরায় নিজের কাজে মন দেয়, রাজকুমার সখী সঙ্গে চলে অন্দরমহলে।

বেলা দ্বিপ্রহর। রাজকুমার হঠাৎ চেয়ে দেখে, শতেক সখী এগিয়ে আসছে তারই কক্ষে। কারও হাতে বসার জন্য আসন, কারও হাতে জলের গেলাস ও ঝারি। পিছন পিছন সার বেঁধে একদল সখী নিয়ে আসছে অন্ন ও ব্যঞ্জনের থালা ও বাটি।

ভোজন পর্ব সমাধা করে দুগ্ধফেনিভ শয্যায় শয়ন করে কুমার আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। এত আদর যত্ন এর পরিণামে না জানি কী হয়! কে জানে তারও ভাগের লেখা অপরাপর রাজকুমার-দের মতই হবে কি-না।

দেখতে দেখতে দিবা অবসান। রাত্রির অন্ধকার ঘরে বসে বসে কুমার আকাশ পাতাল ভাবে। দিনে যেখানে এত সমাদর রাত্রে সেখানে কেউ একজন এসে একটু খোঁজও নিল না—এমনকি ঘরের প্রদীপ জ্বালাবারও কেউ নেই।

ভাবতে ভাবতে রাত বুঝিবা হবে দুই প্রহর। এমন সময় আঁধার ঘরে দেখা যায় ক্ষীণ আলোর রেখা। কুমার ভাল করে চেয়ে দেখে আঁধারের পর্দা ভেদ করে সেই ঘরে এগিয়ে আসছে তিন চার সখী—একজনের হাতে প্রদীপ। সে এসে বলে, এখন সময় হয়েছে, এবার চলুন অন্দরমহলে মহারাণীর শয়ন মন্দিরে পাশা খেলার জন্য।

সখীদের অনুসরণ করে কুমার গিয়ে পৌঁছয় রাজকন্যার শয়ন-মন্দিরে—যেখানে জরিদার স্বুবর্ণখচিত পাটির উপর পাশার ছক পেতে বসে রয়েছে রাজকন্যা রূপকুমারী তার অসামান্য রূপ নিয়ে।

শুরু হয় পাশা খেলা। চারিদিক নিশ্চুপ নিঃঝুম। শুধু মাঝে

মাঝে শোনা যায় পাশার দানের খট্‌খট্‌ শব্দ। দুপক্ষই সমান ওস্তাদ। দেখতে দেখতে রাত্রি দ্বিতীয় যাম অতিক্রান্ত হতে চলেছে, হঠাৎ এই সময় রাজকন্যার ঘুঁটি পড়ল এক বে-কায়দা জায়গায়। রাজকন্যা এইবার তার পোষা ইঁদুরকে হাত দিয়ে ঠেলে দেয় প্রদীপের দিকে। ইঁদুরও বরাবরের মত আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সেদিকে। রাজকুমারও ঠিক এই চরম মুহূর্তের জন্যই উদগ্রীব হয়ে বসেছিল। যখনই দেখলো ইঁদুর গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে প্রদীপের দিকে সেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তরীয়ের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল তার পোষা বিড়ালকে।

একদিকে ইঁদুর অপরদিকে বিড়াল। বিড়ালের উপস্থিতিতে ইঁদুর আর এক পাও এগুতে পারে না। একদিকে রাজকন্যা ইঁদুরকে প্রাণপণে ঠেলে দিতে থাকে অপরদিকে রাজপুত্রও বিড়ালকে লেলিয়ে দেয়।

ইঁদুর রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। প্রদীপ আর নেভে না। পরিষ্কার আলোয় রাজকন্যা তার জীবনে সর্বপ্রথম পাশা খেলায় হার স্বীকার করে নেয় রাজপুত্রের কাছে। ভোরের সাথে সাথে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে সহচরীরা। মঙ্গলাচার করে হাত ধরে তারা বাইরে নিয়ে চলে যায় রাজপুত্রকে।

হাত জোড় করে রাজকন্যা এগিয়ে এসে বলে,—কুমার পাশা খেলায় তুমি জয়ী হয়েছ ঠিকই, আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ নিশ্চিত। তবে, তার আগে আমার সখীরা তোমাকে স্নান করাবার জন্য পুকুর ঘাটে নিয়ে যাবে। স্নান করে উঠে নতুন কাপড় পরে, চন্দন তিলক কেটে তুমি অপেক্ষা করবে, রাত দুপুরে বরণ করে তোমাকে বিবাহ বাসরে নিয়ে যাবে। আশাকরি এতে তোমার কোনও আপত্তি নেই। তবে এর ভিতর একটা কথা আছে,—ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করবার সময় তোমার যদি কোন বিপত্তি ঘটে তাহলে কিন্তু আমার কোন অপরাধ নিও না। জেনো সেখানে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না।

রাজপুত্র, তথাস্তু বলে স্নান করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

স্নানের ঘাটে এসে কুমার সত্যিই অবাক হয়। পাশাপাশি অবিকল একই রকমের দু'টি পুষ্করিণী। কোন্‌টায় যে সে নামবে ঠিক করতে পারেনা। হঠাৎ মনে পড়ল, কাঞ্চী রাজপুত্র বলেছিল, যে পুষ্করিণীতে ঢিল মারলে ঠন্ করে শব্দ হবে, কদাচ সেটায় নামবে না, পক্ষান্তরে যে পুষ্করিণীতে ঢিল মারলে ঢপ্ করে শব্দ হবে জানবে সেইটেই নিরাপদ, তুমি সচ্ছন্দে সেখানে স্নান করতে পার।

কুমার ঘাটলায় বসে তেল মাখতে মাখতে দেখে পুকুরপাড়ে কয়েকটা ইটের টুকরো পড়ে রয়েছে। চট্ করে তার থেকে একটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে ছুঁড়ে দিল প্রথম পুষ্করিণীতে আর সঙ্গে সঙ্গে ঠন্ করে একটা শব্দ হতেই সে বুঝতে পারে এ পুকুরে নামা বিপজ্জনক। কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে দ্বিতীয় পুষ্করিণীতে নেমে স্নান সমাপন করে।

স্নান করে উপরে উঠতেই কুমার দেখে, রাজকন্যার শত সখী এগিয়ে আসছে তাকে বরণ করতে। কারও হাতে নতুন কাপড়, কারও হাতে ফুলের মালা, কেউ বা নিয়ে আসছে সব প্রসাধন সামগ্রী। আর সেই সঙ্গে বেজে উঠল বাজনা বাদ্যি।

দেখতে দেখতে দিন গেল। সন্ধ্যার লগ্নে শুভক্ষণে অগ্নি সাক্ষী করে রাজকন্যা রূপকুমারী পতিত্বে বরণ করল কুমার শঙ্খনাথে।

বিয়ের ক'দিন পর কুমার এইবার দেশে ফিরবার ইচ্ছা প্রকাশ করল রাজকুমারীর কাছে।

রূপকুমারী বলে, স্বামী, এখন থেকে এ রাজ্যের অধীশ্বরত' আর আমি নই, তোমার রাজ্য, তুমি যা ইচ্ছে কর তাই হ'বে।

কুমার বলে, দেখ রাজকুমারী, ধন দৌলত উপহার সামগ্রী যা নেবার তা ত' নেবই, এইসঙ্গে এখানে এতকাল ধরে যে-সব রাজপুত্র ক্রীতদাসরূপে রয়েছে তাদেরও মুক্তি দিতে চাই, আর তারা যদি আমাদের সঙ্গে তাদের নিজের নিজের দেশে ফিরতে চায় তা'হলে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

রাজকন্যা বলে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তবে এই সঙ্গে আমিও আমার পোষা শুক পাখীটা নিয়ে যাব।

রাজবাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল—কুমার শঙ্খনাথ কেশবতী রাজকন্যা রূপকুমারীকে নিয়ে সপ্তডিঙা মধুকরে ধনদৌলতে বোঝাই করে স্বদেশের দিকে যাত্রা করল।

দিন যায় রাত আসে। রাত যায় দিন আসে। সাগরের উপর দিয়ে শুভ্র রাজহংসের মত পাখা মেলে দিয়ে চলেছে শঙ্খনাথের সপ্তডিঙা মধুকর। ছয় নৌকায় ধনদৌলত বোঝাই, আর সর্ববৃহৎ নৌকায় বন্দী রাজপুত্রদের নিয়ে হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে পাশা খেলতে খেলতে ক্রমান্বয়ে পাঁচদিন অতিবাহিত হবার পর ষষ্ঠ দিনে পদার্পণ করে কুমার শঙ্খনাথ। সকলে হিসেব করে দেখে মাত্র আর একদিন বাকী, এর পরেই তারা পৌঁছে যাবে নিজ নিজ দেশে। বন্দী রাজপুত্রের দল কুমার শঙ্খনাথের সৌভাগ্যে জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। তারা নিজেদের ভিতর শলা পরামর্শ করে,—কীভাবে ওকে জব্দ করে রাজকন্যা ও ধনদৌলত হস্তগত করবে।

রাত গভীর। নৌকার প্রায় সকলেই ঘুমে ঢুলুঢুলু ভাবে বসে রয়েছে, পাশার দানও এলোমেলো ভাবে পড়ছে। আচমকা ছয়জনে মিলে কুমার কিছু বুঝবার আগেই তাকে ঠেলে ফেলে দিল সেই উত্তাল তরঙ্গশঙ্কুল সাগরের বুকে। এর পরেই নিজেদের ভিতর আলোচনা শুরু করে, কে-বা নেবে রাজকন্যাকে আর কে-কে নেবে ধন দৌলত।

রাজকন্যা দূর থেকে এদের এইসব অমানুষিক কাণ্ডকারখানা দেখে ত' একেবারে থ'। তক্ষুনি এদের অজান্তে এক পত্র লিখে নিজের পোষা শুকপাখীর পায়ে বেঁধে দিয়ে উড়িয়ে দিল লবণ রাজার উদ্দেশ্যে সাহায্যের আশায়।

সভা করে বসে রয়েছেন লবণ রাজা। দোর্দণ্ডপ্রতাপে তার বাঘে মোষে নাকি একই ঘাটে জল খায়—এই রকমই জনশ্রুতি। হঠাৎ সভামধ্যে একটা শুকপাখী উড়ে এসে বসল রাজার কোলের উপর।

মহারাজ পাখীর পায়ের দিকে তাকিয়েই দেখেন ওর পায়ের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একখণ্ড কাগজ।

মহারাজ তড়িৎগতিতে পাখীর পা থেকে লিখনটা খুলে নিয়ে পাঠ করে তক্ষুনি লোক পাঠিয়ে সপ্তডিঙা মধুকর সহ শঠ রাজপুত্রদের বন্দী করে নিয়ে এলেন তার দরবারে।

শঠ রাজপুত্ররা কিছুই না জানার ভান করে অবাক ভাবে প্রশ্ন করে, তাদের কেন বন্দী করা হয়েছে। একজন রাজপুত্র বলে ওঠে, দেখুন মহারাজ, আমি আমার নবপরিনীতা বধূ সহ ঘরে ফিরছিলাম সঙ্গে এরা সব আমার ইয়ার বন্ধু, কী দোষে আপনার লোকেরা গিয়ে আমাদের সব বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছে ?

কিন্তু তাদের কথাবার্তায় লবণ রাজার মনে সন্দেহ হল, আদেশ দিলেন এই রাজপুত্রের দল বন্দী অবস্থায় থাকবে তার কারাগারে আর রাজকন্যাকে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে। বললেন, পরদিন রাজসভায় এর বিচার হবে।

এদিকে রাজপুত্র শঙ্খনাথ জলে পড়েই তার জ্ঞান ফিরে পায়। বিদ্যুৎ গতিতে দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন খুলে নিয়ে পায়ের বাঁধনও খুলে ফেলে ভাসতে থাকে জলের উপর। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে বেশীক্ষণ আর যুঝতে পারে না। অবসন্ন হয়ে আসে তার দেহ। জলের উপর অজ্ঞান অবস্থায়ই ভেসে চলে কিছুক্ষণ।

এই সময় সেই দেশেরই এক জেলে রোজকার মতই নদীতে এসেছে মাছ ধরতে। হঠাৎ তার খেপলা জালে এসে ধরা পড়ল কুমারের অচৈতন্য দেহ। জেলে অবাক বিস্ময়ে তাকে নিয়ে চলল তার নিজের বাড়িতে একমাত্র কন্যা সোনালতার কাছে।

সোনালতা অবাক হয়ে দেখতে থাকে কুমারের রূপ। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীপ্র গতিতে শুরু করে দেয় তার পরিচর্যা।

সোনালতার সেবা শুশ্রূষায় কুমারও অল্প দিনের ভিতরেই সুস্থ হয়ে ওঠে।

এদিকে পরদিন লবণ রাজা বন্দী রাজপুত্রদের সবাইকে সভায় ডেকে নিয়ে এসে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কার কী বক্তব্য ?

সব রাজপুত্রই যে যার নিজ নিজ বক্তব্য রাখবার কালে দাবী করে, সেই রাজকন্যার স্বামী,বাদ বাকী সকলে তার বন্ধু-বান্ধব।

মহারাজ এইবার রাজকুমারীকে প্রশ্ন করেন এ বিষয়ে তার কী বক্তব্য ?

রাজকন্যা বলে, এদের কারও কথাই ঠিক নয়। এদের জিজ্ঞাসা করুন এরা আমার পূর্ব বৃত্তান্ত বলতে পারে কি না। একমাত্র যিনি আমার সত্যিকারের স্বামী, তিনিই আমার পূর্ব বৃত্তান্ত বলতে পারবেন।

রাজকন্যার কথায় লবণ রাজা বুঝলেন,—এই রাজপুত্রের দল এতক্ষণ তার সঙ্গে মিথ্যাচারই করে এসেছে—তাই তিনি আদেশ দিলেন—এই শঠ রাজপুত্রের দল থাকবে কারাগারে আর রাজকন্যা থাকবে রাজপুরীরই চিলে কোঠায়, দেখা যাক ইতিমধ্যে রাজকুমারীর প্রকৃত স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যায় কি-না।

দিন যায়, রাত হয়, দেখতে দেখতে মাসও কাবার হয়। রাজকন্যা একাকী সেই চিলে কোঠায় থাকে। আর দুঃখের দিনের সাথী সেই শুকপক্ষীর কাছে ব্যক্ত করে তার মনের ব্যথা। এইভাবে সাত পাঁচ ভেবে নিয়ে কুমার শঙ্খনাথের উদ্দেশ্যে এক চিঠি লিখে আবার শুক-পাখীর পায়ে বেঁধে তাকে আকাশে উড়িয়ে দিল।

কত দেশ, কত নগর, বন উপবন পার হয়ে গেল শুকপাখী তবু না দেখা পেল কুমার শঙ্খনাথের। এদিকে সোনালতার পরিচর্যার গুণে কুমার এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সোনালতা দিবা রাত্র রাজপুত্রের পাশে পাশে ছায়ার মত ঘিরে থাকে। তার কখন কি প্রয়োজন সে বিষয়ে সে সদাই তটস্থ। রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে যায় সোনালতার ভালবাসা দেখে। কিন্তু মুখে সেও কিছু প্রকাশ করে না। এতে সোনালতা

মনে মনে দুঃখিত হয়। ভাবে, সে হয়ত' কুমারের ঠিক মত পরিচর্যা করতে পারছে না। শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে বলে,— কুমার, কী তোমার মনোবেদনা আমার কাছে খুলে বল, আমার জীবন দিয়েও যদি সে কার্য উদ্ধার হয় তা' হলে আমি তাই করব।

কুমার বলে, সে অতি দুঃখের কথা কী আর বলব? কতকগুলি ঠগ জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েই আজ আমার এই দুর্দশা, সে করুণ কাহিনী নাই বা শুনলে।

রাজপুত্র আর সোনালতা যখন বসে বসে এইসব আলোচনা করছে ঠিক সেই সময়ে শুকপাখী এসে বসে সে বাড়ির উঠোনের ভিতরের একটা গাছের মাথায়। সোনালতা পাখীটাকে ধরতে গেলে সে চট্ করে উড়ে এসে বসে একেবারে কুমারের কোলের উপর।

কুমার পাখী দেখেই চিনতে পারে. এ তার রূপকুমারীর পোষা শুকপাখী। মুহূর্তে পাখীর পায়ের দিকে নজর পড়তেই দেখে, সেখানে বাঁধা রয়েছে একটি চিঠি। কুমার এক নিঃশ্বাসে চিঠি খানা পড়ে নিয়ে পাখীটাকে ছেড়ে দেয়।

সোনালতা বলে, কুমার এমন সুন্দর পাখীটাকে উড়িয়ে দিলে কেন?

কুমার তখন একে একে সব কাহিনী প্রকাশ করে সোনালতার কাছে।

সোনালতা বলে, কুমার, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি যেভাবেই পারি তোমার রূপকুমারীকে তোমার কাছে এনে দেব এখন একটু স্থির হও। এই বলে সোনালতা আর কুমার দু'জনে পরামর্শ করে নিয়ে জেলে ও জেলেনীর বেশ ধারণ করে একখানা ডিঙ্গি নৌকো করে যাত্রা করে লবণ রাজার দেশের উদ্দেশে।

রাজবাড়ির কাছে এসে সোনালতা এক মেছুনীর বেশ ধারণ করে মাথায় নিয়ে মাছের চুপড়ি রাজপুরীর অন্দরমহলের ভিতর ঢোকে।

মেছুনীকে দেখে রাজবাড়ির সব মেয়েরা তাকে ডেকে বলে, এই মেছুনী, তোর ঝুড়িতে কী মাছ আছে দেখা।

মেছুনী বেশী সোনালতা তখন এক গাল হেসে মাছের ঝুড়ি খুলে দেখাল। কিন্তু সেখানে মাছের পরিবর্তে রয়েছে কতকগুলি শঙ্খ!

মেছুনী হাঁক পড়তে থাকে, খুব ভাল ভাল মাছ আছে, নতুন ধরণের মাছ, নামে "শঙ্খনাথ" !!

মেছুনীর কথা শুনে মেয়ের দল সব হাসাহাসি শুরু করে দেয়। মেছুনী কিন্তু তখনও বেশ জোরের সঙ্গেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে চলেছে, —শঙ্খনাথ, শঙ্খনাথ—

মেছুনীর রকম সকম দেখে চিলে কোঠা থেকে এগিয়ে আসে রূপকুমারী। বলে, মেছুনী, তোর সত্য পরিচয় দে।

মেছুনীর কার্য হাসিল। বলে, আজ সন্ধ্যাকালে বাগানে এসো সব বলব।

সোনালতা সেইদিনই সন্ধের সময় রূপকুমারীর কাছ থেকে তার পূর্ব বৃত্তান্ত সব জেনে নিয়ে কুমারের কাছে গিয়ে নিবেদন করে।

পরদিন কুমার লবণ রাজার দরবারে গিয়ে হাজির হয়ে বলে, মহারাজ, আমি পারি রাজকুমারী কেশবতীর পূর্ব বৃত্তান্ত বলতে। তার আগে সভায় নিয়ে আসুন সেই বন্দী রাজপুত্রদের আর রাজকন্যা রূপকুমারীকে।

লবণ রাজা সভা মিলিয়ে এক পাশে এনে দাঁড় করিয়ে রাখলেন বন্দী রাজপুত্রদের আর অপর দিকে এক সুদৃশ আসনে বসতে দিলেন রাজকন্যা রূপকুমারীকে।

কুমার তখন একে একে রূপ কুমারীর পিতার আমল থেকে সেই দিন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলে, ওই যে সব রাজপুত্র, ওরা সবাই ছিল ওর ক্রীতদাস প্রমাণ স্বরূপ দেখতে পাবেন ওদের কাপড়ের তলায় রয়েছে কঙ্কে পোড়া ছাপ।

মহারাজ অনুসন্ধান করে দেখলেন, রাজপুত্রের কথাই ঠিক।

তক্ষুণি রাজপুত্রদের পাঠালেন কারাগারে শাস্তি ভোগ করতে আর কুমার রূপকুমারীকে ফিরে পেয়ে প্রস্তুত হ'ল দেশে ফিরবার জন্য।

কুমার রাজকুমারীকে বলে,—রূপকুমারী, তোমাকে যে ফিরে পেয়েছি তার মূলে রয়েছে এই সোনালতার ভালবাসা আর তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তাকেও আমাদের সঙ্গে নেওয়া উচিত।

রূপকুমারী বলে, সেতো নিশ্চয়ই, তা'হলে এবার চলো যাত্রার আয়োজন করা যাক—এই বলে তারা এগিয়ে যেতে থাকে তাদের নৌকোর দিকে। হঠাৎ উভয়েরই নজরে পড়ে মেছুনীর সেই ছোট্ট ডিঙাখানা বেয়ে এগিয়ে চলেছে সোনালতা স্রোতের টানে।

কুমার চিৎকার করে ডাকে, সোনালতা ফিরে এসো। তোমাকে ফেলে আমরা ফিরতে চাইনা। আমরা তিনজনেই একত্রে দেশে ফিরব। সেখানে তোমার কোন অমর্যাদাই হবে না।

রাজকুমারী কেশবতীও ডাকে, ভগ্নী, অভিমান করে আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যেওনা। তোমার জন্যই আজ ফিরে পেয়েছি কুমারকে তুমি আমি আজ থেকে চিরদিন একত্রেই থাকব, তুমি ফিরে এস বোন, আমার কথা রাখ।

সোনালতার ডিঙি জলকেটে তখন এগিয়ে চলেছে দূরে আরও দূরে। দূর থেকে বলে, বন্ধু, আমার কার্য শেষ হয়েছে। আমি ফিরে যাচ্ছি বলে মনে কিছুমাত্র দুঃখ কোরোনা, তোমার সুখেই আমার সুখ। আকাশের চন্দ্র, সূর্য, তারা, মাতা-বসুমতী আর জননী জাহ্নবীর কাছে প্রতিনিয়ত তোমাদের মঙ্গল কামনাই করব—এই বলে আরও জোরে নৌকো বেয়ে এগিয়ে চলে সোনালতা। ধীরে ধীরে তার ডিঙ্গির শেষ চিহ্নটুকুও চোখের আড়ালে চলে যায়।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে রূপ-কুমারীর হাত ধরে কুমারও আস্তে আস্তে নিজেদের বজরায় এসে পদার্পণ করে—নিজের দেশে ফিরবার জন্য।

।। কাব্য ।।

—এক—

হারে দুঃখেতে প্রাণ বাঁচেনা ক্যাশবতীর তরে,
রে বিধি কী কথা শুনালুরে বুকে শ্যাল দিয়া (রে)
(বিধি কী কথা শুনালু)
(অগো) মালঞ্চী রাজের পুত্র নামে শঙ্খনাথ,
নদীর ঘাটে জল কেলিতে মোনে ছিল সাধ।
(ওগো) সেইওনা ঘাটে জলের তোরে ভাসে চম্পাফুল,
হিল্লোলে হিল্লোলে পুষ্প আসে নদীকূল।
রাজার বেটা শঙ্খনাথ চায় নিনিমেষে,
ভাসন্ত চম্পার ফুল আইলো তারই কাছে।
(হারে) হতমান হইয়্যা কুমার ফুল ধরিল হাতে,
ফুলের গাত্রে জড়াইন্যা ক্যাশ হস্ত পাঁচেক হবে।
কুঁচকাইন্যা(১) কালা ক্যাশ কোনা রমণীর নিচ্চয়,
হস্তে গুনিয়া ক্যাশ শঙ্খ চিন্তিল বিশেষ।
ভাবে এ হেন ক্যাশ যার সে বা কি রূপসী,
যেইও-ক্যাশ এইনা কইন্যার তারে ভালবাসি।
এইও ক্যাশ যারও হয় দেবী কিম্বা নারী,
তারে মুই করমু বিয়া যে হউক মোর বাদী।
পুষ্পসহ ক্যাশ হস্তে কুমার রাজপুরীতে ফেরে,
সেই দিনেতেই ঘোষণা করে যাবে বানিজ্যেতে।
হারে বানিজ্যেতে যাইবে কুমার কিবা আয়োজন,
সপ্ত ডিঙা মধুকর সাজে, সাজে লোকজন।
ধনধান্যে পূর্ণকরে ডিঙা সাত খান,
মধুকরে উইঠ্যা কুমার করিল পয়ান।

(১) কোঁকড়ানো,

হারে নানা বাইগু কোলাহল চলে রাত্রি দিনে,
তামাশা মস্করা করে ইয়ার বন্ধুজনে।
চাইর দিগালে ক্যাবল পানী আর কিছুই না যায় গোনা,
একে একে পার হইয়্যা যায় সাত সাগরের ঘোনা।
দুধ সায়র, ক্ষীর সায়র, লোহিত সায়রে যায়,
কালাপানী ছাড়াইয়্যা কুমার লবণ হ্রদে ধায়।
হারে লবণ হ্রদে আইস্যা কুমার পড়ল বায়ুর কোপে,
ঈশান কোনে ম্যাঘ গজরাইলো (২) ডুলাইর চৌক্ষে
বারি ঝরে।

কোথায় রইলা মা ভবানী একবার দ্যাখা ছ্যাও,
'জয় মা মঙ্গলা' বইল্যা ডুলাই বায় তার নাও।
গর্জিল ঈশানী ম্যাঘ পানীতে পাড়ে (৩) ফাল্ (৪),
কচুপাতার উপারে য্যামুন পানী করে টলমল।
মরণ-পণ কইর‍্যা ডুলাই তহন নাও সামলাইতে যায়,
তুফানের ঝাপটায় নাও উল্টা হইয়্যা যায়।
ছয় ডিঙা ডোবল শঙ্খের মধুকর ভরসা,
সগ্‌গল লোকে আইস্যা জোটে এই শ্যাষ আশা।
আহাশে তুফানের গর্জন নদীতে ডাহে বান,
শঙ্খ বলে, ডুলাই, এবার বাঁচাও আমার প্রাণ।
কান্দে কুমার, কান্দে সাথী, মাঝিমাল্লা যত,
কাণ্ডারী হইয়্যা ডুলাই নাও বায় সাধ্যমত।
আসমানেতে খাড়া ঝিলিক, ঝিলিক্ ঝিলিক্ করে,
সায়রের জলের লগে (৫) কি বা মিতালি করে।
ঢেউয়ের দাপটে নাওয়ের মাস্তুল ভাইঙ্গা পরে,
সায়রের জলে নাও কুমারের চাকের নাহান (৬) ঘোরে।

(২) গর্জন করিয়া উঠিল, (৩) করে. (৪) লাফ্ দেওয়া।
(৫) সঙ্গে (৬) মত—অনুরূপ

(হারে) ঘোরে নাও, ঘোরে কুমার, ডুলাই কতনা চেষ্টা করে,
ঘোরতে ঘোরতে ময়ুরপঙ্খী ডোবল সায়রের জলে।
সপ্ত ডিঙা মধুকর ডোবল জলের তলে,
দারুণ বিধির রোষ কুমার খণ্ডাইবে ক্যামনে।

—দুই—

(হারে) শঙ্খনাখের সপ্তডিঙা মধুকর গ্যাল জলে তলাইয়্যা,
রাজার কুমার কোনমতে ওঠলো ভাইস্যা
জলের উপার নিয়া।
ভাসতে ভাসতে রাজার কুমার খানিক দূরে চলে,
সুমুখখানে হাতে পায় নায়ের ভাঙ্গা মাস্তলে।
ভাঙ্গামাস্তলে পাইয়্যা কুমার তার উপারে চড়ে,
কিছু দূর গিয়া কুমার কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা বলে।
(হারে) বিধি একি আমার করমেরি লেখা,
বঁধুর লাইগ্যা হইলাম সারা
পথের মইধ্যে বিপাকে ফ্যালাইয়া,
বিধি মোরে কী ছলে ভুলাইলা।
কৈশোরেতে মাতার কোলে পালন কইর‍্যাছ স্নেহে,
যৈবনে সাগর বুকে আমার প্রাণ গ্যাল শ্যাষে।
(বিধি মোরে কি ছলে ভুলাইলা।)
ক্যাশবতী কইন্যা গো সে রূপনগরে বাস,
তারই লইগ্যা কাইন্দা কাইন্দা কাটাই বারমাস।
চাইর দিগে জল, থলও নাই আর,
আমারি দুঃখেরি বুঝি নাই পারাবার।
সেওত রাজার কইন্যা বইস্যা রইছে ভালো,
তারও লাইগ্যা আমার যে গো
বেঘোরে প্রাণ গ্যাল।

এই না গীত গাইয়্যা কুমার চাইর দিগালে চায়,
অনেক তাফাতে(৭) পাড়ের নিশানা দেখিবারে পায়।
পাড়ের নিশানা দেইখ্যারে কুমার গঙ্গাস্তব করে,
ছাখতে ছাখতে কালা রাইত বুঝিবা কাবার হইয়্যা আসে।
(হারে) কাইট্যা যায় কালা রাইত(৮) ক্ষান্ত ছায় ম্যাঘ জল,
নিকটে ঘাটলা দেইখ্যা কুমারের বুকে আইসে বল।
ভাসতে ভাসতে মাস্তুল আইলো ঘাটলার কিনারে,
জমিন দেইখ্যা কুমার তহন ঝম্প দিল জলের উপারে।
সাহানবান্দা ঘাটলা দেইখ্যা কুমার তহন
মোনে মোনে গোণে,
নিকটেতে জন মুনিষ্যি নিচ্চয় আছে কোনখানে।
কিবা ছাশ, কি সোমাচার, কিছুই ত' না জানি,
না জানিয়া না শুনিয়া আউগাইলে হবে পেরেসানী (৯)।
এই কথা না ভাইব্যা কুমার তহন এক বিরিক্ষিতে চড়ে,
বিরিক্ষিতে রইয়্যা কুমার তাজ্জব কাণ্ড এক ছাখে।
নদীর ঘাটে আইলো এক রূপসী যোবতী,
সঙ্গেতে আইস্যাছে হের শতেক সেবাদাসী।
ঘাটলাতে না বইয়্যা দাসীরা হের গাত্র মাঞ্জন করে,
কেউবা সৌগন্ধি ল্যাপে যোবতীর কালা ক্যাশে।
একে একে নামলো সগাই গাঙের জলেতে,
সিনান শ্যাষে মোছায় তারে সুতান গামছা দিয়ে।
গাও মোছা শ্যাষ কইর‍্যা দাসীরা যোবতীর
মেইল্যা দিল ক্যাশ,
ম্যাঘে য্যামুন আন্ধার করে শাওনের আহাশ।
(হারে) ক্যাশ শুকাইতে দিয়া কইন্যা এদিগ ফিরা চায়,
বিরিক্ষির উপার বইয়্যা কুমার হের বদন ছাখতে পায়।

---

(৭) দূরে (৮) দুঃখের রাত্রি। (৯) কষ্ট = দুঃখ

পানপাত্তি বদন যের ধনুক ব্যাঁকা ভুরু,
তিল ফুলের মতন নাক মোমের নাগান (১০) উরু।
করমচা রাঙা ঠোঁট দুইখান মুক্তা-পাতি দাঁত,
হাসলে গালে টোল খায়, শঙ্খের মতন হাত।
সুঠাম (১১) নিতম্ব যের ঘোরলে ছাখা যায়.
বক্ষের ডাঙ্গর (১২) ছিরিফল(১৩) কতনা শোভা পায়।
পৈরনে(১৪) আসমানী শাড়ি, তারে কেইজ্য করি,
হরিতালের(১৫) মতন গাত্র করছে ফুটি ফুটি।
চাইয়্যা চাইয়্যা শঙ্খের চৌখের পলক নাই পরে,
ভাবে কে অইবে এইনা কইন্যা কে বলিতে পারে।
একদণ্ড ব্যালা অইলে কইন্যায় গাত্র উত্থান করে,
শত সখী চাইর সাইরেতে ক্যাশ উঁচা করে।
আগে চলে যৈবতী পিছানে সখীদল,
বিরিক্ষি অইতে নাইম্যা কুমার করল কিছু ছল।
যৈবতীর দল অদেখা অইলে কুমার পেরবেশে নগরে,
দেইখ্যা শুইন্যা এক বাওনের ঘরে
অতিথ হইয়্যা ঢোকে।
বাওন কয়, শোন বাপু, আমি যে নেহাৎ দরিদ্র,
ক্যামনে করমু সেবা তুমি যে অতিথ অগ্রগণ্য।
কুমার কয়, ঠাকুর, তুমি না কইরো আর চিন্তা,
আমার যা অর্থ আছে হেতেই কাটবে অন্ন চিন্তা।
এই কথা না কইয়্যারে কুমার তহন হাতের
অঙ্গুরী খুল্যা দেয়,
সুবর্ণ-অঙ্গুরী দেইখ্যা ঠাকুরের চক্ষু আটাশ (১৬) দেয়।

(১০) মত — অনুরূপ। (১১) সুন্দর (১২) বড় (১৩) বেল (১৪) পরিধানে
(১৫) হরিদ্রা বর্ণ (১৬) আশ্চর্য — চমৎকৃত।

—তিন—

(হারে) আমি কী কথা শুনাবোরে ওরে আমার মোন,
রূপনগরের কথা কিছু করি নিবেদন।
ধনে জনে পূর্ণ ধরা রূপনগর তার নাম,
রাজা নাইগো সেইও রাইজ্যে কইন্যা গুণ ধাম।
রূপনগরের ক্যাশবতী কইন্যা রূপকুমারী যের নাম,
কিবা তার রূপের বাহার বৈষম ডাক নাম।
(হারে) এই না রাজত্বের রাজা যহন গ্যাল মরি,
সেইও হইতে কইন্যা তায় করে রাজাগিরি।
অষ্টাদশ বচ্ছর গ্যাল কইন্যার বিয়া নাহি করে,
বলে, তার যোগ্য পাত্তুর পাইলে হেরে বিয়া করে।
যেও অইবে রাজার কুমার পাশা খেলায় দড়,
সেইও কুমারের গলেতেই কইন্যা মাল্য দেবে বড়।
রূপকুমারী এই না কইন্যা করিল বৈষম পণ,
যেও হউক রাজা উজির তারে দিবে মোন।
রাজকইন্যা পাবে সেও রাজার রাজত্ব,
কিন্তু খেলায় হারলে তার হবে যে অনথ্থ।
যেইও না লোক হারা হবে এই না পাশা খেলায়,
কীর্তদাস হইয়্যা তার নফর বনবে তায়।
এই না অদ্ভুত কথা ঘোষে চারি দিগে,
দ্যাশ বিদ্যাশের রাজার কুমার ফাল্ পাইরা আসে।
(হারে) বাদলা পোকা য্যামুনতর আগুনে দ্যায় ঝাপ্,
পাছের কথা মোনে না গুইন্যা তারা ভোগে নিজের পাপ।
এইমত কত শত মুনিষ্যেযে বন্দী হইয়্যা রয়,
ক্যাশবতীর রূপের ফাঁদে পাষাণ হইয়্যা যায়।
(হারে) বাঘা বাঘা কত খেলুয়াড় কতনা দ্যাশের লোক,
পাশা খ্যালাইতে বইয়্যা তাগের লাগে বৈষম শোক।

(হারে) আজব কথা শোনতে মজা কওনও না যায়,
ক্যাশবতী কইন্যার তুশমনি কেরমে পেরকাশ পায়।
(হারে) একদিন্ তুই দিন জ্যাখতে জ্যাখতে গ্যাল মাস বচ্ছর,
রাজার বেটা শঙ্খনাথে লয় সগ্‌গল খবর।
(হারে) এক দিবসে দিবা শ্যাষে কুমার বাগিচার দক্ষিণ কোনে যায়,
চৌক্ষু মেইল্যা চাইয়্যা জ্যাখে আজব কাণ্ড
কত না রাজপুত্রে মাইন্ধারীর (১৭) কামে ধায়।
কুমার কয়, তোমারগেত' উত্তম মোনে লয়,
কীয়ের লইগ্যা এমন কর্ম তোমরা কর মহাশয়।
রাজকুমারীর ঘোড়ার ঘাস কাটতে ছিল যেইও জন কুমার,
বিরিক্ষের আবডালে(১৮)নিয়া তারে কয় সগগ্‌ল সোমাচার।
বলে, বাই, আমি অইলাম চন্দরদ্বীপের কুমার,
ক্যাশবতীর রূপের চোরাবালিতে ডুইব্যাছি এবার।
আমার নাগান চাইয়্যা জ্যাহ (১৯) এই যে সব কুমার,
সগ্‌গলডির (২০) নসিবেই জাইন্যো একই সোমাচার।
রাজকুমারী বিদ্যাধরী রূপের নাইকো তুলা,
উপারেতে সোনার কলস মইধ্যেতে বিষ ভরা।
যেইওনা লোক যায় হোথায় পাশা খ্যালাইবারে,
অমনি দাসীরা তার পদসেবা করে মহাসমাদরে।
ঠিক লগ্‌গনে নিশৈত(২১) রাইতে রাজকুমারী
বৈসে পাশা খ্যালাইতে,
পরথমে হাইস্যা কয় কথা মোন ভুলাইতে।
মোন ভুলাইয়্যা পাগল কইর‍্যা কৌশলে কাম সারে,
নিজের আছে পোশা ইন্দুর হেরে বাইর করে।
যেইও কালে রাজকুমারীর হারবার সোমায় হয়,
সেইও কালে ইন্দুর মশায় পীদ্দ্র্ম উল্টাইয়া দেয়।

(১৭) চাকর (১৮) আড়ালে (১৯) দেখ (২০) সকলের (২১) গভীর রাত্রি

পীদ্‌র্ম জ্বালাইবার ছলে রাজকুমারী
নিজের গুটি থোয় কায়দামত ঠাঁয়,
পীদ্‌র্ম জ্বালাইয়া দুইজনে কাঁরায় মত্ত হয়।
(হারে) কী কইমু কপালের কষ্ট কওনও না যায়,
নিজের গুটির আবস্থা দেইখ্যা মশয়ের
কান্দন আইয়্যা যায়।
(হারে) এই না অবসরে কইন্যা টকা টক্ বাজি জেতে,
বাজি জিত্যা সেইও দণ্ডেই রাজপুত্তুরে বান্ধে।
(হারে) খসাইয়্যা ন্যায় রাজভূষণ কুমারের গাত্র থিকা,
সেইওদণ্ড হইতে কুমার অইলো তার কিনা।
(হারে) ও বিধি কী কথা শুনালি মোরে রে,
ক্যাশবতীর লইগ্যা গো আমার পরাণ বিদরে।
আমি নিশিদিন রইয়্যাছি বইস্যারে ওরে আমার মোন,
ক্যামনে পাইমু মুই ক্যাশবতীর মোন।
বন্দী রাজপুত্রে কয়, শোন মোর কথা,
ভাল যদি চাও বাছা না আসিও হেথা।
তোমার নাহান(২২) কত না কুমার ঐ দ্যাহ (২৩) কাম করে,
কিয়ের লইগ্যা আইবা কুমার আমাগেরি দলে।
তয় ভাই একখান কথা নিবেদন জানাই,
যদি তুমি ক্যাশবতীরে পাও, য্যান আমরা ছাড়া পাই।
রাজকুমারী বিদ্যাধরীর গোপন কথা এই কইলাম সার,
ভালমত আগে ভাইব্যা ভাই পাছে হইও প্রচার।
এই পর্যন্ত শুইন্যা না কুমার পিছান ফেরে যেই,
সেইদণ্ডে আরেক জন আসিলো সেই ঠাঁই।
এইওনা রাজার ব্যাটা বুদ্ধিমন্ত খুব,
হ্যাশ (২৪) কাডালে(২৫) হেরও কপালে না অইলো সুখ।

(২২) মতন (২৩) দেখ (২৪) শেষ-অবশেষ (২৫) কালে—সময়ে

এই না রাজার বেটা কোন্ ইত্তফাকে জিত্ত ছিল পাশা খেলায়,
হ্যাষকাডালে হাইরা মইলো সিনান করবার বেলায়।
মালী বেশী রাজপুত্রে কয়, শোন আর একখান কথা,
পাশাখেলার পরে জাইন্যো আছে আরেক পরীক্ষা।
পাশার বাজি জেতলে পরে তোমারে নেবে সিনান ঘাটে,
দুই ধারে দুই দীঘি আছে এট্টায় এক যক্ষী থাহে।
যক্ষীর দীঘিতে ইডাল(২৬) মারলে ঠন্ কইর‍্যা শব্দ অবে,
শেতল(২৭) দীঘির জলে কোন শব্দ না অবে।
সিনান করনের আগে বাই এই রহম যাচাই করা চাই,
তা না অইলে যক্ষীর উদরে যাইবাই নিচ্চয়।
এই সগ্‌গল বিত্তান্ত শুন্যা কুমার তহন ভাবে মোনে মোন,
ক্যামুনে সিদ্ধি পাব উপায় কী করন?

(হারে) ও বিধি একি বিষম দায়,
ক্যাশবতী কইন্যার তরে এহন বে-ঘোরে পরাণ যায়।

(আহারে) সোনার মৃণাল-পদ্ম যেন ভাসে জলেতে,
হেয়ারে জড়াইয়্যা রইছে কালিয়া নাগেতে।
হারে ক্যামুনে আনিমু মুই ও হেন মৃনাল,
এ জীবনের সগল বাঞ্ছা গ্যাল রসাতল।
বায়ন বাড়ি ফির‍্যা কুমার বায়নেরে দেয় ডাক,
বলে, ঠাকুর, তোমার এট্‌টা বিলাই আমারড়ে থাক।
বাওন কয়, যে বিলাই ইচ্ছা লয় তুমি দেইখ্যা লও,
কোন্ বিলাইডা (২৮) নেবা তুমি হেই কথাডা কও।
দেইখ্যা শুইন্যা কুমার তহন এট্টা ধলা(২৯) বিলাই নিয়া,
সগল সোমায় শেখায় তারে দুগ্ধ ও মৎস দিয়া।
দুগ্ধ মৎস খাইয়্যা বিলাই কয় দিনেই মানে পোষ,
কুমার ভাবে, এত দিনে আমার গ্যাল আপশোস।

---

(২৬) মাটির ঢেলা বা ইটের টুকরো (২৭) ঠাণ্ডা (২৮) বিড়াল (২৯) সাদা রংএর

এক দিনেতে নিশা(৩০) শ্যাষে রাজার কুমার
যাত্রা করে রাজপুরীর দিকে,
রাজপুত্রে ব্যাশের(৩১) আড়ে বিলাই নেয় লগে।(৩২)
রাজপুরীতে আইয়্যা কুমার খাড়ায়(৩৩) সিংহদ্বারে,
তারে দেইখ্যা নারী পহরী বার্তা জিজ্ঞাস করে।
রাজকুমার কয় কথা, আমি এক কুমার,
ক্যাশবতী কইন্যার লগে আছে মোর সোমাচার।
আইলাম আমি রাজপুত্তুর পাশা খেলতে চাই,
বাজির কড়াল(৩৪) স্মরণে আছে অনুমতি চাই।
রাজকুমারের বার্তা নিয়া প্রহরী আগেগে দেয় দৌড়,
এক দণ্ডের মইধ্যে ফিরয়া তারে করে সোমাদর।
সিং দরজায় ঢুইক্যা কুমার অবাক হইয়্যা চায়,
শতে শতে সখী ক্যানে তারে সোমাদর জানায়।
পুষ্পের মাল্য হস্তে কেউবা
চন্দন কুমকুমের বাটা কারও হাতে,
শঙ্খ বাজায় কোন জনা, কেউবা চলে সাথে সাথে।
বাইর দরজা ছাইড়্যা কুমার দরবারেতে ঢোকে,
সিংহাসনে দেইখ্যা কইন্যায় বুঝিবা ঢোক গেলে।
সোনার সিংহাসন তেয় মাণিক্যের বাহারী,
তারই মইধ্যে রাজমুকুটে বইস্যাছেন বিদ্যাধরী।
আহারে কি রূপের ছটা স্বপ্নেও যা-না মেলে,
গহীন কালো অক্ষি দিয়া বুঝিবা তারে গেলে।
দিবাস্বপ্ন দেখে বুঝি কুমার শঙ্খনাথ,
সগ্‌গের অপ্সরী বইল্যা ঘটে পেরমাদ।
মিষ্ট হাসি হাইস্যা কইন্যায় বইসতে আসন দ্যায়,
চৌক্ষু পানে চাইয়্যা কইন্যার মস্তক ঘুর্‌র্যা যায়।

(৩০) রাত্রে (৩১) পোশাক (৩২) সঙ্গে (৩৩) দাঁড়াইলো (৩৪) শত।

আহারে কি হাসির ঠমক গালের উপার তিল,
সপ্পনের ছবির লগে এইও খানেতে মিল।
কইন্যা বলে, কুমার, তোমার বিত্তান্ত শুন্যাছি,
আমার বাজির সগল কথা জানেনত' আপুনি।
কুমার কয়, সগ্‌গল শুন্যাই মুই আইস্যাছি এইহানে,
অধিক কথার কার্য নাই, ফলে পরিচয় দিমুআনে।
কইন্যা বলে, দিবা ভাগে খেলা নাই হয়,
বিশ্রাম মুন্দিরে এহন থাহুন মহাশয়।
গভীর নিশৈতি রাইতে সখী মোর
বোলাবে আপনায়,
পাশা খেলায় মত্ত হইমু মোরা দুইওজনায়।
এই কথা না কইয়্যারে কইন্যা কার্যে দিল মন,
শঙ্খনাথ সখী সনে করিলা গমন।
হায় হায়রে বিধির ইচ্ছা বল কে বুঝিতে পারে,
রাজার কুমার জড়াইয়্যা পইলো ক্যাশবতীর জালে।
হারে ও কইন্যা সপ্নে নি দেইখ্যাছি তোমার বদন,
সেইও হইতে কপালে মোর ঘটিল কি-বা অঘটন।
তুমিত' সুন্দরী কইন্যা ফোটা ফুলের মত,
তোমার সুবাসে অলি জোটে আইস্যা যত।
হারে কতনা দ্যাশের কুমার বন্দী হইলো
তোমার মায়া জালে,
অভাইগ্যা শঙ্খনাথে আইজ বুঝি পড়িল কাফালে।
হারে সোনা নয় রূপা নয় বন্ধু যে ডাহাতী করিমু,
তরতাজা(৩৫) যোবতী রত্তন ক্যামনে বা
ভুল্যা (৩৬) লমু।

(৩৫) পূর্ণ যুবতী। (৩৬) তুলিয়া।

তোমার লইগ্যা বিবাগী মুই পন্থে পন্থে ঘুরি,
তুমি আইস্যা বইস কইন্যা আমার বক্ষ জুড়ি।
(কইন্যা হে।)॥

(হারে) বেলা দ্বিপ্রহর অইলে ঘণ্টা বাজায় সখী
এক সখী আইয়্যা খাড়ায় অন্নের থালা রাখি।
কোন সখী করে ঠাঁই কেউবা করে পাঙ্খা,
আরো সখী আইস্যা দেয় ভাত খাওনের তাড়া।
ভাত খাইতে বইসে কুমার মোনে মোনে গোণে,
কে-জানে কি-বা ঘটে ইয়ারও পরক্ষণে।
(হারে) চৌষট্টি ব্যাঞ্জন দিল থালার চাইর পাশে,
কি-বা খাইয়্যা কি-বা থোয় মোনে মোনে হাসে।
একে একে খাইলো কুমার কিছুই না রইলো বাকী,
হাত ধুইবার কালে কয় কুমার সখীগণে ডাকি।
কুমার কয়, আইস্যাছি হেথায় পাশা খেলাইবারে,
এত সোমাদর আমার ভাইগ্যে সইবারে কি পারে?
এক সখী হাইস্যা কয়, আপুনি তো' অতিথি,
পাশা খেলার আগে তক তোমায় মাইন্য করি।
এই বাক্য না কইয়্যারে সখীরা করিল পরস্থান,
সুবর্ণের পালঙ্কে কুমার করিল শয়ান।
পালঙ্কে শুইয়্যা কুমার ভাবে আকাশ পাতাল,
হেনকালে দিন গিয়া আইলো সইন্ধ্যাকাল।
(হারে) সইন্ধ্যা অইলো দীপ জ্বললো সগ্.গল ঠাঁই,
রাজকুমারের ঘরের দীপ জ্বালনের কেউ নাই।
আন্ধার ঘরে রইয়্যা কুমার প্রমাদ গণে মনে,
এত সোমাদরের পরে এবার না জানি কি ঘটে।
ঢং ঢং অইলো শব্দ হইলো রাইত দুপার,
পীদ্দ্ম জ্বালাইয়্যা আইলো সখী তিন চার।

হাইস্যা সখীরা কয়. হইয়্যাছে সোমায়,
এই পথে যাত্রা করেন আপুনি মহাশয়।
এই বাক্য না কইয়্যারে তারা আগে আগে যায়,
তিন মহাল পার হইয়্যা কুমার অন্দরে পৌছায়।
অন্দরমহালের ভিতর শয়ান মুন্দিরে,
জড়িদার পাটির পরে কইন্যা বইস্যাছে খেলাইবারে।
পাশার কোট রাইখ্যা কইন্যায় গুটি সাজাইয়্যা থোয়,
হাইস্যা কুমাররে হেথায় বইসতে আসন দেয়।
নিচ্চুপ, নিঝঝুম ঘর. কোন শব্দ নাই হয়,
পাশার চালনের শব্দে বুঝ তাল কাইট্যা যায়।
(হারে) পাশা খেলে দুইও জনায় মুখে নাই রাও,
সিয়ানে সিয়ানে লড়াই কেউ না পায় কারও ভাও।
তিন পহর অইলো রাইত বাজকুড়ালে ডাকে,
এই না সোমায় কইন্যার গুটি ঠ্যাকলো উল্টা চাপে।
বে-গতিক বুইঝ্যা কইন্যা ইন্দুরে দেয় ইসারা,
ইসারায় ইন্দুর রাজ আউগায় পীর্দিমের সামানা।
(হারে) শেখাইন্যা পড়াইন্যা ইন্দুর বাতি নেভাবার যায়,
এই-না দেইখ্যা কুমার বিলাইরে
ঠ্যালে আলগোছায়।
বিলাই দেইখ্যা ইন্দুর রাজের তড়াশে ওড়ে প্রাণ,
ভাবে ঐ না থাবায় আইজ বুঝি যাবে হেরি প্রাণ।
রাজকুমারী যত না ঠ্যালে ইন্দুব আউগাইয়্যা আয়,
হেরে দেইখ্যা মোছ (৩৭) ফুলাইয়্যা বিড়াল মশাই
খাড়া হইয়্যা যায়।
বিলাইরে খাড়াইতে দেইখ্যা ইন্দুর উল্টা দৌড় মারে,
শিকারহারা হইয়্যা বিলাই থাবা বন্ধ করে।

---

(৩৭) গোঁপ

(হারে) এদিগেতে বিলাই ইন্দুরের আড়াআড়ি গ্যাল শ্যাষ হইয়্যা,
সেই সাথে ক্যাশবতীর জারিজুড়ি গ্যাল,
গোল্লার (৩৮) তলা দিয়া।
সুযোগ পাইয়্যা একদণ্ডে কুমার পাশায় দিল চাল,
সেইও চালে রাজ কুমারীর যে ভাঙিলো কপাল।
(হারে) পাশা খেলায় হাইর‍্যা গ্যাল ক্যাশবতী কইন্যা,
পরাজয় মাইন্যা কইন্যা কান্দে রইয়্যা রইয়্যা।
রাইত পোয়াইলো ফার্শা অইলো
সখীরা আইলো ঘরে,
জয় জোকার দিয়া সগগলে মঙ্গল বাদ্য করে।
(হারে) এতদিনে ভাঙ্গল কইন্যার ধনুকভাঙ্গা পণ,
রাজাগিরি থুইয়্যা এবার সোংসারে ছাও মন।

—চার—

(হারে) কি কথা শুনালি মোরে রে রসিক সুজন,
তোরও কথা কইতে মোর ঝোরে দু'নয়ন।
(হারে) কত বচ্ছর অইল গত কন্যা কভু না হারিল,
বিধির নিব্বন্ধে আইজ বুঝি কাফালে (৩৯) পড়িল।
রাজকুমার ফির‍্যা যায় নিজের আস্তানায়,
সপ্তশত সখী তার পিছান পিছান ধায়।
ক্ষণদণ্ড করে বিশ্রাম কুমার শঙ্খনাথ,
চাইয়্যা ছাখে সেই দণ্ডে আইলো কইন্যা
ধইর‍্যা সখীগণার হাত।
করজোড়ে কয় কইন্যা রাজকুমারের ঠাঁই,
পাশা খেলায় জিত্যাছ তুমি এ-কথা সত্য মানি,
সগল কার্য সিদ্ধি হইতে কিঞ্চিত এখনও বাকি।

(৩৮) জাহান্নামে=ভেস্তে যাওয়া। (৩৯) সঙ্কটে

কুমার কয়, কও কইন্যা, কী-বা বাকী আছে,
মা-জননীর দয়ায় সেইও বাক্সি উৎরাণের
ক্ষেমতা আমার আছে।
কইন্যা কয়, তোমার লগে অইবে বিয়া রাত্র নিশাকালে,
তার আগে ওইনা সায়রে একবার সিনান করণ লাগে।
সিনান কইর‍্যা উইঠ্যা তুমি পইববা নূতান ব্যাশ,
আইজ নিশিথে কইর‍্যা বিয়া
কাইল পরভাতে যাইমু তোমার দ্যাশ।
কিন্তু কুমার, একখান কথা তোমারে স্মরণ যে করাই,
দীঘির জলে ডুইব্যা মইলে দাই অইবেনা কেউই।
আইচ্ছা আইচ্ছা কইয়্যারে কুমার চলে সখীগণার সাথে,
রাজকন্যার শ্যাষ কথাডা মোনে মোনে গোণে।
কিছু দূরে গিয়া কুমার দ্যাখে অবাক হইয়্যা,
অবিকল একই মত দুই পুষ্করিণী রইছে পাশাপাশি হইয়্যা।
তৈল মর্দন করনের ছলে কুমার ভাবে মোনে মোনে,
কোন্ বা দীঘিতে নামমু মুই না বুঝি এই ক্ষেণে।
অনেক ভাবনা ভাইব্যা কুমার এক বুদ্ধি মোনে লয়,
তৈল মর্দন সাঙ্গ কইর‍্যা দুইডা ইডাল (৪০) হাতে লয়।
পরথম ইডাল ফিক্যা (৪১) দিল বাও (৪২) পুকুরীর মইধ্যে,
ঠন্ কইর‍্যা শব্দ অইলো পুষ্করিণীর ভিতার হইতে।
দ্বিতীয় ইডাল ম্যালা (৪৩) মারে কুমার
দক্ষিণ পুষ্করিণীর মইধ্যে,
ঢপ্ কইর‍্যা শব্দ কইর‍্যা ইডাল সাথে সাথে ডোবে।
চিন্তা কইর‍্যা কুমার তহন ভাবে মোনে মোন,
বাও পুকুইরে (৪৪) ডুব দিলে নিচ্চয়ই অইবে অঘটন।

---

(৪০) ইটের টুকরো, (৪১) ছুঁড়ে দেওয়া (৪২) বামদিকের (৪৩) ছুঁড়ে ফেলা, (৪৪) পুষ্করিণী

এই না কথা ভাইব্যা কুমার তহন ডাইন পুষ্করিণীতে নামে,
ঘাটলাতে না বইয়া কুমার তখন
কত গাত্র মাঞ্জন (৪৫) করে।
গাত্র মাঞ্জন সাইর‍্যা কুমার জলে দেয় ডুব,
চতুরদিগে বাইন্ধ্য বাজে টুপ্ টুপা টুপ টুপ্।
সিনান কইর‍্যা কুমার তহন ওঠে ঘাটলার পরে,
শতে শতে সখীগণে পুষ্প বৃষ্টি করে।
এক সখী লইয়্যা আইলো পাটের কাপড় আর চাদর,
হাতের বাজু, কানের কুণ্ডল লইয়্যা আইলো অন্য সহচর।
সুগোন্ধি পুষ্পের মালা আনলো এক দাসী,
হস্তে ধইর‍্যা লইয়্যা গ্যাল কইন্যারই এক মাসী।
শুভক্ষণে রাইত দুপারে মহা ধুম ধাম করি,
চাইর চৌক্ষের অইলো মিলন বাজে দিব্য-ঘড়ি।
(হারে) বিয়ার বাসর-রাইত শ্যাষ হইলো পলক ম্যালবার আগে,
কুমার বলে, কইন্যা, এবার দ্যাশে ফেরন লাগে।
অনেক দিন অইলো গত দ্যাশে মুই নাই,
আমার লইগ্যা ভাইব্যা ভাইব্যা মোর জননী বুঝি নাই।
যাবার আগে কইন্যা আমার আছে এক আরজি,
বন্দী রাজকুমার সগ্‌গলেরে দ্যাও তুমি ছাড়ি।
কইন্যা বলে, এহন অইতে রাজা তুমি এই না রাজত্বের,
পুনরায় বাঞ্ছা (৪৬) কর যা আছে তোমার মনের।
হারে এ আহায় এ,
শঙ্খনাথ মুক্তি দিল যত না রাজকুমার,
কয়, বন্ধু, দ্যাশে যাও নিভ্‌ভয়ে এবার।
এত দিনে গ্যাল বন্ধু তোমাগের দুঃখের দিন,
আমার রাইজ্যে ফিরমু মুই পাইলো সুদিন।

(৪৫) গা রগড়ানো (৪৬) ইচ্ছা

সগ্‌গল রাজপুত্রে কয়, বন্ধু তুমি মোরগো ধাতা,
তোমার লগেই ফিরমু ছ্যাশে যদি না থাহে কোন বাঁধা।
কুমার কয়, ভাল কথা কইয়্যাছ বন্ধু, কথা কিন্তু ঠিক,
কাইল পরভাতেই (৪৭) নাও খোলেন
সোজা উত্তার দিক।
কইন্যা বলে, শোন ওগো শোন প্রাণাধিক,
এই রাজ্যও তোমার রইল সঙ্গে কী নিবা অধিক ?
কুমার কয়, ছয় ডিঙায় সাজাইছি যতেক দৌলাত, (৪৮)
সপ্ত ডিঙা মধুকরে যাইমু তুমি আমি
আর রাজপুত্রেরা একই সাথ।
কইন্যা বলে, ভাল কথা মোনে পড়ছে, একখান কথা কই,
এই লগে মোর শুকপঙ্খীডারেও নেবার মুই চাই।
(হারে) সাজিল, সাজিল ডিঙা সপ্তখান,
নিশান উড়াইয়্যা ডুলাই তহন জুইড়্যা লয় গান।
বদর বদর কইর‍্যা ডুলাই দাড়েতে দিল টান,
রাজহংসের মতন চলে ডিঙা সাতখান।
চলিল ডিঙার সারি ভইর‍্যা নানা ধন,
আমোদে আহ্লাদে কাটে সুখেতে মগন।
হারে একদিন, দুই দিন, পঞ্চদিনও যায়,
ছয় দিনে গ্যাল গিয়া কালা নদীর ঘোনায়।
আর মাত্তর একদিন সগলে গুইন্যা কয়,
রাইত এহন অধিক হইছে সব নিজ্‌ঝুম্ (৪৯) মোনে লয়।
ঢুলু ঢুলু ঘুমে চৌখ আচ্ছন্ন নয়ান,
খেলাইতে খেলাইতে কেউবা করিলা শয়ান।
শঙ্খনাথ খেলে পাশা বন্ধুজনার সাথে,
চুপিসারে ফন্দি আঁটে কোন কোন শঠে।

(৪৭) সকাল (৪৮) ধনরত্ন (৪৯) নিঝুম-নিস্তব্ধ

ফন্দি কইর‍্যা কয়জন তহন কুমাররে তুইল্যা লইয়্যা চলে,
আচমকা কাণ্ডেতে কুমার অবাক হইয়্যা ভাবে।
শয়তান ফেরেববাজ (৫০) যত রাজার পুত্র,
শঙ্খনাথের বরাত দেইখ্যা সগ্‌গলডির
হইয়্যাছে গাত্র দাহ।
হারে শঙ্খনাথে তুইল্যা নিল কেউবা কারও কান্ধে,
হস্তে পদে দড়ি দিয়া কেউবা তারেও বান্ধে।
হস্তে পদে বাইন্ধ্যা দড়ি তারে দিল বিসর্জন,
আবডালে (৫১) দেইখ্যা কইন্যায় জুড়িল কান্দন।
যত না ছিল রাজার বেটা তহন শলাপরামর্শ করে,
কেউবা ধন দোলাত্ চায়, কেউবা কইন্যায় যাচনা (৫২) করে।
(হারে) যহন তারা কোচল (৫৩) করে নিজেদিগের মইধ্যে,
পত্তর (৫৪) একখান লেইখ্যা কইন্যায়
শুকপঙ্খীর পায়ে বান্ধে।
পত্তর দিয়া ছাইড়্যা দিল আদরের শুকপাখী,
সেইও পত্তর নিয়া গ্যাল সে লবণ রাজার সামনি।
হারে সভা মিলাইয়্যা বইস্যাছেন লবণ ছ্যাশের রাজা,
পাত্তর মিত্তর শতে শতে দুয়ারে হস্তী বান্ধা।
চৌদিগালে (৫৫) সুবর্ণের দেওয়াল
ওগো কিবা ঝক্‌মক্ করে,
টাঙ্গী, বর্শা শতে শতে রৌদে (৫৬) ঝিলিক্ মারে।
লবণ রাজার পরতাপ মুই বলিমু বা ক্যামনে,
বাঘে মৈষে খায় জল একই ঘাটে বইসে।
সাধুজনার মাও বাপ, দুষ্টের কালশমন,
সেইওনা রাজার কুলে (৫৭) পইলো ক্যাশবতীর লিখন।

---

(৫০) জুয়াচোর (৫১) আড়ালে (৫২) পাইবার ইচ্ছা (৫৩) বচসা
(৫৪) চিঠি।(৫৫) চারিপাশে (৫৬) রৌদ্র (৫৭) কোলে

(হারে) পত্তর পাইয়্যা লবণ রাজা তড়িঘড়ি করে,
লোক লস্কর নিয়া তহনই ডিঙা আটক করে।
ডিঙা আটক করলে সগাই বলাবলি করে,
কী কারণে বন্দী হরছ (৫৮) আমাগের সগারে।
রাজা কয়, মোনে লয় তোমারা দুশমন,
ক্যামুন কইর‍্যা লইয়্যা চলছ এত রত্ন ধন।
সঙ্গে দেহি যোবতী নারী কে-বা উনি হন,
সত্য কথা না কইলে তোমাগের বধিব জীবন।
এক রাজার পুত্র কয়, উনি আমার বউ,
এনরা সগাই (৫৯) পাত্তর মিত্তব বন্ধু হবেনা বা কেউ।
লবণ রাজা বলে, কইন্যা চল আমার ঘরে,
কাইল পরভাতে দেখমু আমি বসিয়া বিচারে।
এই তামাতে এই না আদেশ দিয়া গ্যালাম মুই,
আটক রইলো ডিঙা আর তোমরা সগাই।

(পাঁচ)

(হারে) ঘুমন্ত রাজার কুমার পানিত পইর‍্যা জাগে,
হস্তের বন্ধন যহন তহন দন্ত দিয়া কাটে।
হস্তের বন্ধন খুইল্যারে কুমার তখন পায়ের বন্ধন খোলে,
সগল কথা মোনে পইলো ক্যামনে বা আইলো জলে।
(হারে) বিধি কী খেলা দেখালিরে মোরে কইতে নয়ন ঝুরে,
ও বিধি কী-খেলা দেখালিরে মোরে।
(হারে) পানি খাইয়্যা পানিতে রইয়্যা কুমার না পায় আগল,
সাঁতরাইবার না পাইর‍্যা কুমার হইয়্যা উঠলো ঢোল।
(হারে) ক্ষেণে ভাসে, ক্ষেণে উঠে রাজার কুমার,
তাই না দেইখ্যা জালুয়া এক করিল প্রচার।

---

(৫৮) করিতেছ (৫৯) সকলে

দ্যাখ্ ভাই বড়মাছ বুঝি ফাল্ (৬০) পাড়ছে নদীতে,
জাল দিয়া কোন্ ইতফাকে (৬১) অরে উঠাইমু নায়েতে।
এই না বইল্যা জাইল্যা তহন জালে খেও দ্যায়,
জালের লগে বাইস্যা (৬২) উঠলো কুমার মহাশয়।
এমন সোনার দ্যাহ দেইখ্যা জাইল্যা তহন
মোনে মোনে ভাবে,
এমন রত্তন নিয়া যামু মুই সোনালতার কাছে।
(হারে) একই মাত্তর কইন্যা জাইল্যার নামেতে সোনালতা,
বয়স অইলো ষোল সতের না অইলো তার বিয়া।
(হারে) তিন কুলে নাই কেউ জালিয়া সরদারের,
কারবা হস্তে দিবে কইন্যা চিন্তা তার মোনের।
এত দিনে বিধি বুঝি হইলো সদয়,
সোনালতার যোগ্য পাত্র এইতো নিচ্চয়।
সাত পাঁচ ভাইব্যা জাইল্যা ঘরে ফির্যা যায়,
দুরের থিকা শোর পাইর্যা কইন্যারে বোলায়।
কয়, বেটি এদিগ আয় কি-বা আনছি দ্যাখ,
এমন দ্রব্য আর দেখশ নাই, একবার আইয়্যা দ্যাখ।
বাপের ডাক পাইয়্যা কইন্যায় যেইনা সামনে আইলো ধাইয়্যা,
সুমুখে বাপের কোলে কুমারে দেইখ্যা থাহে অবাক হইয়্যা।
আহারে কি-বা সোনার দ্যাহ পইর্যাছে ঘুমাইয়্যা,
কারবা অঞ্চলের নিধি মুই কমু ক্যামনে কইর্যা।
(রে বিধি কমু ক্যামনে কইর্যা।)
বিস্তারায় (৬৩) শোয়াইয়্যা কুমারে উষ্ণ দুগ্ধ খাওয়ায়,
দণ্ডখানেক পরে কুমার নয়ন মেইল্যা চায়।
চৌক্ষু চাইয়্যা কুমার তহন অবাক হইয়্যা থাকে,
সোনালতা কয়, বন্ধু, চিন্তার কিছু নাই ঘটে।

(৬০) লাফ দেওয়া (৬১) কৌশলে (৬২) ভাসিয়া (৬৩) বিছানায়

(হারে) মজিল সোনালতা কুমারের রূপের ফাঁদে,
সব্বক্ষণ থাহে কইন্যা কুমার বগলেতে (৬৪)।
এদিগেতে লবণ রাজার রাজ্য সভায় বইস্যাছে বিচার,
রাজা কয়, সত্য কথা কও সুন্দরী করমু পিরতিকার।
উজানীনগরের রাজার বেটা নামেতে মৈনাক,
কয়, রাজা, এই সুন্দারী পত্নী যে আমার।
আর যত খ্যাহেন সব বন্ধু বান্ধব মোর,
বিনা বাধায় খ্যাশে ফেরবার দেন করি করজোড়।
রাজা কয়, কইন্যা তুমি কওত সঠিক,
এই লোক বইল্যাছে কি-না কোন্ বে-ঠিক।
সোনারপুরের রাজপুত্রে কয়; করি নিবেদন,
এই কইন্যা পত্নী আমার শুনেন গো রাজন্।
কাঞ্চনপুরের রাজার বেটা নামেত সাভার,
বলে, সুন্দারী এই রমণী পত্নী যে আমার।
লবণ রাজা কয়, কইন্যা এ-ত বিষম লেঠা,
চিন্তা কইর‍্যা বুঝতাছি, সব বেটাই ঠেঁটা।
সইত্য কইর‍্যা কওগো কইন্যা কে-বা তোমার পতি,
মোনে লয়, আমার হস্তে এই সগল তস্করের
ঘটবে বিষম দুর্গতি।
কইন্যা বলে, রাজা তুমি মোর বাক্য ধর,
মুই একখান প্রশ্ন করমু উয়াগেরে (৬৫) জবাব দিবার ডাক।
যে না অইবে আমার পতি মোর আগের
বার্তা কউক(৬৬),
মিথ্যা কথা কইলে পরে কারাগারে যাউক।
রাজা কয়, কইন্যা মুই বুঝিলাম সার,
সত্য কথা প্রচার অইবেই এবার।

(৬৪) নিকটে। (৬৫) উহা দিগকে। (৬৬) বলুক,

একে একে রাজপুত্র সগল আসিল বলিতে,
তাগের (৬৭) কথা শুন্যারে কইন্যা, মিথ্যা বইল্যা হাঁকে।
একে একে গ্যাল মাস, দিন ও বচ্ছর,
রাজপুত্রেরা সব বন্দী অইলো অনন্তর।
ইদিগেতে রাজপুরীর চিলা কোঠায় থাহে যে রাজকইন্যা,
আদরের শুকপঙ্খীরে ঘিরা কান্দে রইয়া রইয়া।
(হারে) কী দিয়া গঠিলরে বিধি আমারি জীবন,
কূল নাই কিনারা নাই দুঃখের নিকটে মরণ।
(রে বিধি কী দিয়া গঠিল আমারি জীবন)॥
আইলোরে গ্রীষ্মের মাস, কাননে পাকা ফল,
বন্ধুরে হারাইয়া মোর জনম বৈফল।
বাইষ্যা কালে আইলো পানী ডোবলো মাঠ ঘাট,
ভরা গাঙের জোয়ার দেইখ্যা কইন্যার পরাণ করে ফাৎ ফাৎ।
শরৎকালে ফোটলো ফুল কাশিয়ার শোভা কত,
আড়ং-এ (৬৮) মাতলো ছেলিয়া বুড়া মুনিষ্যি শতে শত।
হেমন্তের আলগা শীতে কইন্যার গায়ে নাইরে কাঁথা,
এ-হেন সুন্দইর্যা রাইতে কইন্যার না বোজে চৌখের পাতা।
শীতের দিনে পাটালী গুড় আর খাওনের সোয়াদ কত,
বন্ধুর তল্লাসে মন মোর ফেরে বেবাজিয়ার মত।
শীত যাইয়া বসন্ত আইলোরে ডালে ডাকে কুকিলা,
বন্ধুরে হারাইয়া মুই নিশি জাগি একেলা।
(রে বন্ধু নিশি জাগি একেলা॥)
(হারে) এই মতন না কাইন্দা কাইন্দা কইন্যা চৌক্ষু করে লাল,
ক্ষেণেক ভূমেতে শোয় ক্ষেণেক কপালেরে পাড়ে গাইল।
সাত পাঁচ ভাইব্যা কইন্যায় এক পত্তর যে লিখিল,
পত্তর লেইখ্যা শুক পঙ্খীর পায়েতে বান্ধিল।

---

(৬৭) তাহাদের (৬৮) মেলা — উৎসবের আনন্দ

পত্তর লইয়্যা ওড়েরে পঙ্খী ছাশ না অইতে বিত্থাশ.
নানান রাইজ্য ঘুইর‍্যা পঙ্খী না পায় তার তল্লাস।
হারে কী কথা শুনালি রে ওরে রে পোষা শুকপঙ্খী,
তুই যদি না দিবিরে খবর কে অইবে মোর সঙ্গী।
আরে ও পঙ্খী উইড়্যা যাওরে আমার না বন্ধুর ছাশে,
কইবা আমার বন্ধুর কাছে, বন্ধু মোর আসে কি না আসে।
(হারে) বন্ধুর লইগ্যা আমি যে গো জীয়স্তে তে মরা,
কি-বা দোষে করলা বন্ধু আমায় কপাল পোড়া।
ভাত না ব্যাঞ্জন না রে বন্ধু যে ফির‍্যা ফির‍্যা রান্ধিব,
পরাণের পরাণ বন্ধু পরাণে রাখিব।
(রে বন্ধু পরাণে রাখিব।)
হইতো যদি কলসীর জলরে বন্ধু ফির‍্যা ফির‍্যা ভরতাম,
ওষ্ঠেতে ওষ্ঠ চাইপ্যা বন্ধু মনের কথা কইতাম।
(বন্ধু রে)।
এদিগেতে সোনালতার গুণে মুগ্ধ অইলো শঙ্খনাথ,
মুখে কিন্তু রা নাই, না করে কোন বাত।
সোনালতা কয়, কুমার কও কথা, কিবা তোমার ব্যাথা,
আর যদি না কও কথা খাইও আমার মাথা।
কুমার কয়, সোনালতা, সে কথা কইবার নয়,
দুষ্টজনার ফেরেবাজীতে মানলাম পরাজয়।
এই না কথা কইয়্যারে কুমার নিস্তব্ধ অইলে,
সেইও কালে বিরিক্ষির ডালে এক পঙ্খীর দেখা মেলে।
সুন্দার এক না পঙ্খী দেইখ্যা কইন্যা আদরের হস্ত বাড়ায়,
গাছের থিকা ফাল(৬৯)দিয়া পঙ্খী কুমারের কুলেতে(৭০) যায়।
চেনা শুকপঙ্খীরে দেইখ্যা কুমার হের পায়ের দিকে চায়,
পায়ের লগে আটক পত্তর(৭১) এক দেখিবারে পায়।

(৬৯) লাফ দিয়া (৭০) কোলে — ক্রোড়ে, (৭১) পত্র — চিঠি

পত্তর খুইল্যা পড়ে কুমার একইনা নিঃশ্বাসে,
কী-জানি কী লেইখ্যা ছিল সেইও পত্রের গাত্রে।
সোনালতা কয়, বন্ধু, এ ক্যামুন ব্যাভার,
অমন সোন্দর পঙ্খীডারে উড়াইলা এবার।
কুমার কয়, শোন ওগো অধীরা সুন্দরী,
এই না পঙ্খী পাঠাইয়্যা ছিল ক্যাশবতী রাজকুমারী।
তুমি যদি সহায় হও কইন্যা দ্যাও দ্যাখাইয়্যা পথ,
লবণ রাজার রাইজ্যে যাইতে না কইরো দ্বিমত।
সোনালতা কয়, বন্ধু, এ জীবন সঁইপ্যা দিছি তোমারি উপার,
তোমার লইগ্যা মরণেরেও তুচ্ছ করি জাইন্যো সোমাচার।
বন্ধু তুমি যাইবা নিজ দ্যাশে পাবা ফিরাা ক্যাশবতী কইন্যায়,
তোমার আশায় রইমু বইয়্যা এই বিজন নিরালায়।
এই না কথা কইয়্যারে কইন্যা তহন গোছন গাছন করে,
কুমাররে জাইল্যা বানাইয়্যা ডিঙা নৌকা ছাড়ে।
(হারে) ও গহীন গাঙের নাইয়্যা কোন্ বা দ্যাশে বাইয়্যা যাওরে নীল সমুদ্দুর দিয়া।
(হারে) বাইয়্যা চলে ডিঙ্গি নাও দিনে রাইতে ধইর‍্যা,
কতনা দ্যাশ পার হইয়্যা পৌঁছাইলো লবণ দ্যাশে গিয়া।
(হারে) লবণ রাজার পুরী য্যামুন সুবন্নেবই চূড়া,
শ্যাত পাথরের দালান কোডা জমিনের পর খাড়া।
(অগো) ষোলশো সেপাই ঘোরে খুইল্যা তলুয়ার,
মশা মাছি সেঁদাইলেও করে ছারখার।
(হারে) ইদিগেতে লবণ রাজায় জিগাইলো(৭২) কইন্যায়,
অনেকদিনত অইলো গত এইবার এটটা বিহিত (৭৩) করন যায়।

---

(৭২) জিজ্ঞাসা করিল (৭৩) ব্যবস্থা।

এই না বইল্যারে রাজা হাটে দিল ঢোল,
সঠিক পরিচয় দিলে কইন্যার পাবে কইন্যায়
আর রত্তন সগ্গল।
হারে ঢোলের বাইদ্য শুইন্যা কেউবা আইলো কইবারে,
মিছা কথা কইয়্যা কেউবা গ্যাল কারাগারে।
লবণদ্যাশে আইয়্যা কুমার কয়, সোনালতা,
এ তো বিষম কাণ্ড অইলো না শুনি হেন বারতা।
সোনালতা কয়, বন্ধু, তুমি না চিন্তিও অধিক,
মাউছানী সাজিয়া খবর মুই অনিমু সঠিক।
এই না বইল্যা কইন্যা তহন মাছের পসরা নিল মাথে,
'ভাল ভাল মাছ আছে' বইল্যা কইন্যায় ঢোকে রাজপুরীর
মইধ্যে।
(হারে) মাউছানী (৭৪) আইয়্যা অন্দরে উঠানের ধূলা নিল মাথায়,
সগ্গল নারী হাইস্যা কয়, মাউছানী, কী
আনছস্ তোর ঝোরায়।
মাউছানী হাইস্যা কয়, আইন্যাছি এক নূতান মৎস,
চিন্যা নিতে পারলে মুই বেচিব অবশ্য।
এই না বইল্যারে কইন্যা তহন মাছের ঝুড়ি খোলে,
ঝুড়ির থিকা মাছের বদলা এক শঙ্খ বাইর করে।
'মাছ কই শঙ্খ বোঝাই' সগল নারী কয়,
মাউছানী কয়, শঙ্খনাথ মাছ ইহাতো জানিও নিচ্চয়।
আজব কথা শুইন্যা তহন এ উয়ারে কয়,
মাউছানীর মাথায় গণ্ডগোল তো নিচ্চয়।
শঙ্খনাথ শঙ্খনাথ বইল্যা কইন্যা ঘন ঘন ডাকে,
এই না নাম শুইন্যা এক নারী নিকটেতে আইসে।

---

(৭৪) মেছুনী = জেলেনী।

সুমুখখানে আইয়্যা এক নারী কয় চুপিসারে,
হাচা(৭৫) কথা কওনা শুনি কী আছে তোর মোনে।
সুযোগ বুইঝ্যা মাউছানী তহন হাতের আঙ্গুট (৭৬) দেহায়,
শঙ্খনাথের আঙ্গুট দেইখ্যা নারী করে হায় হায়।
হাইস্যা কয় সোনালতা, বুঝিলাম সার,
আইজ সইন্ধ্যায় (৭৭) আইমু মুই বাগানের ভিতার।
দিনগ্যাল হ্যালেফ্যালে (৭৮) আইলো কালী(৭৯) সইন্ধ্যা,
দুইও জনে কয় কথা একস্তর (৮০) হইয়্যা।
ক্যাশবতী কয় কথা সমুদায় বিত্তান্ত,
জন্ম থিকা আইজতক বলে আত্তপান্ত। (৮১)
শুইন্যা সেই সগ্গল কথা শঙ্খ যাত্রা করে,
রাজ সভাতে আইয়্যা কুমার জোড়ে ঘণ্টা নাড়ে।
ঘণ্টাবাইদ্য শুইন্যা না প্রহরী তহন কয়,
কী বা কামে (৮২) আইছো হেথায় কওতো মশায়।
কুমার কয়, রাজদর্শনে মন কইর‍্যাছি অভিলাষ,
মহারাজের ঠাঁই কইমু বার্তা জানি যা বিশ্বাষ।
কুমারের বাক্য নিয়া প্রতিহারী রাজার কাছে যায়,
এক মর্দ (৮৩) আপনার লগে দেখা করবার চায়।
রাজা কয়, লইয়্যা আইসো এইহানে তানারে,
আমার সঙ্কল্প তারে কইও বারে বারে।
রাজার আদেশ পাইয়্যা কুমার সভার মইধ্যে আয়,
দেইখ্যা তার চান্দবদন রাজা হেরে(৮৪) গৈরবে (৮৫) বসায়।
কুমার কয়, আপনারডে গচ্ছিত আছে নাকি ক্যাশবতী কইন্যা,
সগ্গের অপ্সরী সে-যে রূপে গুণে ধইন্যা।

---

(৭৫) সত্য কথা (৭৬) আংটি (৭৭) সন্ধ্যাকালে (৭৮) অবহেলায়
(৭৯) ঘোর অন্ধকারে (৮০) একত্রে (৮১) সম্পূর্ণ কাহিনী। (৮২) কাজে কর্মে
(৮৩) যুবা পুরুষ (৮৪) তাহাকে (৮৫) সম্মানের সহিত।

হেইনা কইন্যার পূর্ব কথা মুই কইমু সমুদয়,
হেরেও আগে রাজসভাতে আনেন
কইন্যা আর বন্দী সমুদায়।
রাজার আদেশে সভায় আইলো সগ্‌গলে,
কুমার তহন কয় কথা অতি ধীরে ধীরে।
কুমার কয়, রূপনগরের রাজার নাম অশ্বপতি হয়,
একই মাত্র সন্তান তার ক্যাশবতী হয়।
রাজার জীয়ন্তকালে কইন্যার বিয়া নাহি হয়,
রাজা হইয়্যা সেই রাজ্যের কন্যা রাজত্ব চালায়।
এই যে ক্যাশবতী কইন্যা যার রূপকুমারী নাম,
ছ্যাশ বিদ্যাশে বার্তা দিয়া করল কোন্ বা কাম।
পাশা খেলায় হারাইতে পারলে সে পাবে
রাজত্ব আর রাজকইন্যা,
হাইর‍্যা গ্যালে সেইও মুনিষ্যে থাকবে
হের কেনা গোলাম অইয়্যা।
এই যে হগল রাজার পুত্তুর ছ্যাখবার যেই পারেন,
সগ্‌গলেই কিন্তু উয়ার মাইন্দালী (৮৬) কাম করেন।
কুমার কয়, হাচা (৮৭) কথা পেত্যয় (৮৮) যদি না অয়,
খুইল্যা ছ্যাহেন উয়াগের বস্তরের তলায়।
কইলকা পোড়া ছাপ্পা ছ্যাখতে পাবেনই নিচ্চয়॥
অনেক দিন অইলো গত, কইন্যার বিয়া নাই অয়,
সেইও কালে শঙ্খনাথ নামে আইলো এক মহাশয়।
শঙ্খনাথের হস্তে কইন্যায় হারল পাশা খেলা,
হাইর‍্যা গিয়া হের গলায় কইন্যা দিল বরণ মালা।
সেইও শঙ্কনাথ তহন ইস্তিরি (৮৯) নিয়া স্বদেশ যাত্রা করে,
কীরপা কইরা গোলাম রাজপুত্রগে সঙ্গে নিয়া চলে।

(৮৬) নফর চাকর। (৮৭) সত্য কথা (৮৮) বিশ্বাস (৮৯) স্ত্রী

শঙ্খনাথের ভাইগ্য দেইখ্যা উয়ারা বুদ্ধি করে,
এক নিশৈতে খেলার ছলে উয়ারে পানীত (২০) ঠেলা মারে।
(হারে) পানীত ফ্যালাইয়্যা কুমারে তহন নিজেরা কোন্দল করে,
কে-বা নেবে এই কইন্যায় আর,
কেউবা বেসাতি লইয়্যা কাড়াকাড়ি করে।
(হারে) এইও সময় রূপকুমারী পত্তর একখান লেইখ্যা,
শুকপক্ষীর পায়ে তারে দিল যে বাইন্ধ্যা।
উড়াল দিয়া আইলো পক্ষী এইনা সেই ঠাঁই,
বাকী কথা স্মরণ করেন পেন্নাম জানাই।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত দিলাম করেন প্রীতিকার,
দোষীর দণ্ড দিয়া রাজা এবার বিদায় দ্যান আমার।
বন্দীগের বস্তর তুইল্যা রাজা যাচাই করে কুমারের বারতা,
যথার্থ পরমান পাইয়্যা রাজা বলে,
এইবার কহেন তো আপনার কথা।
কুমার কয়, সেই শঙ্খনাথ মুই রাজার কুমার,
ওই সুন্দারী রূপকুমারী পত্নী যে আমার।
রাজা কয়, কও কথা কইন্যা তোমার কী আছে বক্তব্য,
ক্যাশবতী বলে, পিতা আপনার বিচারে মুই
হইলাম কীতাথ।
কুমার কয়, কইন্যা তোমায় ফিরা পাইলাম
সোনালতার দয়ায়,
দ্যাশে ফেরনের কালে কিন্তু উয়ারে সঙ্গে নেওন চাই।
কইন্যা বলে, কুমার, তয় বিলম্ব আর ক্যান,
স্বদেশে যাত্রার যোগাড় তুমি করনা এহন।
এই না বইল্যা দুইজনে তহন নায়ের দিকে ধায়,
চাইয়্যা দ্যাহে ডিঙি বাইয়্যা সোনালতা যায়।

(২০) জলে।

সোনালতা ফিরায়া আইস বন্ধুগো আমার,
তোমারে লইমু সাথে না করমু ভিন্ন ব্যাবহার।
(হারে) সুতের টানে ডিঙানাও চলে পবন বেগে,
দূরের থিকা কয় কইন্যায় কান্দনে বুক ফাটে।
সোনালতা কয়, কুমার না ডাকিও আর,
তোমার কথা মোনে লইয়া রইমু জীবন ভর।
তুমি সুখী হইও বন্ধুরে এই কথা যেন হয় খাঁটি, (৯১)
চান্দর, সুরয, মা বসুমতী থাকে যেন মোর সাক্ষী।
না ডাইক্যো না ডাইক্যো কুমার ভুইল্যা যাইও মোরে,
মোর বুইন ক্যাশবতী থাহে যেন সে সুখে।
ক্যাশবতী কয়, বুইন, না কর অভিমান,
ফিরয়া আইস্যা আমার লগে করহ প্রয়াণ।
দূরের থিকা কইন্যা বলে, দিদি তোমার চরণে মোর
শতেক পরণাম,
দুইও জনায় থাইক্যো সুখে হেইলেই পোরবে
মোর মনস্কাম।
এই কথা না কইয়া কইন্যার নাও চৌক্ষের আড়াল অয়,
বদর বদর ডাক ছাইড়া কাণ্ডারী বজরা খুল্যা দেয়।
(হারে) চলেরে ময়ুরপঙ্খী গাঙের উপার দিয়া,
নীলজল, সাদাজল কাটাইয়া নাও চলে ধাইয়া ধাইয়া।
(হারে) ঝামুর ঝুমুর বাইগু বাজে বাজে মনোলোভা,
অবাক হইয়া চায় কইন্যা দেইখ্যা রাজপুরীর শোভা।
নাচে গায় রঙ্গ করে যত প্রীতিবাসী,
ক্যাশবতী রূপকুমারীর মুখে ফোটলো মধুর হাসি।
হায়, হায়রে আমি এইহানেতে পরস্তাব সাঙ্গ করি,
জয়, জয় বইল্যা সবে কর জয়ধ্বনি।

(৯১) ঠিক সত্য।

॥ আলোচনা ॥

আলোচ্য গাথাটি অনেকটা রূপ-কথা ধর্মী। এটিকে আমি সংগ্রহ করি ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ ঘাটের (অধুনা বাংলাদেশ) এক হোটেলের পাচক ঢাকা জেলার আরিচা গ্রাম নিবাসী মহেন্দ্রনাথ মালাকারের কাছ থেকে। এর রচয়িতার নাম সঠিক ভাবে সে বলতে পারেনি। পরে, ফরিদপুর ও বরিশালের কয়েক জায়গায় এ নিয়ে খোঁজ করে এই রকমই দু'তিনটি কাহিনী শুনেছি। তবে কোনটাই হুবহু এই গাথাটির সঙ্গে এক নয়। বিশেষকরে ফরিদপুর জেলার মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত ডোমরাকান্দি গ্রাম নিবাসী ৺কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে অনুরূপ একটি কাহিনী শুনেছিলাম। তার ভিতর কিছু কিছু গানেরও সন্ধান মেলে। ঐ গানগুলির সঙ্গে আলোচ্য গীতিকায় সংগৃহীত গান (কবিতা) গুলির অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

যেমন, যেখানে রাজপুত্রের (ফরিদপুরে সংগৃহীত কাহিনীতে রাজপুত্র বা রাজকন্যার কোনও নাম ছিলনা) সপ্ত ডিঙা মধুকর জলের তলায় তলিয়ে গেল, রাজপুত্র কোন গতিকে ভাঙ্গা মাস্তুল ধরে জলের উপর দিয়ে ভেসে চলতে চলতে গান ধরল :—

'হারে বিধি একি আমার করমেরি লেখা
বঁধুর লইগ্যা হইলাম সারা
... ...
হেরও লইগ্যা আমার যেগো
বে-ঘোরে পরাণ গ্যাল।”

এই একই গান ফরিদপুর জেলায় প্রচলিত কাহিনীটির ভিতরও বর্তমান।

তবে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে বৈসাদৃশ্যও বড় কম নেই। সবচাইতে যেটা বড় বৈসাদৃশ্য সেটা হ'ল এই অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনীটির ভিতর "সোনালতা"র কাহিনীটি সম্পুর্ণভাবে অনুপস্থিত। সেখানে বলেছে—...রাজপুত্র নদীতে পড়ে যাবার পর গঙ্গাদেবীর স্তব শুরু করে।

গঙ্গাদেবীর কৃপায়ই রাজপুত্র নদীর পাড়ে এসে পৌছায়। সেখানে এক গৃহস্থ বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কেশবতী ও শঠ ছয় রাজপুত্র সেই দেশের রাজা কর্তৃক বন্দী হয়ে রয়েছে। রাজপুত্র রাজার ঘোষণা অনুযায়ী নিজেই রাজদরবারে গিয়ে নিজের ও রাজকন্যার পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করে রাজকন্যা ও ধনদৌলত নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে···।”

এ ছাড়াও “লবণ” রাজার নাম কোথাও পাওয়া যায়না। তার পরিবর্তে “সেই দেশে রাজা”-এই রকম বলা হয়েছে।

এ ছাড়া আর কোনও গানের সঙ্গেও মিল পাওয়া যায়না।

কিন্তু বরিশালের কাহিনীতে কিছু কিছু গান থাকলেও এর সঙ্গে বিশেষ মিল নেই। সব চেয়ে যেটা বিস্ময়কর সেটা হ'ল, এখানে জেলিয়া নন্দিনী “সোনালতা”র নাম না থাকলেও তার উপস্থিতি রয়েছে। এমন কি রাজপুত্র দেশে ফেরার সময় এই ধীবর কন্যাকেও অন্যতম পত্নী হিসেবে নিজের দেশে নিয়ে গেল।

অবশ্য এই “কেশবতীকন্যার” কাহিনী পূর্ববঙ্গের আরও কয়েকটি জেলা যথা—কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহেও প্রচলিত। তবে তার সঙ্গে এই গাথার বিশেষ কোনও মিল নেই, সে কারণে সেগুলির সঙ্গে এর কোন তুলনা করলাম না।

কাজেই এর প্রকৃত রচয়িতা যে কে, সে-কথা হলফ করে বলা মুস্কিল। অবশ্য এ-নিয়ে কেউ দাবীও তোলেনি। তা'হলে এইবার প্রশ্ন আসে, এ-টির রচনা স্থান কোথায়? ফরিদপুর না ঢাকায়?

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ফরিদপুরে প্রচলিত কাহিনীটির সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য কোথায় এবং মাত্র একটি গান ছাড়া আর কোনও গানেরই (ফরিদপুরে প্রচলিত কাহিনীটির ভিতর খুব বেশী গানও নেই) মিল নেই। বরিশালের ত' কথাই নেই। সেখানকার প্রচলিত কাহিনীটির ভিতর একটি গানের (মোটে দুটি গান রয়েছে, তাও অতি ক্ষুদ্র) সঙ্গেও এর মিল নেই।

তা'ছাড়া সংগৃহীত গাথাটির কথায় যতটা ফরিদপুরের টান রয়েছে তার চাইতে বেশী রয়েছে ঢাকার টান। এ ছাড়া ফরিদপুরের "গোয়ালন্দ ঘাট" আর ঢাকার "আড়িচা" স্টেশনের মাঝে রয়েছে পদ্মানদী। অড়িচা ঘাট স্টিমার স্টেশন যেমনি ঢাকার সীমান্তবর্তী অঞ্চল, তেমনি গোয়ালন্দ ঘাট স্টিমার স্টেশনও হ'ল ফরিদপুর জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। বলাবাহুল্য লোক সংগীতের মত দুই সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাব, ভাষা, কথা ও কাহিনী প্রায় একই থাকে। সর্বদাই এক অঞ্চলের লোক অপর অঞ্চলে যাতায়াত করে থাকে। তাই, মনে করা সঙ্গত—এই 'লম্বাগীত'বা 'লোক-গীত-কথা'টি আদতে ঢাকারই কোন একজন বা একাধিক লোক-কবির রচিত যা কালক্রমে এ পাড়ে অর্থাৎ ফরিদপুর জেলায় এসে পেঁাছেছে ওখানকারই কোন একজন বা একাধিক লোকের সহায়তায়।

যে হেতু মহেন্দ্র মালাকার নিজে ছিলেন ঢাকা জেলার অধিবাসী এবং এই গাথাটির প্রায় সবটাই তার মুখ থেকেই শোনা, সেই হেতু এটিকে ঢাকা জেলারই প্রচলিত একটি লোক-গীত-কথা বলতে বাধে না।

॥ রূপধন কইন্যা ॥

—কাহিনী—

ইলিমপুরের আঁটকুড়ো রাজা চান্দকরের আর সন্তান হয় না। এই সময় তার মন্ত্রীর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করল। তার নাম রাখা হল রূপধন। রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি তার কোনো পুত্র সন্তান হয়, তা'হলে তার সঙ্গে এই মন্ত্রী কন্যা রূপধনের বিয়ে দেবেন।

বারো বছর পর সত্যি সত্যিই আঁটকুড়ো রাজার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। নাম রাখা হল 'রহিম'।

রাজা মন্ত্রীকে সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মন্ত্রীত'মহা ভাবনায় পড়লেন,—এই আঁতুড়ে ছেলের সঙ্গে কী করে তার বারো বছরের সমর্থ মেয়ের বিয়ে দেবেন?

কিন্তু রাজা কিছুতেই মন্ত্রীর সে কথা শুনতে চাইলেন না। রাজপুত্র রহিমের ঠিক আড়াই দিন বয়সের সময় বারো বছরের রূপধনের বিয়ে হয়ে গেল।

রূপধন দেখল, এ যে-রকম উল্টো রাজার দেশ, এখানে কখন কি হয় বলা যায় না। তা'ছাড়া তার কোলে যদি কেউ এই কচি শিশু দেখে, তা হলে নানান জনে নানান কথা বলাবলি করবে, তার চাইতে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে স্বামীকে বয়স্ক করে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে আসাই ভাল—এই ভেবে রূপধন সেই বিয়ের রাত্রেই আড়াই দিনের শিশু-স্বামীকে বুকে নিয়ে এক অনির্দেশের পথে যাত্রা করে।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? লোক-চক্ষুর আড়ালে আড়ালে শিশু-স্বামীকে নিয়ে সে এ-গাঁ ছেড়ে আরেক গাঁয়ে গিয়ে পথে পেল এক মালিনীর বাড়ি।

মালিনীর বাগানে অনেকদিন ধরে কোন ফুল ফোটেনা। রূপধন শিশু-স্বামীকে বুকে করে এসে আশ্রয় নিল সেই মালিনীর বাগানের চাঁপা গাছতলায়।

মালিনী বাগানের দিকে তাকিয়েত' অবাক! এতো ফুলতো আজ বহুদিন তার বাগানে ফোটে না। তা হলে? খুঁজে দেখে চাঁপা গাছতলায় বসে রয়েছে রূপধন আর তার শিশু-স্বামী রহিম।

রূপধন সব কথা খুলে বলে মালিনীর কাছে। তাকে সেইসময় থেকেই ডাকতে শুরু করল 'মালিনী-মাসী' বলে। বলল, মাসী, ওকে তোমার হাতে দিলাম, ওকে তুমি মানুষ করে তোল। ও বড় হলে প'র আমার পরিচয় দিও। এর আগে নয়।

মালিনী সেই থেকে রহিমকে মানুষ করতে থাকে।

রূপধন সব সময়েই থাকে কুমারের চোখের আড়ালে আড়ালে। দূর থেকেই সব কিছুর তত্ত্ব-তালাস করে, আর অবসর সময়ে বাস করে চাঁপাগাছ তলায়।

ক্রমে রহিমের বয়স হয় সাত। রূপধনের অনুরোধে মালিনী রহিমকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিল। দেখতে দেখতে রহিমের বয়স হ'ল ষোল। রূপধনের এখন আঠাশ। রহিম এদিকে অল্পসময় মধ্যেই গুরুর সব-বিদ্যেই আয়ত্ব করে ফেল্‌ল। এতে গুরুর হ'ল মহা আক্রোশ রহিমের উপর।

একদিন পাঠশালায় পড়তে গিয়েছে রহিম, গুরুমশাই যাদুমন্ত্র বলে তাকে পাঁঠায় রূপান্তরিত করে ফেলল। মনে মনে স্থির করল, পরদিন তাকে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে ফেলবে কসাইদের কাছে।

এদিকে মালিনী রোজকার মত রহিমকে পাঠশালা থেকে আনতে এসে সেই ঘরের বেড়ার ফাঁকা দিয়ে সব দেখে শুনে ত' তার আক্কেল-গুড়ুম। দৌড়ে ঘরে ফিরে এসে সব কথা খুলে বলে রূপধনের কাছে।

রূপধন পাগল হয়ে উঠলো এ খবর শুনে। তক্ষুণি মালিনীকে মোটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিল সেই পাঁঠাটাকেই কিনে আনতে।

মালিনী সেই পাঁঠারূপী রহিমকে রূপধনের কাছে এনে হাজির করলে রূপধন নিজে যে কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানত, সেইসব মন্ত্রবলে রহিমকে আবার মানুষ করে তুললো।

রহিম মানুষের দেহ ফিরে পেয়েই মালিনী মাসীকে বলে উঠলো, মাসী, আজ তোমার দয়াতেই আবার আমার মানুষ জন্ম ফিরে পেলাম।

মালিনী বলে, না বাবা, আমার দয়ায় নয়, সে অন্য লোক।

—অন্য লোক, কে সে?

সে, তোমার স্ত্রী, ঐ চাঁপা গাছতলায় লুকিয়ে বসে আছে।

রহিম ছুটে গেল চাঁপা গাছতলায়। আনন্দাশ্রুর সঙ্গে এতদিন পরে সত্যিকারের মিলন হ'ল স্বামী-স্ত্রীর।

বাসর ঘর। আজ পরম সুখে ও শান্তিতে শুয়ে আছে দু'জনে। কিন্তু সুখ বোধ হয় ওদের কপালে নেই। এদিকে সেই শয়তান গুরুমশাই জানতে পেরেছে, রহিম আবার মানুষ হয়েছে। রহিম বেঁচে থাকলে তার আর গুরুগিরি চলবেনা। কারণ, রহিম ইতিমধ্যেই গুরুর সব বিদ্যে শিখে ফেলেছে। তাই যে করেই হ'ক, তাকে এ-পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেই হবে। মনে মনে এই রকম একটা সঙ্কল্প করে নিয়ে ক'জন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ছুটে এলো রহিমকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই খুন করে ফেলতে।

রূপধনের ঘুম খুব সতর্ক। সে ভবিষ্যৎ বিপদের আভাষ পেয়েই চট্‌করে গুরুমশাইরই আনা ঘোড়াতে চেপে স্বামী সহ রওনা দিল আবার এক অনির্দেশের পানে। সঙ্গে সঙ্গে গুরুও ধাওয়া করল ওদের পিছু পিছু।

রূপধনের ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। ছোটার যেন আর বিরাম নেই। এদিকে ক্ষিধেয় কাতর হয়ে পড়েছে কুমার। সামনেই দেখা গেল একখানা বাড়ি।

রূপধন স্বামী সহ এসে আশ্রয় নিল সেই বাড়িতেই। কিন্তু তারা জানতনা ওটা ছিল এক ডাকাতের বাড়ি। সেই বাড়ির বুড়ির সাত

ছেলে ডাকাতী করতে বেরিয়ে গেছে। বুড়ি ঠিক করল, যতক্ষণ না তার ছেলেরা ফেরে ততক্ষণ এদের যে-কোন কৌশলে আটকে রাখবে। তাই এদের রান্নার জন্য এনে দিল কতগুলি ভিজে কাঠ আর শক্ত মাস-কলাইর ডাল। বুড়ি মনে মনে ভাবল, এরা খুব সহজে এই ভিজে কাঠ দিয়ে উনুন ধরিয়ে ওই লোহার মত শক্ত মাসকলাই সিদ্ধ করে খাবার তৈরী করতে পারবে না, ততক্ষণে তার ছেলেরাও এসে পড়বে।

কিন্তু রূপধন কৌশলে বুড়ির মতলব বুঝতে পেরে নিজের জানিত মন্ত্রবলে খুব তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না শেষ করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে বুড়ির কাছে গিয়ে বিদায় চাইলো।

বুড়ি দেখলো, তার সব জারিজুরিই ভেস্তে গেল। তাই করল কি, কৌশলে রাজপুত্রের ঘোড়ার গলায় বেঁধে দিল এক থলিয়া মন্ত্রপূত সরিষা—যাতে ঘোড়া যেখানেই যাক, সেই পথে পথে সরষের বীজ পড়তে পড়তে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে উঠবে সরষে গাছ। ছেলেরা ফিরে এলে সেই সরষে গাছের নিশানা ধরে ধরে ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। আর ওরা রওনা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে লাগিয়ে দিল আগুন। দূর থেকে ডাকাতরা নিজেদের ঘরের বিপদ বুঝতে পেরে তক্ষুণি ছুটে চলে এল বাড়িতে।

বুড়ির কাছে সব শুনে নিয়ে ডাকাতরাও সেই মুহূর্তেই সরষে গাছের নিশানা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে রাজপুত্র রহিম তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা, অথচ এই নিঝুম বনের ভিতর কোথাও জলের চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না।

রূপধন বাধ্য হয়েই কুমারকে সেইখানে বসিয়ে রেখে নিজে গেল জলের সন্ধানে। ইতিমধ্যে সেখানে এসে পৌঁছল ডাকাত দল।

ডাকাতদের দেখে রহিম তো ভয়েই অস্থির।

ডাকাতরা মুখে কোন কথা না বলে এক কোপে কেটে ফেলল রহিমকে। তারপর, তার দেহ তল্লাশি করে খুঁজে পেল দুটি থলিয়া। একটিতে রয়েছে মণিমাণিক্য অপরটিতে একখণ্ড পাথর।

তারা মণিমাণিক্যের থলিটা নিয়ে পাথরের থলিটাকে ফেলে রেখে চলে গেল।

রূপধন জল নিয়ে ফিরে এসে রহিমের এই অবস্থা দেখেতো তার চক্ষু স্থির! এবার আর বুঝি তার স্বামীকে বাঁচাবার কোনো পথই নেই। তাই শুরু করে বিলাপ।

এদিকে স্বর্গলোক হতে হর-গৌরী মর্ত্য ভ্রমণে বের হয়েছেন। পার্বতীর কানে গিয়ে পৌছয় রূপধনের এই করুণ কান্না।

পার্বতী মহাদেবকে অনেক অনুনয় বিনয় করে নিয়ে এলেন সেখানে।

প্রথমটায় মহাদেবতো কিছুতেই রাজী নন। অনেকক্ষণ পর পার্বতীর একান্ত অনুরোধে প্রাণদান করলেন রহিমের।

রহিমতো চোখ খুলেই দেখে সামনে বসে রয়েছে তার পরমা সতী সাধ্বী স্ত্রী—রূপধন। বলে, রূপধন, তুমি সত্যিই সতী নারী, তাই তোমার দয়ায়ই আজ আবার ফিরে পেলাম আমার জীবন।

কিন্তু হলে হবে কি? ওদের বরাতের দুঃখ তখনও দূর হয়নি। রহিম যখন প্রাণ ফিরে পেয়ে রূপধনের সঙ্গে কথা বলছে ততক্ষণে শয়তান গুরু এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। এসেই এক বিকট অট্টহাস্য করে ডাকিণী-মন্ত্র বলে কবুতর (কপোত) বানিয়ে ফেলল রহিমকে।

রূপধন কান্নাকাটি শুরু করে। করজোড়ে পতিকে মানুষে পরিণত করে দিতে বলে। কিন্তু দুশ্চরিত্র গুরু জবাবে বলে, ওতো 'কবুতর' হয়ে গেছে, ওর জন্য আর কান্নাকাটি করে কী হবে? তার চাইতে তুমি চলো আমার ঘরে রাজরানীর মত থাকবে।

রূপধন কাতর কণ্ঠে বলে, তুমি আমার স্বামীর গুরু, আমার পিতার সমান, আমি তোমার কন্যা। আমাকে এ-রকম কথা বলা তোমার অন্যায়, তুমি দয়া করে আমার পতির প্রাণ ভিক্ষা দাও—আমি আর কিছু চাইনা।

রূপধনের কাকুতি মিনতিতে গুরু এবার একটু নরম হল। বলল, মা, আমি মানুষকে পশু, পক্ষী বানাতে পারি, কিন্তু তাদের তো ফিরে আবার মানুষ করবার মন্ত্র আমার জানা নেই। তবে কথা দিচ্ছি, যদি তোমার স্বামী কোনমতে আবার মানুষ হয়, তবে আমি আর কোনদিনও তোমাদের পিছু ধাওয়া করব না বা কোন রকমে তোমাদের কোন ক্ষতি করবার চিন্তাও করব না, এই আমি চল্‌লাম—বলে সত্যি সত্যিই দুষ্ট গুরু ফিরে চলে গেল তার নিজ দেশে।

রূপধন চিন্তা করতে থাকে, এখন কী ভাবে আবার তার স্বামীকে মানুষ করা যায়। হঠাৎ কবুতর (পায়রাটা) বক্ বক্‌ম করে ডেকে উঠলো। ঠোঁট দিয়ে তার পায়ের কাছটায় ইসারায় দেখালো। রূপধন দেখে, তার পায়ের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটা ছোট থলে। তার মনে পড়ল, ঐ থলিয়াতেই তো রয়েছে তার সেই যাদু-পাথর! রূপধন যাদু-পাথরের গুণে স্বামীকে আবার মানুষ করে তুলল।

রূপধন বলে, রাজকুমার, চল এবার তোমার নিজ রাজ্যে। তুমি হলে ইলিমপুরের রাজকুমার, আর আমি হলাম ওই রাজ্যেরই মন্ত্রীকন্যা। তোমার বয়স যখন আড়াই দিনের, সেই সময় আমার বয়স ছিল বারো বছর। ওই সময়ই আমাদের বিয়ে হয়। অনেক কষ্টে এই পর্যন্ত তোমায় সামলে নিয়ে এসেছি, এইবার চলো তোমার পিতৃরাজ্যে।

রাজপুত্র ত' এ-কথা শুনে মহাখুশী।

এদিকে রাজপুরীর থেকে ঢোল শহরতে ঘোষণা করা হচ্ছে,—রাজপুত্র রহিম ও মন্ত্রীকন্যা রূপধনের যে সন্ধান দিতে পারবে, তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজপুত্র রহিম ও মন্ত্রীকন্যা রূপধন এগিয়ে এসে ঢেট্‌রার কাছে নিজেদের পরিচয় প্রদান করে। ইলিমপুরের রাজবাড়িতে আবার বইতে লাগল আনন্দের স্রোত।

রাজা ফিরে পেলেন তার হারানো পুত্র, আর মন্ত্রী তার কন্যাকে।

।। কাব্য ।।

—এক—

(অরে) জন্মদিনে কর্মলেখা মৃত্যুলেখা পায়,
যা লেইখ্যাছে দারুণ বিধি খণ্ডান যাবার নয়।
(হায়রে) ইলিমপুর শহরের রাজা নামে চান্দকর,
মন্ত্রীর সঙ্গেতে শোন প্রতিজ্ঞার খবর।
মন্ত্রীর হইয়াছে বেটি নামে রূপধন,
পুত্রহীন রাজার কিন্তু শান্ত নহে মন।
দ্বাদশ বচ্ছর গতে রাজার তখন,
রহিম নামেতে পুত্র দিল দরশন।
হারে ঢোল সানাই বাজে কত বাজে কাঁড়া নাকাড়া,
শোরগোল উঠলো কত আনন্দের ফোয়ারা।
জয় রাজপুত্রের জয় বলে প্রজাগণ,
শুনিয়া এসব ধ্বনি রাজা বলে মনে মন।
এদ্দিনে পূর্ণ হইল মোর মোনের যত আশা,
হাতীশালে হাতী মোর ঘোড়া শালে ঘোড়া।
লোক লশকর সিপাই মোর এতো কিছু আছিল,
তবু এই রাজপুরী শ্মশান হয়্যা আছিল।
মন্ত্রীকয়, মহারাজ, হই দণ্ডবোদ্,
রাজা কয় কাঁয় মন্ত্রী, আইসচেন শুন্যাছেন সোংবাদ।
ভগবানের দয়াত মোর একনা পুত্র ছাইলা হইচে,
মুঁই মরি গেইলে তাঁয় কইরবেন রাজা,
এইলা মনে লইচে।
যাউক মন্ত্রী এদ্দিনে ঘুঁচিল মোর আঁটকুড়া নাম,
মানষী আর না কবার পারবে
দিনটা খারাপ গেইল দেখি উয়ার মুখ।

মন্ত্রীকয়, হাচা কথা যা কইচেন মহারাজ,
ভগবানের দয়াত রাজা-পেরজা
রাজ্যের সগার পাপ খণ্ডণ হইল্ আজ।
রাজা কয়, মনে পইল্ একনা ভাল্ কাথা,
মনে নি আছে সেই প্রতিজ্ঞার কাথা?
একদিন দোনো জনে ভগবানোক সাক্ষী করি,
কর‍্যাছি যে প্রতিজ্ঞা,
তোমার হইল বেটী আর মোর বেটা ছাওয়া,
দোনোজনায় দিমো বিয়া।
মন্ত্রী কয়, মনে আছে সেই প্রতিজ্ঞা মহারাজ,
কিন্তুক তাক্‌তো নোয়ায় হবার আজ।
রাগ কর‍্যা কয় রাজা, হবার নোয়ায়,
একী কথা কইলেন মন্ত্রীমশায়,
এতদূর আস্পর্দা হইচে, মান হানি হয়্যা যাইবে,
তোমার বেটিক বিয়াও দিলে রাজার ছেইলার সতে?
মন্ত্রী কয়, হুজুর মা ও বাপ, রাইখলে রাইখার পারেন,
মাইরলে মাইরবার পারেন,
এই গোলাম ধন্য হইবে, মোর বেটীক বিয়াও দিলে
রাজ পুত্রের সথে।
কিন্তুক হুজুর দয়া করি কাথাডা একবার ভাবি দেইখবেন,
মোর বেটি আজ বার বছরের গাবুর[১] কইন্যা,
তার সতে কেমন করি বিয়াও হয়,
এই আতুর ঘরের ঝিনাইৎ করি দুধ খাওয়া ছওয়ার?
রাজা কয়, ভাবনা চিন্তা কইরবার সোমায় আর নাই,
ভগোবানোত সাক্ষী করি যে প্রতিজ্ঞা করছি
সে প্রতিজ্ঞা রাখায় চাই।

(১) যুবতী

আইজ, কাইল এই দুই দিন বাদে
ও দিনকা সকাল বেলা,
রাজপুত্রের বয়স অইবে আড়াই দিনের,
ঠিক সেই সময় বিয়াও দেওয়ার নাইগবে
তোমার কইন্যা বার বচ্ছরের।
এ কথার হইলে নড় চড় রাখবেন জানি
যাইবে গর্দান তোমার,
ঘর দুয়ার বাড়ি তোমার সউগ জ্বলে দিয়া
হইবে করা ছার খার।
এরপর জোর করি রাজপুত্রের বিয়াও দেওয়া হইবে
তোমার বেটীর সত।

মন্ত্রী কয়, হুজুর মোর মাও বাপ,
হুকুম যা করেন তাই ধর্ম থাক।
এদিকেতে বাড়িৎ যায়া মন্ত্রী কন্যার কাছে কয় সোমাচার,
বিধি আইজ হইলেরে বাম কপালে তোমার।
রূপধন কয়, বাবা এ-বিয়াও মুই কিছুতে না করিম।
মুই যদি হয়্যা থাকোঙ তোমার গালার কাঁটা,
হাত ও পাও বাঁধি নদীর জলোৎ মোরে দেও ভাসাইয়্যা।
এ দুনিয়ায় কোন্‌টে কাঁয় শুনচে,
আড়াই দিনি ছাইলার বিয়াও হয়, বার বছরের কইনার সতে?
মন্ত্রী কয়, লক্ষ্মী মাওটা মোর, অমন না করিস আর,
রাজার হুকুম হইলে নড় চড়, গর্দান কাটা যাবে আমার।
রূপধন কয়, পিতা একবার ভাবি দেখছেন কি,
এই আড়াই দিনি ছাওয়া মোর কোলাৎ দেখলে
সগায়ে[২] ভাববে কী?

(২) সকলে।

তুমি আমি আমরা সগায় না হয় জানি
রাজপুত্র অইবেন মোর সোয়ামী,
কিন্তুক যাঁয় জানে না তাঁয় এ-কাথা
বিশ্বাস করবে কেমন করি ?
নানান জনের নানান কাথা,
কতজনের মুখ বন্ধ করি যাবে রাখা ?
এ দিগেতে 'জয় রাজপুত্রের জয়' বলি দরজায়
সোরগোল উঠিল্,
রাজা ডাকেন, মন্ত্রী, কোন্ঠে তোমরা
দেরী ক্যানে বিয়ার লগ্ন বয়া গেইল্।
মন্ত্রী কয়, হুজুর মোরা আছিল তৈয়ার,
বরের গালাৎ[৩] মালা দে রূপধন মাও আমার।
সাক্ষী থাক চন্দ্র সূর্য, সাক্ষী থাক আকাশ বাতাস,
বাবার প্রতিজ্ঞা রাখতে রূপধন আজ
গালাৎ মালা দিল আড়াই দিনের ছাইলার।
এই আড়াই দিনির রাজপুত্র পতিধন হইল্
গাবুর রূপধনের।
রাজা বলে, মন্ত্রী, এবার আমরা তা হইলে যাই,
বর কন্যাক বাসর ঘরোৎ পাঠেয়া দেও।
মন্ত্রী বলে, গরীবের বাড়িৎ কোন কিছু
না খায়া গেইল কি চলে,
রাজা বলে, তা বেশ, এখন থাকি
তোমরা আমার বিয়াই হইলে।
মন্ত্রী বলে, হুজুরের দয়া সব, রূপধন, মাও আমার,
ভক্তি দে তোর শ্বশুরোক চরণে।

---

(৩) গলায়

রূপধন বলে, শুন শুন শ্বশুর বাবা
তোমার চরণে মোর দণ্ডবোৎ,
আশীরবাদ করি রাজা মন্ত্রীর সাত চলে খাবার ঘরোৎ।
(অরে) খাবার ঘরোৎ যায় রাজা মন্ত্রীর সহিত,
বাসর ঘরোৎ রয়্যা কান্দে রূপধনোকের পতি।

আড়াই দিনি ছাইলা কান্দে রূপধনোকের কোলে,
কান্দন থামাইতে রূপধন সোয়ামীকে বলে,
সোনার স্বামী ধন মোর. আর কান্দেন না,
ক্যামন করি তোমাক্ শান্তি দিমো তাও জানিনা।

রাজা হৈল বৈরী, বৈরী হৈল নিজের বাপ,
কোন্‌টে তোমাক্ রাখি এলা ক্যামনে মানুষ করি,
এ দেশোৎ আর থাকা হবে না।

এ দেশোৎ সগায় হুজুগোৎ মাতি চলে,
তা না হল্যে কাণ্ড্ শুন্‌চে বিয়াও হয়,
যে ঝিনাইৎ করি দুধ খাওয়া ছাওয়ার।

রূপধন গোণে মোনে মোনে,
এই তো এলা কাণ্ড এটে নাই,
এই নিশুতি রাইতে সগায় চলি গেইচে
আমারা বাসর ঘরোৎ রাখি,
এই সমে রাজপুত্রোক নিয়া পালাই
দুই চউখ্ যেদি যায় সেদি চলি যাই।

এইনা পথ দিয়া গেইলে কাণ্ড দেখবার পারবে না,
এইখানে থাকলে মুই উঁয়ারে বাঁচাতে পারব না।
হায়রে অবুঝ পিতা মোর গুরুজন,
কি ভাবিয়া কিবা কৈলা বুঝিয়া অবুঝ হইলা,
প্রাণেতে বাঁচেয়া রাখি দিলা বলিদান।

—দুই —

(অরে) ছাওয়া (৪) কোলাৎ করি রূপধন, চলে পন্থ (৫) দিয়া,
মনে মনে ডাকে ভগোবান কপালে ঢুষিয়া।
এলা মুই করোঙ (৬) কি, পোয়া (৭) আসিল রাইত,
কতজনে না কইবে কাথা দেখি ছাওয়া কোলাৎ।
বাড়িৎ না দেখি রাজপুরীর সগায় মোক্
আরম্ভ করবে খোঁজা খুঁজি,
উই যে এটা বাড়ি দেখি বাগান ভরা ফুল গাছোত,
বাগানোৎ একনা ফুলোৎ নাই ফুটি।
যাউক, যাউক, সোমায় আর নাই,
চাঁপা গাছটার গোড়াৎ মুই নুকি থাকোঙ নিচ্চই।
পুবালি বাতাসে আই মোর মধুয়ার আগোল ঢোলে,
ফুল না দেখি উড়ি গেইচে কাজল ভোমরা রে।
ফুল মোর ফোটেনারে॥
বাগানোৎ রয়া রূপধন শোনে মালঞ্চীর গান,
দেখে, ঐ যে কাঁয় বা গান করতে করতে এতি
আসবার লাগচে,
সেইনা দেখি এক্না পোয়া মালঞ্চীরে
ডাক দিয়া বুলাইচে,
কাঁয় যাও মাসি সকাল হইতে কাঁয় বা কাঁদবার ধরচে?
মালঞ্চী কয় মন্দ কপাল মোর না কান্দি আর কি করি,
কাঁদোনের আর সকাল সাঁজ আছে কি?
কদ্দিন হইল্ মোর বাগানোৎ নাই ফোটে এক্নাও ফুল,
নাই পাই রাজার বাড়িৎ দিবার ফুল।
সেই বাদে দরমাও না দেয় এলা গর্দান না গেইলে হয়,
কত দুক্ষে দিন মোর যায়।

(৪) ছেলে (৫) রাস্তা (৬) করিব (৭) পোহাইয়া

ছেইলা কয়, শোনেক মাসি তুক্কুর দিন তর ফুরাইচে,
দেখ্ যায়া বাগানোৎ তোর ভৈ ভৈ করি ফুল ফুটচে।
মৈ মৈ করি আরু বাসনা (৮) ছুটচে॥
মালঞ্চী কয়, সক্কালে উঠি
গোলামের ব্যাটা গোলাম ক্যান গা আসচেন ঠাট্টা করবার,
বিরাও মোর বাড়ি হ্যাতে (৯) বলি মালঞ্চ দিল ঝঙ্কার।
ছেইলা কয়, ছাচা (১০) কাথা কই মাসি মোর মাথা খাইস্,
তোর বাগানোৎ ফুলের হাট বস্ছে এক্বার চায়া দেখিস্।
গাইল পাড়লু মালঞ্চী মাসি, ওরে
গোলামের ব্যাটা গোলাম,
তোর মুখোৎ আগুন, ক্যানে আস্ছেন মোর
কাঁটা ঘাউয়াৎ নুনের ছিটা দিবার।
ছেইলা কয়, দেখ মাসি দেখ্
তোর বাগান বাড়ি পূরক হয়া গেইচে ভোমরায়।
হাচা কাথাতো - বুইল্যা মালঞ্চী চউখ্ মেইল্যা চায়,
ফুলের কাছে গাছের পাত্ আর না দেখা যায়।
ফুলেতে ভৈ ভৈ হয়া গেইছে বাগান,
চউখ্ তুলি এদ্দিনে তা হইলে, দেইখ্চেন ভগোবান্।
ছেইলা কয়, মনের হাউসে তো গাইল পাড়লু খুব,
দেখোন্ মাসি মুই কেমন মিছা কাথা কঁও
এলা কয়টা ফুল দে মোক্।
মালঞ্চী কয়, নে বাবা নে,
যত ফুল মোনে লয় ইচ্ছা মত নে।
ছেইলা কয়, তোর বাগানোৎ ফুলের
কি মজার বাস্না মাসি,
বেলা হইল্ মুই তা হইলে যাঙ্ মাসি।

(৮) গন্ধ (৯) হইতে (১০) সত্য

মালঞ্চী দেখে সউগ্ গাচোৎ তো ফুটচে ফুল,
কিন্তুক চাঁপা গাছটার ফুলেতে বাগান যেনো
করবার লাগছে ঝিল্‌মিল ঝিল্‌মিল।

মালঞ্চী কয়, যাঙ মুই চাঁপা গাছটার গোড় খান
পরিষ্কার করি দিতে,
গাছের তলোৎ দেখে রূপধন
ছাওয়া কোলাৎ করি বসি রইচে।

মালঞ্চী কয়, কাঁয় যাও তমরা
অফুটা বাগানোৎ দুখিনীর আজ,
ফুল ফুটিয়া কাঁয় আস্‌চেন তমরা ?

কাঁদি কয় রূপধন, মুই বড় অভাগী,
আই মাও, ছিঃ মাও, না কাঁদিস্ আর
কাঁয় কয় তুই অভাগী ?
মালঞ্চী কয়, তর জন্য আজ ফুল ফুটচে
মোর শুকনা গাচোৎ,
কিবা চান্দের মতো ছাওয়া তোর কোলাৎ।

চল্ মা ঘরোৎ চল্ দে' তর ছাওয়া ধরি,
শত্রুর মুখোৎ পড়ুক ছাই, তুই থাক্ মা বাঁচি।
লজ্জা করি কয় রূপধন, ইয়ায় মোর সোয়ামী,
কী কইস্ মা, কয় মালঞ্চী, এই কাচুয়া (১১) ছাওয়া
তর সোয়ামী।
হাচা কাথা (১২) কই মাসি, কয় রূপধন,
এই ছাওয়া মোরই সোয়ামী
এই ভিক্ষা তোর কাছোৎ মাসি,
মানুষ করি তোল্ মোর সোয়ামী।

(১১) কচি (১২) সত্যকথা

মালঞ্চী কয়, বড় গরীব মুই, কোনমতে দিন যায়,
রাজা বাড়িৎ ফুল জোগেয়া (১৩) কেমন করি
মানুষ করিম এইনা রাজপুত্রের মতো ছাওয়া।
রূপধন বলে, মাও সে ভাবনা করা লাগবেনা তোর,
তুই যদি রাজি হস, ট্যাকা পাইসার হবে না অভাব তোর,
এই নে মোতির মালা, এই নে খাড়ুয়া সোনার।
ছাওয়া কোলাৎ নিয়া মালঞ্চী কয়, বুক মোর গেইল জুড়ি,
কাঁদে রূপধন ছাওয়া বুকোৎ (১৪) তুলি দিয়া
মোর বুক একেবারে হয়া গেইল্ খালি।

—তিন—

একদিন, দুইদিন গেইল্ সাত বছর,
রাজপুত্রের নাম হইল্ রহিম এর পর।
এদিগেতে রূপধনের বয়স হইল্ উনিশ বছর,
চাঁপা গাছের ডালোৎ বসি সে গাইল্ (১৫) সুন্দর।
ও মোর সোনার পাতি তোক্ দিনু মুই অন্যরে জনার হাতে।
অকুটা শিমুলের নাও হাল ধরিলে ধরেনা ভাও (হে)
আজি কিবা কিবা করে আমার গাও।
পন্থের ধূলার বালারে যত,
মোর সোয়ামীর গুণ ততরে,
আজি ঘরে থাকি হইলেন তমরা পর।
রূপধন গায় গীত মালঞ্চী কয় শোন্,
মোর সোয়ামী ভাল আছেনি জিজ্ঞাসে রূপধন।
মালঞ্চী কয়, ভালে আছে তোর সোয়ামী ধন,
কিন্তু মনোৎ যার জ্বলে আগুন কী নিয়া তাঁয়বাচবে এ জীবন।

(১৩) জোগান দিয়া (১৪) বক্ষে (১৫) গাহিল

সউগ (১৬) থাকতেও কাঙালী তুই নিজে ইচ্ছা করি,
সকাল সইন্ধ্যা (১৭) যায় তোর কাঁদা কাটা করি।
আর না দেখ্‌বার পাও (১৮) মুই এমন কাঁদা কাটি,
নিজের কাচোৎ নিয়ানে নিজের সোয়ামী।
রূপধন কয় মাসি, এলাও (১৯) হয় নাই সোমায়,
সে-দিন আসিল্‌ মুই নিজে সে কথা কইমু।
মালঞ্চী কয়, রূপধন, রহিমোকের বয়স হইল্‌ সাত বছর,
পাঠশালাৎ না পাঠাইলে না চলিবে আর।
লেখাপড়া না শিখলে মানুষত না হইবে,
গেয়ানী, গুণী সগার মাঝোৎ তো তাক্‌ বইসা লাইগবে।
রহিমোক্‌ পাঠাও একজন ভালো গুরুর কাছোৎ,
সগল বিদ্যা শিক্ষা রহিম বগুক সভার মাঝোৎ।
রূপধন পদ বন্দি বলে, মাসি, তোমার কাছোৎ
আমার যতেক শক্তি, যত ধন আছোৎ
সগলি পতির বাদে (২০) কহি শোনো মন,
গুরুর হস্তে দেও মা, শোনো আমার বচন।
মালঞ্চী কয়, কন্যা, পতি তব গুণবান তাহার সমান,
এ তিন ভুবনে নাই কেহ বর্তমান।
ভাগ্যে দিল পদধূলি আমার ভবনে
মালঞ্চে ফুটিল্‌ ফুল তার দরশনে।

—চার—

হস্তে পুঁথি লইয়া রহিম গুরুর কাছোৎ যায়,
ছোট ছোট পুঁথি রহিমের মনোতে না যায়।
পত্তিদিন একখান করি পুঁথি শেষ করে,
দেখিয়া সগল ছাত্র হিংসা করি মরে।

(১৬) সব (১৭) সন্ধ্যা (১৮) পরি (১৯) এখনও (২০) জন্য

দিনে দিনে দিনগত পনের বর্ষ কালে,
দুঃখ আসি দিল দেখা রহিমের কপালে।
চিৎকারিয়া গুরু দেখ রহিমোকে ডাকে,
কী বিদ্যা হইয়্যাছে তোর কহ আমার আগে।
পোশাকের পরখ (২১) দিল, পরখ খাওয়া দাওয়ার,
সকল পরখে রহিম হইয়্যা গ্যাল পার।
এলা (২২) শোনো দুষ্টা গুরু কোন্ বা কার্য করে,
রহিমোক ডাকিয়া নিল আপনার ঘরে।
সগল ছাত্র ডাকিয়া কয়, গুরু মহাশয়, লও নমস্কার,
রহিমের হইচে দেমাক, আপনারে বড় পণ্ডিত
মনে করছে উঁয়ার।
গুরু কয়, হয় নাকি, কোনটে গেইল রহিমোকে ডাক,
এই বইল্যা গুরু ছাড়ে নিদান ডাক।
রহিম কয়, বিশ্বাস করেন গুরু মহাশয়,
যা কিছু বিদ্যা শিখ্‌চি খালি আপনারি দয়ায়।
এক ছাত্র কয়, রহিমোক্ আর
আহ্লাদী (২৩) করা না লাইগবে
গুরু মশায় শোনেন, আপনারে তাড়ে (২৪) দিয়া
উঁয়ার নিজে গুরু গিরি করবে।
গুরু কয়, মুখোৎ মিষ্টি হাসি, মনোৎ উঁয়ার বিষ,
আজ দেখিম তোর পরীক্ষা, তুই কত বিদ্যা শিখ্‌চিস
পদ্মবনে জন্ম যার কিবা নাম তার,
সর্প-শিশু লইয়া খেলে দিন রাত্রি আর।
পরমা সুন্দরী তবু এক চক্ষু নাই,
বলে সদা, মানুষের পূজা আমি চাই।

(২১) বিবরণ (২২) এবার
(২৩) আনন্দ=উল্লাস (২৪) তাড়াইয়া দিয়া

রহিম কয়, সর্পমাতা মনসা সে এক নাম কানি,
চন্দ্রধর দিল পূজা তারে আমি জানি।
এই রূপে মানুষের পূজা সে যে পায়,
পত্তিঘরে আজি সবে পূজে মনসায়।
গুরু কয়, ঠিক হইয়াছে উত্তর তোমার,
বাহাদুরী বুঝিম তোর জবাব দে এবার।
মস্তকে ধরিছে গঙ্গা কিবা নাম তার,
রহিম বলে, মহেশ্বর তারে বলি শুন সোমাচার।
তুষ্টা গুরু মুখে কয়, আছা, সাবাস, সাবাস,
পাঠশালা হইলে ছুটি রহিম এলা (২৫) থাকি যাস্।
সগল ছাত্র চলি গেইলে কয় গুরু শোন্,
ছাত্রগুলা যা কইল্ হাচা নাকি বোল্।
আমার চায়া বেশী হইচিস্ বিদ্যা আর বুদ্ধিতে,
আমাক্ আর কাঙ (২৬) গুরু বুলি মানবে
তুই বাঁচি থাকলে।
রহিম কয়, যা শিখছি গুরু মশায়, সেতো আপনার দয়াতে,
সগাঁয় কবে আপনার উপযুক্ত শিষ্য তয়ত (২৭) আপনারি
মান বাড়বে।
না-না-না তাতে আমার সর্বনাশ,
গুরু কয়, এমন শাস্তি দিমো তোমাক্
যাতে মোক্ ছোট না কবার পারবে মানুষ।
পনের ষোল বচ্ছরের চ্যাংরার কাছোৎ
মুই থাকবো ছোট হয়্যা,
যাদু মন্ত্র দিয়া তোক্ রাখমো মুই জানোয়ার বানেয়া।
আয়রে পেত্যানি (২৮) আয় সেওড়া গাছ ছাড়ি,
রহিমোক্ কর পাঁঠা শত্রু মোর ভারী।

(২৫) এখন বা এইখানে। (২৬) কেহ (২৭) তবে। (২৮) পেত্নী

আমার মন্তরে হউক রহিম ছাগল,
মন্তর পড়িয়া তাক্ গায়ে দিনু জল।
পাঁঠা বানেয়া রহিমোক্ গুরু হাসে হাঃ হাঃ হাঃ ঃ
মালঞ্চী মাসি দেখে চায়া পাঁঠা ডাকে ব্যাঁ ব্যাঁ।
রহিমোক্ ঘরে নিতে আইছিল মালঞ্চী মাসি,
গুরু মশায়ের হাসবার দেখি চিন্তায় পড়িল মাসি।

সউগ ছাত্র পাঠশালোৎ থাকি ফিরি গেইল বাড়ি,
কেবল রহিম এলাও না আসিল ফিরি।
মনে লয়, গুরুর আছে কোন্ কারসাজি,
শোনা লাগবে সগল কথা এইটে (২৯) মুকি থাকি।

পাছ দুয়ারোৎ থাকি মালঞ্চী শোনে গুরুর কাথা,
কালই লাগবে তোক্ হাটোৎ ব্যাচে ফ্যালা।
কালই যেন তোক্ কাও খায়া ফেলায় জবো করি,
'রহিম অইচে পণ্ডিত' আর না কবে কোন্ মানুষি।

মালঞ্চী কয়, ওমা এলা কী সর্বনাশ,
পাঁঠা বানে রাখছে রহিমোক সোনার চাঁদ।
কী অইচে এলা রূপধনোকে কও (৩০) যায়া,
দুষ্টা গুরু রহিমোক বানাইচে পাঁঠা।
রূপধনোকে কও যায়া, আর এক ঘড়িও (৩১) এটে
না থাকিম মুই,
জবো করবার বাদে হাটোৎ বেচে ফেলাইবে রহিমোক্
কী কাথা মুই কই।

বাড়িৎ আসি মালঞ্চী কয়,
জাগো জাগো জাগো কন্যা হে, কন্যা শোনো সোমাচার
নৌকা আজি হইল্ কুমির কপালে তোমার কন্যা (হে)।

---

(২৯) এইখানে (৩০) কহিব (৩১) এক মুহূর্তও

রূপধন বলে, মাসি, কী কাথা বা কলু,
খবর কি সোয়ামীর মোর সেই কাথাটাক্ বলু।
মালঞ্চী কয়, ফুল হয়্যা আছ কন্যা হে
কন্যা, ফুলের মায়া ছাড়ো
দুষ্টা গুরু তোমার স্বামীক্ পাঁঠা করছে আরো কন্যা হে।
রূপধন বলে, মাসি, শীগ্‌গির করি ক্
মন মোর মানে না মাসি, কী হইচে ক।
মালঞ্চী কয়, দুষ্টা গুরু করচে ঠিক,
কালোই হাটোৎ নিয়া যায়া রহিমোক্ বেচাইবে,
অন্য মানুষে রহিমোক্ পাঁঠা মনোৎ করি
কিনি নিয়া যায়া জবো করি খাবে।
রূপধন বুলে, শীগ্‌গির করি যা মাসি, শীগ্‌গির করি যা,
মোর স্বামী-ধনোক্ কিনি আন্, যত লাগে নিয়া যা।
তন্ত্র, মন্ত্র মুইঞও জানোৎ কিছু, একবার খালি নিয়া আয়,
মন্ত্র দিয়া মানুষ করবার পারিম মুই,
মাসি একবার খালি নিয়া আয়।
আর করিসনা দেরী মাসি, আর করিস না দেরী,
মোর কপাল ভাঙবে মাসি, আর করলে দেরী।
মালঞ্চী কয়, ভগবান রক্ষা করবে, তোর সোয়ামীক্,
যাঙ্ মা যাঙ্ মোর মনে কয় ফিরি আসবে
তোর সোয়ামী ধনোক্।
রূপধন কাঁদে, ওকি হায় বিধি, মোর বিধি,
কত দুক্ষু আমার কপালে,
যেও ডালে বাঁধিনু ঘর, ভাঙ্গি নিল দুষ্টা ঝড়
কত দুক্ষু আমার কপালে।
(ও কি হায় বিধি মোর বিধি
কত দুক্ষু আমার কপালে।)

পিতা মাতা হইল পর, স্বামী লয়্যা ছাড়নু ঘর,
সেও স্বামী মোর রয়না বাঁধা অঞ্চলে মোর বিধিরে।
রূপধন কাঁদে, আরও শোনে পাঁঠার ডাক,
আসচিস্ মালঞ্চী মাসি—বুলি করে হাঁক ডাক।
আ হা হা সোয়ামী-ধন মোর কতনা দুঃক্ষু পাবার লাগ্‌চেন,
এ অভাগীর কপাল দোষে কতনা ভোগা ভুগ্‌চেন্।
শোন শোন দারুণ বিধি, সতী যদি আমি,
ছাগল মানুষ কর, সে আমার সোয়ামী।
মন্ত্রপড়ি মোর স্বামীর গায়ে এই না দিনু জল,
দুষ্টা গুরু, দেখ্ আসি আমার যাদু-বল।
মানুষ হয়্যা রহিম কয়, মাসি কোন্‌টে আছোঙ মুই
কোন্‌টে বা ছিলি,
জানোয়ার বানেয়া রাখিম্ তোক্
গুরুমশায় এইটা কবার লাগ্‌ছিল।
মালঞ্চী কয়, আর কোন ডর নাই তোর
শোনেক বাবা রহিম,
গুরু পাইবেনা আর নাগাল তোর এই কাথাডাই কইম্।
রহিম কথা কয় চ্যায়া দেখে গাছের পাতা খস্‌খস্ করি ওঠে,
ওটে কি আর কেঙ আছে—রহিম মালঞ্চীরে পুছে।
মালঞ্চী কয়, হাওয়ার শব্দ ওটে আর কেঙনা আছে।

পাঁচ

মালঞ্চীর বাগানোৎ বসি রহিম চান্দ পানে চাই,
কয়, মাসি, তোর দয়াতে ফিরি পানু এই না জীবন মুই।
আকাশের চাঁদ সাক্ষী করি কঙ,
দুষ্টা গুরু মোক্ রাখছিল পাঁঠা বানেয়া,
তোর এই উপকারের কাথা এ জীবনে না ভুলিম মুই।

মালঞ্চী কয়, কোন দয়া নাই করোঙ মুই,
যায় বাঁচাইছে তোক্ তোর জন্ম হবার পর থাকি,
অনেক দুঃখু কষ্ট করি যঁায় তুলছে তোক্ মানুষ করি,
সে অন্য রে জনা, না অইলাম মুই।
রহিম কয়, হাচা কাথা ক' মাসি. কে-বা আর এক জন,
মালঞ্চী কয়, হাচা কাথা কই বাছা, তাঁয় আর একজন।
নিজে নুকি (৩২) থাকি সউগ সময়
সে তোর সেবা করেবার চায়,
কারো মুখের আগাৎ (৩৩) তাঁয় বাইর নাই হয়।
রহিম কয়, তাক্তো মুই চাঙ মাসি তাক্ মুই চাঙ,
প্রাণ বাঁচেয়া মোর কেনে তাঁয় এত দূরোৎ
নুকি থাকবার চাঙ?
মুই আজ শুনিম্ (৩৪) সে কাথা তার নিজ মুখোৎ,
মাসি কোনটে সে আছোৎ।
মালঞ্চী কয়, রহিম তোর চউখ যদি থাকে,
তার দেখা পাবু এমুনে (৩৫) তা হলে।
এই বাগানোৎ শয় শয় ফুলের একনার (৩৬) মধ্যে
তাঁয় নুকি আছে,
সে ফুল কোনা (৩৭) রহিম তুই চিন্যে নে তাকে।
রহিম চায়া দেখে চাঁপা গাছটাৎ
কী সুন্দর একনা (৩৮) ফুল ফুটচে,
মাসি, মাসি ডাকে রহিম, ঐ ফুলের মধ্যে কি
তার খোঁজ পাওয়া যাবে?
মোর মোনে লয় মাসি নিচ্চয় নিচ্চয়
ঐনা ফুলোৎ মধ্যে সেও নুকি আছে।

(৩২) লুকিয়ে থাকা (৩৩) সম্মুখে (৩৪) শুনিব। (৩৫) এইখানে= এইভাবে (৩৬) একটার (৩৭) কোনটি (৩৮) একটি

চাঁপা ফুল দেখি রহিম, পাড়তে যেই গেইল্
তুই তুই সেই—বলি আনন্দে অধীর হইল্।
সুন্দর বন্ন কন্যা যে তুই, ফুলের মত তোর হাসি,
চাঁদের মতন মুখ তোর,
হাড়িয়া-কালা ম্যাঘের মতন তোর ক্যাশরাশি।
আর চউখ দুক্‌না (৩৯) তোর কন্যা
এক জোড়া কালা ভোমরার মতন,
কাঁয় তুই ক' এখন কারবা ঘরের মানিক রত্তন।
রূপধন বলে, কুমার, তোমার ভায্যা (৪০) হই
মুই তোমার দাসী।
রহিম বলে, আমার ভায্যা যদি হাচা কথা কও,
অধরে অধর থুইয়্যা মধুর কথা কও। (কন্যাহে)॥
রূপধন বলে, যখন তুমার বয়স ছিল মাত্র আড়াই দিন,
তখন থাকি এই দাসী তোমার পদে
সঁপি দিছে সউগ পাণ মন।
রূপধন বলে, কুমার এতদিন মুই নুকি আছিনু,
আজ আর মুই নুকি থাকতে নারিনু।
হাসিয়া রহিমোকে বলে মালঞ্চী মাসী,
এবার চিন্‌লু তো, আইস তা হইলে,
তোমাগের জন্য ফুল দিয়া বাসর সাজে রাখি।
রহিম বলে, রূপধন, আইজ মোর জীবন ধন্য হইচে,
তোমার কানে কানে আইজ মোর
গান গাবার বড় ইচ্ছা হইচে।
ফুলের মাঝোৎ থাক কন্যা চাঁদের মত চাও,
পাখির মত আমার কানে রসের গীত গাও। (হে)
(ফুলের মাঝোৎ থাক কন্যা হে।)

---

(৩৯) দুইটি (৪০) স্ত্রী

ভোমরা হয়্যা থাকবো আমি তোমার প্রাণে প্রাণে,
অঞ্চলে রাখেন বোল্ ঢাকি পরাণ যেখানে হে,
(ফুলের-মাঝোৎ থাক কন্যা হে) ॥
মালঞ্চী কয়, আইস এলা তোমাগের বাসর তৈয়ার,
মুই চল্নু তা হইলে, মালা বদল কর এবার।
সাক্ষী থাক আকাশ বাতাস, সাক্ষী থাক আকাশের চাঁদ,
বাসর-ঘরোৎ থাকি রহিম কও,
এই মালা দিনু মুই রূপধনোকের গালাৎ (৪১)।
মালা বদল করা্যা দুইজন শুইয়া নিদ্রা যায়,
ঘরের-কাণাৎ (৪২) থাকি গুরু মানে মোনে কয়,
যেইনা ঘুমাইবে রহিম সজ্জর (৪৩) উপার,
এই বিষ-মাখা ছুরি বসে দেওয়া চাই বুকোৎ উয়ার।
একথা শুন্যা রূপধন রহিমোকে ডাকে,
শুনলেনত' সগল কাথা, দুষ্টাগুরু আরো পিছা নিছে।
তোমাক্ না রক্ষা করবার পারিম মুই
এটে থাক্লে কোন মতে,
শত্রুর ঘোড়া বাঁধা বাড়ির পাছিলাৎ
চলেন পালেয়া যাই পাছ-দুয়ার দিয়ে।
রহিম কয়, শোন কন্যা, মালঞ্চী-মাসি
মনোৎ বড় দুক্ষু পাইবে,
এমনি করি পালেয়া গেইলে।
রূপধন কয়, কুমার, আর একনা কথাও
কইমেন (৪৪) না,
তোমাক্ এখান থাকি না নিয়া গেইলে
আর বাঁচাতে পারিম না।

(৪১) গলায়। (৪২) ঘরের বেড়ার আড়ালে
(৪৩) শয্যা = বিছনা (৪৪) বলিবেন

এই না বুলিয়া রূপধন পালেয়া যায় রহিমোক সঙ্গে নিয়া,
ঘরে আসি গুরুমশায় নাই পায় কোন সাড়া।
একনা (৪৫) ছেইলা বলে, গুরুমশাই
ওম্‌রা (৪৬) পলাইয়া গেইচে,
গুরু কয়, যেমন করি হউক চল্, ওমাক ধরায় লাগ্‌বে।
কোন্ রাস্তা দিয়া পালায় উয়ারা, একবার দেখি লাইগবে ॥

—ছয়—

ঘোড়াৎ চাপি দুইজন অনেকদূর যায়,
বেহুশ হয়্যা পড়বে রহিম রূপধনেকে্ বুলায়।
আরনা পারি রূপধন, দেহা পড়চে অবস হয়্যা,
এইখানোৎ এইবার ঘোড়া তোর থামা।
রূপধন কয়, কী কব আর, মোর স্বামী ধন,
মোর কপাল দোষে আজ তুমার কষ্ট এমন।
এই যে দূরে কারবা একনা বাড়ি দেখা যাঙ্,
ঐটে চল স্বামী-ধন খানেক করিগে বিশ্রাম।
এইনা বুলিয়া দোনোজন বাড়ির কাছোৎ যায়,
রূপধন ডাকে, এ বাড়িৎ কেউ আছেন কাঁয়।
ডাক শুন্যা একনা বুড়ি বাড়িৎ থাকি আসি,
কাঁয় তুমারা—পুছে বুড়ি, অ, অনেক দূরৎ যাবেন বুঝি ?
আস্ বাবা, আইস্ মা, আ-হা-হা চউখ, মুখ শুকি গেইচে,'
মোনে লয় ঘাটা দিয়া যাইতি যাইতি
শরীল বুঝিবা হাপ্‌সি (৪৭) গেইচে।
রহিম কয়, সারাদিন কিছুই নাই খাইমা
তাই বড় ভোখ (৪৮) লাগচে,
বুড়ি কয়, আ-হা-হা তমরা বাবা বড়ই কষ্টত' অইচে।

(৪৫) একটি (৪৬) উহারা (৪৭) পরিশ্রান্ত (৪৮) ক্ষুধা

খানেকক্ষণ এইটে জিরান আপনি,
তারপর নদী থাকি ধুইয়্যা আইস গাও,
ভাত ডাল র'াধবার যোগার করোঙ গিয়া মাও।
রহিম কয়, ভুল্‌মোনা (৪৯) মা এই উপগার তোমার,
বুড়ি কয়, মার আগোৎ (৫০) কি ছাওয়ার
কোনো কথা থাকে দেনা পানার।
মোনে মোনে ভাবে বুড়ি,
চেহারা দেখিতো খুব ধনী মানুষ মোনে হয়,
সাত সাতটা গোলামের ব্যাটা মোর
যদি বাড়িৎ থাকিল হয়।
সব যাউক্ এমন ভিজা কাঠ দিম্
যেনো আর না জ্বলে সারাদিনে,
এমন শক্ত কালাই দিম্
যেনো আর না সেজে (৫১) সারা দিনে।
'কৈ তোমারগে গাও ধোওয়া হইল্ মা'
বলি বুড়ি ঘন ঘন ডাকে,
'হ্যা, মা, আস্‌চি মোরা' বলি দোনো জনায় আসে।
বুড়ি কয়, 'নেওমা চাউল, ডাইল
আর এই নেও মা খড়ি (৫২),
পাক শাক করতে তোমারগে লাগবে কয় ঘড়ি।
কাইল রাইতোৎ গুড়ি গুলান বৃষ্টিতে গেইচে ভিজে,
আর এই কালাই রইল মা,
সতী কইন্যা ছাড়া কাও সিদ্ধ করবার না পারে।
তোক্ তো দেখা যায় সতী-লক্ষ্মীর মতো,
এ কালাই সিজাইতে (৫৩) তোর কষ্ট না অইবে কোনো।

(৪৯) ভুলিবনা (৫০) কাছে (৫১) সিদ্ধ হওয়া
(৫২) জ্বালনী কাঠ, (৫৩) সিদ্ধ করিতে

মুই যাও, মা, তোমরা রাঁধাবাড়ি কর,
ঘরোৎ ভিতর যাই মুই, তমরা খাওয়া দাওয়া কর।
এই না বুইল্যা বুড়ি তখনে ঘরোৎ ভিতর যায়,
রূপধন কয় রহিমোক্, খারাপ মতলব আছে এর
এ বুড়ি ডাইনী নিচ্চয়।
রহিম কয়, তা অইলে কী অইবে মোর সোনার রূপধন,
রূপধন কয়, কোনো ভাবনা নাই মোর সোয়ামী-ধন।
মনোৎ করছে বুড়ি, না পারিম মুই কালাই সিঝাইতে
দিন রাইত ধরি,
এমন মন্ত্র জানোঙ মুই কালাই সিজাইবে এইনা দণ্ডে,
জ্বলবে ভিজা খড়ি।
এই দেখ স্বামী ধন মোর, খড়ি জ্বলি উঠিল,
লোহার কালাইও বুড়ির সিঞ্জা হইল্।
বুড়ি কয়, বড়ই না কষ্ট হইচে মা,
খড়িগুলান ছিল বড়ই না ভিজা।
রূপধন কয়, মা, পাকশাক গেইচে হয়া,
'হয়া' গেইচে শুন্যা বুড়ি রয় অবাক হয়্যা।
মোনে মোনে ভাবে বুড়ি, ইয়ারা তো কম কইন্যা নোয়ায়,
তন্ত্র, মন্ত্র সউগ মোর গেইল্ বা কোথায়।
উয়ারা যাবার আগে ঘোড়ার গালাৎ
এক থলি মন্ত্র পড়া সড়ষা বাঁধি দেওয়া লাইগবে,
ঘোড়াও যাইবে যদ্দুর, সরষাও তদ্দুর ফুটি ফুটি যাইবে।
রূপধন কয় বুড়িরে, খাওয়া দাওয়া হইল্ এলা যাই মা,
বুড়ি কয়, সে-বা কেমন কাথা
খাওয়া দাওয়া হইল, খানেক নিঁদ পাড়ে এলা।
রহিম কয়, পাজী বুড়ি, আমরা কি বুঝি নাই তোর মতলব,
কেমন জব্দ দেখ, এই আমরা চল্লোঙ।

বুড়ি কয়, ইটা হ্যাঁ, কী সর্বনাশ না হইল্,
গোলামের ব্যাটারা মোর ডাকাতী করবার গেইচে,
ফিরি আসবার নাম গোন্দো না করিল।
এলা মুই কিবা করোঙ, কুন্‌ঠে বা মুই যাওঙ,
একটা বুদ্ধি হঁ আস্‌চে মাথোৎ
আগুন নাগে দাও ঘরোৎ,
তা অইলে ব্যাটারা মোর নিচ্চই আস্‌বে দৌড়ি,
এই না বলি বুড়ি জ্বলে দিল যত লাকড়ি খড়ি।
আগুন দেখি ডাকাতই দল ঘরে ফেরে দৌড় করি,
ডাকাইত কয়, কী সর্বনাশ মা,
কাঁয় ঘরোৎ আগুন লাগে দিল্,
বুড়ি কয়, কাঁয় এত দেরী করি ঘরোৎ আসিল্ ?
শিকার পালেয়া গেইল তর দেরী দেখি,
ভাল চান্ তো সরষা ফুট্‌চে যে ঘাটা (৫৪) দিয়া
ঘোড়া চালাও সেই না ঘাটা দিয়া।
ঘোড়াৎ চড়ি রহিম রূপধন চলে ছুটি ছুটি,
দিন নাই, রাত নাই বোন পাথার ভাঙ্গি।
রহিম কয়, রূপধন, পিয়াস লাগছে খুব, মুই আর না পারেঙ,
রূপধন কয়, কী করি স্বামী-ধন, নদী, পুকুর কিছুইত
নাই দেখা যাও।
রহিম কয়, রূপধন, মোর সোনার রূপধন,
এক আঁজুল (৫৫) জল না পাইলে মোর না বাঁচোঙ পরাণ।
রূপধন কয়, স্বামী-ধন, তমরা এইটে খানিক জিরান,
যেটে থাকি পারি মুই নিয়া আসি জল, বাঁচাইম
তমার জীবন।

৫৪) পথ (৫৫) এক আঁজলা

পিয়াশেতে কান্দে রহিম, উঃ হুঃ পরাণ যায়,
আর না বাঁচোঙ মুই, প্রাণ রাখা দায়।
এই না কালে ডাকাইত দল সেইটে আসিলু,
রহিমোক্ দেখি কয়, এবার কুনটে পালাবু।
বুড়ি মাওক্ দিচিস্ ফাঁকি,
আমার গুলার চোখোৎ ক্যামনে দিবু ফাঁকি ?
এবার আর রক্ষা নাই তমার,
এক না কোপে দেখাইম্ তোক যমের দুয়ার।
রহিম কয়, দোহাই হামাক না মারিও,
ডাকাইত কয়, ছাড়ি দিবো, ক্যান না মারিবো ?
এই না বইল্যা ডাকাইতে রহিমোক কাটে ফ্যালে,
চায়া দেখে মাথার কাছোৎ উয়ার একনা থলি পর্য্যা রইছে।
মণি-মাণিক্যের থলি ভাবি এক ডাকাইতে খোলে,
থলির মাঝাৎ পাথর দেখি ফ্যালাইয়্যা দেয় দূরে।
সোনা রূপা খুঁজি নিল দ্বিতীয় ডাকাইত,
মানুষের শব্দ শুন্যা চলি যায় তাফাৎ।
আঁজল করি জল নিয়া রূপধন সেইটে চলি আইসে,
মরা রহিমোক দেখি রূপধন হাপুস্ হুপুস্ কাঁদে।
এই না সর্বনাশ মোর কাঁয় করিছে।
যৌবনে বিধুয়া হনু মুইরে, এই মোর কপালের লিখন,
ধূলাৎ পড়ি মোর স্বামী-ধন।
দুক্ষু যে দিলরে বিধি, কে করে খণ্ডন,
ধূলাৎ পড়ি মোর স্বামী-ধন।
মাটিৎ বসি রূপধন যখন জুড়িছে কাঁদন,
শঙ্কর পার্বতী দেখা দিল সেই না পথোৎ।
রূপধনোকের কাঁদন দেখি পার্বতী শঙ্করেকে বুলে,
কোন্ বা অভাগী সোয়ামীক হারেয়া বুক কাটা কাঁদন জুড়ে।

মোনেলয় উয়ার বুঝি কপাল বা ভাঙ্গছে।
শঙ্কর কয়, ও কাঁদোনার ভিতি কান্ না দেইস্ পার্বতী,
মানুষের দুঃক্ষের আর শেষ আছে কি ?
চল্ চল্ কৈলাস যাইতে হয়্যা যাইবে দেরী,
মহাদেব, মুই না যাইম্, বলেন পার্বতী।
অভাগীর কাঁদন শুন্যা মোর বুক ফাটি
কাঁদন আইসবার চায়,
উয়ার সোয়ামীক্ তমার বাঁচে দেওয়া চাই।
রূপধন কাঁদি বলে, হায় ভগমান,
চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস তমরা ফিরে দেন
মোর সোয়ামীর জীবন।
যদ্দিন মোর সোয়ামীর জীবন ফিরি নাই পাইম্,
তদ্দিন এই মরা দেহা নিয়া এইটে বসি থাকিম্।
আর কিবা দাম আছে এই বিধুয়ার জীবনের,
তাঁও ভাল্ যদি না খাঁয়া দায়া এইটে জীউ যায় মোর।
শঙ্কর ডাকি কয়, রূপধন, দেখ মেলি চউখ,
তোর দুক্ষু দেখি ফাটে মোর বুক।
এ কথা শুনি রূপধন বলে, হে বাবা শঙ্কর, হে মাও শঙ্করী,
তোমাগের পাও ধরোঙ, দয়া কর
জীবন ফিরি দেও মোর সোয়ামীর।
শঙ্কর কয়, চায়া দেখ্ কইন্যা রূপধন,
জীবন ফিরি পাইচে এলা তোর সোয়ামী-ধন।
শঙ্কর বুলায়, শঙ্করী, এটে তোর মনের হাউস্ মিটিল্,
কৈলাশে চল্ যাই মোরা, বড় দেরী হয়্যা গেইল্।
জীবন ফিরি পায়া রহিম রূপধনোকে কয়,
মুই যে-না স্বপ্ন দেখ্বার লাগ্চোঙ্,
মোক্ যেনো কাটি ফেলাইল্ ডাকাইতোঙ্।

রূপধন কয়, প্রভু নোয়ায় স্বপ্ন এটা,
তোমাক্ ফিরি পাইচি শিব শঙ্করীর দোয়া
সত্য কাথা এটা।
রহিম কয়, রূপধন, তুই সতী কইন্যা,
সেইবাদে আজ এমনি করি ফিরি পালু যে
সোয়ামী তোর মরা।
রূপধন সাথোৎ বসি রহিম গল্প করে,
দুষ্টা গুরু সেইও দণ্ডে সেইখানেতে আইসে।
হাঃ হাঃ করি হাইস্যা দুষ্টা গুরু কয়,
চউখোৎ ধূলা দিয়া পালাইচিস্ তো বড,
এলা কোন্টে পালাবু তুই বড়।
আইস্ আইস্ রে ডাকিনী, রহিমোক্ ধর,
মন্ত্র বলে রহিমোক্ কবুতর কর।
হাঃ হাঃ করি হাসে দুষ্টাগুরু কয়, এটে হইল্ কেমন মজা,
এলা থাক্ তুই পায়রা হয়া।
কান্দি কয় রূপধন, দুষ্টা গুরু, শেষ কি অইবেনা
তোর শয়তানীর?
এত কষ্ট কেনে দিবার লাগাচিস্ তুই মোর সোয়ামীক্।
আমবাত' করি নাই তোর কোন ক্ষেতি,
তবে কেনে কষ্ট পায় মোর সোনার পতি।
দুষ্টা গুরু কয় হাইস্যা, শোনেক্ সুন্দরী,
রহিমোক্ তো ফেলাইচোঙ্ পায়রা করি।
এলা জোর করি তোক্ নিয়া যাইম্ মোর বাড়িৎ,
মোর ঘরোৎ রূপধন থাক্বু খুব সুখোৎ।
রূপধন কয়, শোন্ দুষ্টা গুরু,
সোয়ামীক্ ছাড়ি মুই যাইম্ মনে করচিস্,
হিংসা করি মন্ত্র দিয়া মোর সোয়ামীক পাঁঠা বানাইচিস্,

আজ করলু কবুতর, মনের হাউস কি তোর
এত করিও মেটেনা,
গুরু কয়, কেনে কইন্যা, সোয়ামীক্ গেইলুকি
সোয়ামী আর পাওয়া যায়না ?
রূপধন কয়, ছিঃ তুইনা আমার সোয়ামীর গুরু,
এতবড় পাপ কাথা তুই ক্যামনে কবার পারলু ?
শোনেক্ শোনেক্ শোনেক্ অ গুরু মুই তোর বেটি,
তোমাক্ ডাকোঙ্ মুই বাবা বলি।
এত বড় অন্যায় তোমরা করেন না,
সতীর কাছোৎ অন্যায় কইলে ভগোবান্ সইমেননা।
দয়া করোঙ্ গুরু, ধরোঙ্ তোমার পাঙ্,
মোর সোয়ামাক্ ফির্ মানুষ করি দেও,
ধরোঙ্ তোমার পাঙ্।
গুরু কয়, শোনেক্ কন্যা রূপধন,
মানুষোক্ মুই জন্তু করবার পারোঙ্
ফিরি আর মানুষ করবার না পারোঙ্।
তোর না কাথা শুনি, ছাড়ি দিমু তোক্,
ফিরি যদি মানুষ হয় এবার তোর সোয়ামী,
কথা দিমু কোনো ক্ষেতি তার না করিম আমি।
ফিরি যেন মানুষ হয় এবার তোর সোয়ামী ॥
কবুতর হয়া রহিম বক্ বক্ম করে,
তা'দেখোৎ রূপধনোকের দুক্ষুতে বুক ফাটে।
রূপধন বলে, স্বামী-ধন, তোমাক্ নিয়া এমন দেশোৎ যাই,
যেটে কোনো মানুষ কোন মানষির ক্ষেতি করে নাই,
কোনো মানুষ কোনো মানুষোক হিংসা করে নাই।
বক্ বক্ম্ করি রহিম-কবুতর একখান পাঁও উচা করে,
রূপধন কয়, এ্যা, এটে কি ঠেকিল্ তলাৎ মোর পাঁয়ে।

এ-যে দেখি মোর সেই-না যাদু পাথর,
ডাকাইত মরা তা' হইল্ ফেলি গেইচে
মোর এই না সোনার পাথর।
স্বামী হইচে কবুতর, শোন্‌রে পাথর,
মন্ত্রগুণে তাক্ তুমি কর আজি নর।
যাদু-পাথরের গুণে রহিম ফিরি মানুষ হয়,
রূপধন্, মোর সোনার রূপধন—বলি চতুরদিগে চায়।
রূপধন কয়, শোন মোর স্বামীধন,
যে-কাথা তোমাক্ কই নাই এতদিন,
সেই কাথাটাক্ আইজ কইম এখন।
তমরা হইলেন রাজপুত্র ইলিমপুর শহরের,
মুই হনু মুন্ত্রী-কন্যা সেইও সে দেশের।
এইবার চলেন মোর সোয়ামী-ধন,
নিজেগের দেশোৎ ফিরি যাই এখন।
অবাক হয়্যা রহিম কয়, রাজপুত্র মুই!
এ আনন্দের কাথা কার কাছোৎ বা কই।
এই না সময় দুরে ঢোলাইর (৫৬) শব্দ শোনা যায়,
'ও কিসের ঢোলাই' রহিম রূপধনোকে শুধায়।
রূপধন কয়, চলেন না সোয়ামী কাছোৎ যায়া শুনি,
নতুন কোন বার্তা হবে মোনে মোনে গুণি।
এদিগেতে রাজবাড়ির ঢোলাইদারে কয়,
রাজবাড়ি থাকি লক্ষ মোহর বক্‌শীশ মেলবে,
যাঁয় খবর দিবার পাইরবে,
রাজপুত্র রহিম আর মুন্ত্রী কন্যা রূপধনোকের।
ঢোলাইদার কাছোৎ যায়া রহিম ডাকি কয়,
মুই সেই না রাজপুত্তুর, শোনেন ত' নিচ্চয়।

(৫৬) ঢোলের বা টিকারার শব্দ।

মুই রূপধন কইন্যা শোনেন, সোমাচার,
আড়াই দিনির সোয়ামীক ধরি ছাড়চোঙ্ মুই ঘর।
রাজা মন্ত্রী দুইজনা কাছোৎ ছিল খাড়াইয়্যা,
আয় বাপ রহিম, মোর বুকোৎ আয় বলি,
রাজা, কান্দেন রয়্যা রয়্যা।
রহিম কয়, এদ্দিন পর মোক্ যে ফিরি পানু
তা' মোর ভাগ্যে না হঙ্,
এই সে সোনার রূপধন, যার জন্য মুই
বহুবার জীবন ফিরি পাইচোঙ্।
রাজা কয়, রূপধন বেটি, মা, তুই সতী-কইন্যা,
তোক্ না হইল্ ভাগ্যে আর
রহিমোক্ ফিরি দেখা হইল্ না।
মন্ত্রী কয়, মোর বুকোৎ আয় মা রূপধন,
রাজা কয়, চল্ বাবা রহিম, চল্মা রূপধন,
মোর আঁধার রাজপুরীৎ ফিরি চল্ তমরা,
সগল লোকে কয়, ধইন্য রূপধন কইন্যা।
চলে রাজা, চলে মন্ত্রী, রহিম আরও রূপধন,
ইলিমপুরোৎ গিয়া সবে দিল দরশন।
যে শুনিবে সতীকন্যা রূপধনোকের কাথা,
ডাকিনী, যুগিনী, রোগ, বেয়াধি যায় পলাইয়্যা।

॥ আলোচনা ॥

আলোচ্য গীত-কথাটিও অনেকটা রূপকথা ধর্মী। তবে আসমান-তারার মত অতটা নয়। এর ভিতর বাস্তব এবং কল্পনার বেশ সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ-টি আমি সংগ্রহ করি দিনাজপুর (বর্তমানে যে অংশ বাংলাদেশের অন্তর্গত) জেলার পার্বতীপুর অঞ্চলের মুন্সী সাবেরুদ্দিন মিঞার কাছ থেকে। তিনি ঐ অঞ্চলে কোন একটি মাদ্রাসার শিক্ষক

ছিলেন। তবে, তার গান বাজনারও বেশ সখ ছিল। শোনা যায় ওই অঞ্চলের কোন একটি পালাগানের দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বলতে গেলে তারই সহায়তায় এই গীতিকাটি সংগ্রহ করতে সমর্থ হই। বলা বাহুল্য যে-গীতিকাটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি সেটি কোন একক প্রচেষ্টায় রচিত কিনা সন্দেহ। দিনাজপুর এবং পার্শবর্তী জেলা ও রংপুরেরও কোন কোন জায়গায় এই 'রূপধন কইন্যা'র পালাগান শুনতে পাওয়া যায়। প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কিছু কিছু কাজ রয়েছে, তাই সাঠিক করে বলা শক্ত কোন্ অংশটি কোন্ দলের (বা জেলার)। এগুলি দিনাজপুর জেলার গ্রামে গঞ্জে গানের দলের ভিতর বহুল প্রচলিত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এগুলিকে পালাগান নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

এই পালাগানের কাহিনীটির ভিতর একটা মস্তবড় জিনিস লক্ষ্য করুন—গল্পের নায়ক বা নায়িকা সবাই মুসলমান সমাজের। নাম, ধাম ও তাই, কিন্তু এর ভিতরকার কাঠামোটা যেন হিন্দু সমাজেরই। অনুসন্ধানে যতদূর জানতে পেরেছি এর কাহিনীকারও একজন (বা একাধিক) মুসলমান ভদ্রলোক, অথচ এর ভিতর হিন্দুদের হর-গৌরীর কথা বা কাহিনী কিংবা গুরুর মুখে মনসার জন্ম বৃত্তান্ত অথবা গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়েছে সে-গুলি যে কী-করে এর ভিতর ঢুকে পড়ল সেইটাই মস্তবড় আশ্চর্যের বিষয়।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, বিশেষকরে লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে যে কোন ভেদাভেদই ছিল না এই বাংলায়, এই গীতি-নাট্য গুলিই তার বড় প্রমাণ। হিন্দুদের স্বর্গের শঙ্কর-পার্বতী বা মনসা বা গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুদের দেব-দেবীরা যে মুসলমান সমাজের মধ্যেও কী ভাবে স্থান লাভ করেছেন সগৌরবে এ কথা ভাববার অবকাশ আছে। অসম্ভব নয় এই-গীতিনাট্যের অভিনেতা (অভিনেত্রী কোথাও থাকে বলে শুনিনি) এবং এর ব্যবস্থাপনায় যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই হাত ছিল এ কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ পাওয়া

যায়। তা' না হ'লে বাংলার অগণিত মুসলমান ফকিরের কণ্ঠে হিন্দু দেব-দেবীর গান অতটা জীবন্ত ভাবে ফুটে উঠতে পারত না।

কাহিনীটিকে অনেকে হয়ত পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বিখ্যাত "কাঞ্চনমালা" রূপকথার সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। কাহিনী হিসেবে "কাঞ্চনমালা" হয়ত অনেক সুবিন্যস্ত, কিন্তু তা' চিরকালই "রূপ কথা"ই রয়ে গেছে, লোক-গীত-কথার পর্যায় পড়েনি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দিনাজপুর এবং রংপুর জেলার বহুগ্রামেই এই পালাগানটি শোনা যায়। এক দলের গায়কী ভঙ্গী এবং কাহিনীর ভিতরও সামান্য সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তবে, এই কাহিনীটি কোন্ সময়ের সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে রচিত? নিঃসন্দেহে এটি বাংলায় মুসলমান আগমনের পরই সম্ভব—কিন্তু তখনও হিন্দু মুসলমানের ভিতর পুরো দস্তুর পৃথক সাংস্কৃতিক সত্ত্বা গড়ে ওঠেনি। আর তা' ছাড়া শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত' হিন্দু মুসলমানের পৃথক সত্ত্বা কিছু আছে বলে ত' মনে করবার কোন কারণই নেই। এ কাহিনীর রচয়িতা হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক সে প্রশ্ন এখানে নেহাৎই গৌণ! যিনিই এর রচয়িতা হোন'না কেন তিনি যে মন প্রাণে বাঙালী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এই কাহিনী সৃষ্টির সময় বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মুখ চেয়ে রচনা করেন নি। তা'র চোখের সামনে গাঁয়ে গঞ্জে যে অগণিত হিন্দু-মুসলমান নর-নারী একত্রে পাশাপাশি বাস করছে তাদের সম্মিলিত ছবিই ফুটে উঠেছে। তবে কাহিনীর ঘটনা বিন্যাসে মনে হয় এটি মঙ্গল কাব্যের যুগের পরে রচিত—তা' না হলে এর ভিতর মনসার উপাখ্যান বা শিব বিষয়ক কথা থাকত না।

যদিও এই লোক-নাট্য বা লোক-গীত-কথাটি দিনাজপুর ও রংপুর উভয় জেলায়ই প্রচলিত, তা'হলেও এর ভিতর দিনাজপুরের কথাই সর্বাধিক (অন্ততঃপক্ষে আমাদের সংগৃহীত এই গীতিনাট্য বা লোক-গীত-কথাটির ব্যাপারে)। তাই এটিকে দিনাজপুরেরই লোক-গীত-কথা বলতে বাধে না। মনে হয় সেইটেই যৌক্তিক।

॥ রূপবান কইন্যা ॥

কাহিনী

নিরাশপুরের বাদশার নাম ছিল একাব্বর বাদশা। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। দেশের লোক তাই তাঁকে বলত আঁটকুড়ো রাজা। উজির বাদশার কানে এ-খবর দেওয়ায় তিনি চটে গিয়ে তাকেই রাজত্ব থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু উজিরকে তাড়িয়ে দেবার পরক্ষণেই নিজের মনে অনুশোচনা এল—হায়, হায়, কেন তিনি তার এত দিনের রাজভক্ত উজিরকে তাড়ালেন। বাদশার মনে বৈরাগ্য উদয় হয়। তিনি তা'র রাজমুকুট সিংহাসনের উপর রেখে দিয়ে একাকী চুপি চুপি রাজবাড়ি এবং রাজধানী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন বনপথ ধরে।

বনপথ পার হবার পরেই সুমুখে পেলেন এক নদী। নদী দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেছে একখানা ছোট ডিঙ্গি নৌকো। বাদশা বললেন, মাঝি ভাই, আমাকে পার করে দেবে?

মাঝি বাদশাকে চিনতে পারে। সম্মত হয়, পার করে দিতে।

বাদশা নদী পার হয়ে প্রবেশ করলেন এক নির্জন বনে। সেখানে বসে ধ্যান করছিলেন এক মুনি। বাদশা হঠাৎ এসে পড়লেন তার সামনে। বাদশা তা'কে এই নির্জনস্থানে একাকী বসে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন,—কে? কে এখানে বসে? কথা কও, সাড়া দাও।

বাদশার হাঁক ডাকে মুনির ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলেই বাদশাকে দেখে রক্ত চক্ষে অভিশাপ দিলেন,—কে রে মূর্খ! আমার ধ্যান ভঙ্গ করলি, তোকে দিলাম আমি এই অভিশাপ, ছেলের জন্য বার বৎসর করবি অনুতাপ।

বাদশা অট্টহাসি হেসে বললেন, ঠাকুর, আমার কোন সন্তানই নেই, তাই এখানে এসেছি প্রাণ বিসর্জন দিতে।

মুনি বাদশার কথায় একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—তোর ছেলে হবে। তবে তার পরয়ায়ু মাত্র বার দিনের। তবে, এরও একটা বিহিত ব্যবস্থা আছে, যদি তোর ওই বার দিনের ছেলেকে কোনো বার বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারিস তা' হলে ওরা দু'জনেই বাঁচবে। তবে হ্যাঁ, ওই বারদিনের ছেলে আর ছেলের বৌকে কিন্তু বিয়ের রাত্রেই বার বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে।

মুনি এ-কথা বলেই সেখান থেকে চলে গেলেন। এদিকে রাণী জাহানারা রাজাকে রাজধানীতে না দেখে রাজ্যের সর্বত্র খুঁজে খুঁজে এক সময় এসে হাজির হলেন এই গভীর অরণ্যে। রাণীকে দেখেই রাজা কাঁদতে কাঁদতে এদিকের সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন।

খবর শুনে রাণীও কান্নাকাটি করেন। পরে দু'জনে অনেক শলাপরামর্শ করে ফিরে এলেন রাজধানীতে।

কিছুদিন বাদে সত্য সত্যই এক শুভ দিনে জাহানারা প্রসব করল এক পুত্র সন্তান, রাজার এতদিনের আঁটকুড়ো নাম ঘুঁচলো। উজিরও ফিরে এসে তা'র কার্যভার গ্রহণ করলেন। রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এল।

রাজা (বাদশা) রাজ্যে রাজ্যে ঘটক পাঠালেন তাঁর বারদিনের ছেলে রহিমের জন্য বার বছরের মেয়ের সন্ধানে। কিন্তু না, কোথাও পাওয়া গেলনা। যে শোনে এই অদ্ভুত প্রস্তাব, সেই বলাবলি করে,- রাজার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ?

এই সময় রাজার কানে এল, তারই উজিরের রয়েছে বার বছরের এক মেয়ে, নাম, রূপবান।

রাজা আর কালবিলম্ব না করে পাত্র, মিত্র নিয়ে এসে হাজির হলেন উজিরের বাড়িতে।

রাজা বিনা ভূমিকায়ই বলে বসলেন, দেখ উজির, আমি আমার বার দিনের পুত্র রহিমের সঙ্গে তোমার বার বৎসরের কন্যা রূপবানের

বিবাহের প্রস্তাব করছি। আশা করি তুমি আনন্দেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং আজ রাত্রেই তাদের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হবে।

উজিরত' মহারাজের এই অসম্ভব প্রস্তাব শুনে কিছুতেই রাজী হয় না। রাজারও রাগ বেড়ে যায়। তিনি হুকুম করলেন, উজিরকে সেই মুহূর্তে কারাগারে নিক্ষেপ করতে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে এসে হাজির হলেন রাণী জাহানারা এবং উজির-পত্নী রাহেলা।

রাণী জাহানারাও রাহেলাকে এই একই অনুরোধ জানালেন। বললেন, দেখ বোন, যদি তোমার রূপবানকে আমার রহিমের সঙ্গে বিয়ে না দাও, তাহলে সেও আর বাঁচবেনা!

জাহানারার অনুনয় বিনয়ে রাহেলার মন গলে যায়। সে বলে, দেখ বোন, এ বিষয়ে তো আমি কিছু বলতে পারিনা, তবে মা রূপবান যদি স্বেচ্ছায় এই বিয়েতে সম্মতি জানায় তা'হলেই কার্য সমাধা হতে পারে, নচেৎ নয়। কারণ, রূপবান হ'ল আমার সতীনের মেয়ে, আমি নিজে থেকে এ বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া উচিত নয়। এই বলে দুইজনে চলে রূপবানের-উদ্দেশ্য।

রূপবান রাহেলার সতীনকন্যা হলেও শৈশবেই সে মাতৃহারা হয়ে রাহেলার অপত্য স্নেহেই মানুষ হয়েছে। রাহেলাও কোন দিনই তাকে নিজের মেয়ের চাইতে কিছুমাত্র কম করে দেখেনি।

রূপবান অবশ্য শিশুকাল থেকেই ধাইমার কাছেই মানুষ। তা'র কাছেই তার যত আব্দার, তার কাছেই তার সব মনের কথা। এ বিয়ের কথা রূপবানের কানেও এসে পৌঁছেছে। সে ধাইমাকে এর সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

ধাইমা উত্তর দেয়, হ্যাঁ রূপবান, ঘটনা সত্য। প্রত্যেক নারী জীবনেই বিবাহের প্রয়োজন আছে। এজন্য চিন্তা করার কিছুই নেই।

এই সময় ঘটক বুড়ো, গাঁয়ের ছেলে বুড়ো যাকে দাদু বলে ডাকে

—এসে হাজির রূপবান এবং ধাইমার কাছে। সে এসে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বিয়ের প্রস্তাব দেয় রূপবানের কাছে।

বলা বাহুল্য রূপবান এক কথায়ই রাজী হতে পারেনা দাদুর এই অসম্ভব প্রস্তাবে।

দাদু এইবার মোক্ষম কথা বলেন, দেখ রূপবান, আমি সবই বুঝি, কিন্তু কী করব মা, এ বিয়ে যদি না হয়, তা'হলে তোমার পিতার প্রাণ-রক্ষা করাও সম্ভব হবেনা। তিনি মহারাজের আদেশে এখন কারাগারে অবস্থান করছেন।

রূপবান কাতর কণ্ঠে ঘটককে অনুরোধ-করে, দাদু, যে করেই হ'ক আমার পিতাকে মুক্তি করার ব্যবস্থা করুন।

দাদু উত্তর দিলেন, দেখ দিদি, তোমার পিতাকে মুক্তি দেবার ক্ষমতাত' আমার নেই, তবে তুমি যদি তোমার পিতাকে দেখবার ইচ্ছা কর, তা'হলে আমার সঙ্গে এসো, আমি অতি গোপনে তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাত করিয়ে দেব—এই বলে দাদু রূপবানকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায় যেখানে উজির মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

রূপবানত' বন্দী অবস্থায় পিতাকে দেখে কেঁদেই অস্থির। উজিরও রূপবানকে দেখে অতি কষ্টে উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করে নিয়ে বলেন, মা রূপবান, তুই আবার এই অসময়ে এখানে এলি কেন? এখান থেকে এক্ষুণি তুই পালিয়ে যা।

কারাগারের প্রহরীর মনেও দয়ার উদ্রেক হয়। সেও অনেক বোঝায় উজিরকে। তা'কে অনুরোধ করে এ-বিয়েতে মত দিতে। কিন্তু উজিরের এক কথা,—আমার প্রাণ যায় সেজন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নাই, কিন্তু তাই বলে আমি কিছুতেই রূপবানকে ঐ আঁতুরে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তাবে রাজী হতে পারিনা।

ক্রমে কারাগারে এসে হাজির হয় ঘাতক। রাজাদেশে সে উজিরের শিরশ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে।

রূপবান আবার অনুরোধ করে উজিরকে, বাবা, চল যাই আমরা এক্ষুণি এখান থেকে পালিয়ে যাই।

এদিকের এই সব কথাবার্তার মাঝে সেখানে এসে হাজির হন একাব্বর বাদশা স্বয়ং। এসেই হুঙ্কার ছাড়েন, কোথায় পালাবি তোরা? একাব্বর বাদশার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।

রূপবান এইবার বাদশার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে, মহারাজ, আমার পিতাকে হত্যা করবেন না, তাকে মুক্তি দিন।

বাদশা বললেন, দেখ রূপবান, যদি আমার পুত্র রহিমকে তুমি বিয়ে করতে রাজী হও, তা' হলেই তোমার বাবা মুক্তি পাবেন, নচেৎ নয়।

অগত্যা রূপবান স্বীকার করে, রহিমকেই স্বামী রূপে গ্রহণ করতে। রাজাদেশে উজিরও মুক্তি পায়। সকলে মিলে তখম একত্রিত হন উজিরের বাড়িতে রহিমের সঙ্গে রূপবানের বিবাহ বাসরে।

কাজী সাহেব বার বছরের রূপবানের সঙ্গে সাদী করিয়ে দিলেন বার দিনের শিশু-পুত্র রহিমের। এইবার রূপবানও চলল তার শ্বশুর বাড়ির দিকে, সঙ্গে রয়েছেন একাব্বর বাদশা ও রাণী জাহানারা। উজির এসে সাশ্রু নেত্রে বিদায়ের মালা পরিয়ে দিলেন রূপবানের কণ্ঠে।

রূপবান শিশু স্বামী নিয়ে এসে হাজির হল রাজপুরীতে। বাসরে বসে মাত্র বার দিনের শিশু-স্বামীকে কোলে তুলে নিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কী করেইবা সে এই শিশুকে মানুষ করে তুলবে—এইটেই এখন তার কাছে সবচেয়ে বড় চিন্তা।

ভাবতে ভাবতে হয়তোবা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল রূপবান। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। সে ঠিক করে, তার আর এখানে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়। এই মুহূর্তেই শিশু-স্বামীকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত।

এই চিন্তা করেই সে শিশু-স্বামীকে কোলে নিয়ে চুপিসারে রাজপুরী ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। যাবার পূর্ব মুহূর্তটি বড়ই করুণ। রূপবান এইবার সত্য সত্যই আড়াল থেকে বাদশা, বেগম,

এবং অপরাপর গুরুজনদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে যাত্রা করে অনির্দেশের পথে।

রূপবান রহিমকে নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে আসে রাজপুরী থেকে। সিংহদরজায় পথ আটকে দাঁড়ায় দারোয়ান। রূপবান কাকুতি মিনতি করে, পথ ছেড়ে দেবার জন্য।

দারোয়ান বলে, দরজা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, তা হলে আর তার গর্দান থাকবে না।

যাই হোক. রূপবানের কান্নাকাটি, কাকুতি মিনতিতে দারোয়ান দরজা ছেড়ে দেয়, রূপবান অন্ধকার পথ ধরে চলতে শুরু করে। ভগবানের উদ্দেশ্যে কাতর প্রার্থনা করে যেন জানতে চায়, এই ঘোর অন্ধকারে কোন্ পথেই বা সে যাবে?

রূপবান পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে নদীর ঘাট পর্যন্ত। সে চিন্তা করতে থাকে, কী-করেই বা সে নদী পার হবে? এমন সময় দেখে দূর থেকে একখানা ছোট ডিঙ্গি নৌকো সে দিকেই এগিয়ে আসছে।

রূপবান আকুল কণ্ঠে মাঝিকে অনুরোধ করে, তার নৌকোয় তাকে আর তার শিশু-স্বামীকে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে দেবার জন্য।

মাঝি রূপবানের কথায় ব্যথিত হয়ে তাকে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে দেবার জন্য নৌকা খোলে।

নদী পার হবার পর মাঝি খেয়া পারাপারের পয়সা চায় রূপধনের কাছে।

রূপবান এইবার বিব্রত হয়। তার কাছে পয়সাকড়িত' কিছুই নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ে, আসবার সময় তার শাশুড়ী তার পথের সম্বল স্বরূপে কি যেন বেঁধে দিয়েছিল তার কাপড়ের আঁচলে।

রূপবান আঁচল খুলে তাই দিয়ে দেয় মাঝির হাতে। মাঝি দেখে এক টুকরো সোনা!

কিন্তু হলে হবে কি, মাঝি ভাবল, এ মেয়েটা তাদের সঙ্গে চালাকী করছে—এক টুকরো পিতল দিয়ে তাদের ঠকাচ্ছে। এ পিতলের

টুকরোটা নিয়ে সে কী করবে ? ফেলেই দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় এক পথিক দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সেখানে এসে হাজির হয়। সে এসে মাঝিকে বলে, মাঝি ভাই ওই পেতলের টুকরোটা ত' তোমার কোনো কাজে আসবে না, তার চাইতে আমায় দিয়ে দাও, তার বদলে তোমায় আমি দু-আনা পয়সা দিচ্ছি।

মাঝি এ-কথায় তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে মাত্র দু-আনা পয়সার বিনিময়ে সোনার টুকরোটা পথিকের হাতে দিয়ে দিল। রূপবান তাই দেখে নিজের মনেই বলে উঠলো,--হারে বোকা মাঝি, হাতে সোনা পেয়েও চিনতে পারলি না ?

কিন্তু তখন আর করবার কিছুই নেই। মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ওপারে---আর সেই চতুর পথিকও তাড়াতাড়ি সে জায়গা ছেড়ে চলে যায়। রূপবান শিশু-স্বামীকে কোলে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে অনির্দেশের পথে,

রূপবান চলেছেত চলেছেই। চলার যেন আর শেষ নেই। হঠাৎ তার সুমুখে এসে হাজির দুই ষণ্ডা মার্কা দস্যু !

রূপবান তাদের দেখেই ভীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, কে কোথায় আছ রক্ষা কর।

এদিকে বনের অপর প্রান্তে জংলীদের রাজা শিকার না পেয়ে বসে বসে বিশ্রাম করছিল, হঠাৎ তার কানে গিয়ে পৌঁছায় রূপবানের আকুল আবেদন। জংলী-রাজ তক্ষুণি সেই ডাক লক্ষ্য করে ছুটে এসে হাজির হয় সেখানে। তাকে দেখেই দস্যুরা পালিয়ে যায়। জংলী-রাজও মহাসমাদরে রূপবান ও রহিমকে প্রথমে তার ঘরে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু রূপবান সে কথায় রাজী না হওয়ায় জংলী-রাজ সেই বনেই তাদের জন্য এক লতাপাতার কুঁড়ে বানিয়ে দিল এবং নিজে সর্বদা দেখা শোনা করতে লাগল।

রূপবান শিশু-স্বামীকে নিয়ে সেই বনেই থাকে। কখনওবা ঘরের কাজ কর্ম সেরে, স্বামীকে পাশে শুইয়ে রেখে আপন মনে বসেবসে গানওগায়।

এই রকম একদিন রহিমকে ঘরের দাওয়ায় শুইয়ে রেখে সে কলসী নিয়ে গেছে ঘাটে জল আনতে। ফিরে এসে দেখে, কোথা থেকে একটা বাঘ এসে রহিমকে আক্রমণ করবার উপক্রম করছে।

রূপবানত' দেখেই চিৎকার করে ওঠে,—কে, কোথায় আছ তোমরা এসে আমার স্বামীকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা কর।

তারপর বাঘের উদ্দেশ্যে মিনতি জানায়,—হে পশুরাজ, তুমি আমার পতির প্রাণ ভিক্ষা দাও, পরিবর্তে আমায় খেয়ে তৃপ্ত হও।

এদিকে রূপবানের আকুল আবেদন আবার গিয়ে পৌছয় জংলী-রাজার কাছে। মুহূর্তমধ্যে বর্শা হাতে এগিয়ে এসে বাঘকে ঘায়েল করে দেয় জংলী-রাজ। তারিফ করেন, রূপবানের সাহসের আর সেই সঙ্গে তার পতিভক্তির।

এই ঘটনার পর, রহিমকে নিয়ে আর ওই জনশূন্য বনে থাকা সমীচীন মনে করেনা রূপবান। শিশু স্বামীকে কোলে তুলে নিয়ে আবার তার যাত্রা শুরু হয় অনির্দেশের পথে।

রূপবান হেঁটে চলেছে। দিনযায়, রাত হয়। রাত গিয়ে আবার দিনের দেখা মেলে। হঠাৎ দেখে, কাছেই এক মালিনীর বাড়ি। রূপবান কি ভেবে সেই বাড়ির ভিতর ঢুকে, মাসী মাসী—বলে ডাকাডাকি শুরু করে।

রূপবানের ডাকে মালিনী মাসী এগিয়ে এসে রূপবান এবং রহিমকে দেখে এবং তার মুখ থেকে তার দুঃখের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই সময় থেকেই তার বাড়িতেই রহিম এবং রূপবানের থাকার ব্যবস্থা হল।

দিন যায়। রহিম মালিনীর বাড়িতে রূপবানের পরিচর্যায় ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ওঠে। একদিন তাকে পাঠশালাতেও ভর্তি করে দেওয়া হয়। পাঠশালাতেও সে সেরা ছাত্র রূপে পরিগণিত হয়।

তার সঙ্গেই পড়ে সেই দেশেরই বাদশা ছায়েদের মেয়ে তাজেল। সে কিছুতেই কোন বিষয়েই রহিমের সমকক্ষ হতে পারেনা। তাতে

বাদশা ক্রমশঃই কুপিত হয়ে পড়ছিলেন রহিমের উপর।

কী-ভাবে রহিমকে জব্দ করা যায়, সেই ফন্দিই দিবারাত্রি মনে মনে আঁটছিলেন ছায়েদ বাদশা।

স্কুলের গুরুমশাই ছিলেন বাদশার অনুগৃহীত জীব। তাই তিনিও প্রকারান্তরে-রহিমের উপর নির্যাতন করতে ছাড়তেন না।

দিনে দিনে রহিমের বয়স বাড়ে। সে একদিন প্রশ্নকরে, রূপবান, তুমি আমার কে হও?

রূপবান তখনকার মত উত্তর দেয়, তুমি দাদা আমি বোন, আমি দিদি আর তুমি হলে ভাই।

রূপবান এইভাবে নানা কথায় ভুলিয়ে রহিমকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু হঠাৎ রহিম আবার ফিরে এসে প্রশ্নকরে, দিদি তোমার নাম কি?

রূপবান অবাক হয়ে প্রশ্নকরে, কেন, কে জিজ্ঞেস করেছে এ-কথা?

রহিম বলে, গুরুমশাই। আজ আমার দশটা টাকা লাগবে স্কুলে।

রূপবান বুঝতে পারে, কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলেছে—তাকে এবং রহিমকে ঘিরে। তাই মুখে কিছু না বলে রহিমের হাতে দশটা টাকা দিয়ে স্কুলের পথে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে ঘরে।

এদিকে ছায়েদ বাদশা লোক মুখে শুনেছে,—রূপবানের রূপের খবর। তার মন তক্ষুণি লালসায় উগ্র হয়ে উঠ্‌ল,—রহিমকে শায়েস্তা করে রূপবানকে লাভ করতে। সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারকে ডেকে হুকুম দিলেন, দেখুন মাষ্টার সাহেব, রহিমকে বলে দেবেন, কাল যদি সে জরির জামা এবং উড়িয়াবাজ-ঘোড়ায় (পক্ষীরাজ জাতীয়) চড়ে স্কুলে না আসে তা'হলে তাকে আর স্কুলে ঢুকতে দেবেন না।

মাষ্টারসাহেবও যথারীতি বাদশার আদেশ জানিয়ে দিলেন রহিমকে।

রহিম বরাবরই লেখাপড়ায় ভাল এবং স্কুলের সেরা ছাত্র। বাদশা কন্যা তাজেল তার সহপাঠিনী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মনে প্রাণে সে

রহিমকে ভালবাসে তার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, তার বিদ্যা এবং বুদ্ধির জন্য।

রহিমের উপর বাদশার এই আদেশ শুনে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্ররা মহাখুশী,—রহিম, কাল খুব জব্দ হবে—এই ভেবে।

রহিম চিন্তিত হয়,—তারা গরীব, এত টাকা কোথায় পাবে ?

রহিমের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে তাজেলও ব্যথিত হয়। তাই অন্যান্য বালক বালিকারা যখন তাকে খেপাতে শুরু করল, তখন তাজেল এগিয়ে এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়, তুমি কিছু ভেবোনা, আমি তোমাকে তোমার জন্য জরির জামা আর উড়িয়াবাজ ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেব।

রহিম বলে. না তাজেল, তোমার জরির জামা, জুতো বা ঘোড়া কিছুই আমার চাইনা। আমার দিদিই আমায় এ-সব যোগাড় করে দেবে।

এদিকে রহিমের আসতে দেরী দেখে রূপবান রহিমের খোঁজে তার স্কুলে গিয়ে আড়াল থেকে রহিম ও তাজেলের কথপোকথন শুনে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে।

রহিম ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এসে ঢোকে বাড়িতে। এসে দেখে তার দিদি (রূপবান) ঘরে নেই। সে মাসীর কাছে তার দুঃখের কথা বলে। মাসী তাকে শান্ত করে বলে, তুমি কিছু চিন্তা কোরোনা, তোমার দিদি (রূপবান) তোমাকে উড়িয়াবাজ ঘোড়া আর জরির জামা, জুতো কিনে দেবে।

মাসীর কথায় রহিম কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে স্থানান্তর গমন করলে সেখানে এসে হাজির হয় রূপবান। আড়াল থেকে সে সবই শুনেছে। তার একমাত্র ভরসা জংলী-রাজকে স্মরণ করে।

রূপবানের আকুল আবেদন গিয়ে পৌছয় জংলী-রাজের দরবারে।

জংলী-রাজ খবর পেয়েই ছুটে আসে রূপধনের কাছে। সেই যোগাড় করে দেয় উড়িয়াবাজ ঘোড়া আর জরির জামা, জুতো।

পরদিন রহিম স্কুলে যায় জরির জামা, জুতো পরে উড়িয়াবাজ ঘোড়ায় চেপে।

তাকে ঐ বেশে দেখেই মাষ্টার মশাই বলে উঠ্‌লেন, দেখ রহিম, তোমার উপর বাদশার নতুন আদেশ হয়েছে, কালকে তোমাকে হাতী পিঠে চেপে স্কুলে আসতে হবে, তা' না হলে তোমাকে আর ক্লাসেই ঢুকতে দেওয়া হবেনা। আর তা' ছাড়া তোমার আসল পরিচয়টাও কালকে জেনে আসবে। কালকে যখন তোমাকে তোমার দিদি বাইরের ঘরে বসিয়ে ভাত খেতে দেবে তখন তুমি বলবে যে, তুমি রান্নাঘরে বসে খাবে। আর যখন তোমা দিদি তোমায় ভাত দিতে আসবে, তখনই তাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে, তা'হলেই জানতে পারবে সে তোমার কী হয়।

গুরুমশাই ত' এই বলে রহিমকে বিদায় দিয়ে স্কুল ছুটি করে দিলেন। রহিম আবার ভাবনায় পড়ে, হাতী কোথা থেকে যোগাড় করবে সে, আর কেইবা কিনে দেবে তাকে হাতী ?

রহিমের জন্য তাজেল সর্বদাই চিন্তিত, ব্যথিত। রহিমের বিপদের কথা শুনে সে বলে, দেখ রহিম, আমার এ জীবন, যৌবন সবই তোমার জন্য, তুমি কিছুমাত্র চিন্তা কোরোনা, আমিই তোমাকে হাতী কিনে দেব, একবার শুধু আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

রহিম উত্তর দেয়, দেখ তাজেল, তুমি হলে বাদশা কন্যা, তোমাকে ভালবাসলে লোকে তোমাকে নিন্দা করবে। আর তা' ছাড়া আমার দিদি যদি জানতে পারে, তা'হলে সেও মনে খুব দুঃখ পাবে।

তাজেল বলে, দেখ, লোকের কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনা। তুমি দয়া করে একবার আমার বাড়ি চল, আমার সর্বস্ব তোমায় দান করব।

রহিম বলে, দেখ তাজেল, তোমার বাবা যদি এ-কথা জানতে পারেন, তা' হ'লে তিনি আমার মাথা নিয়ে নেবেন। তবু তুমি সত্য করে বলতো, তুমি আমায় হাতী কিনে দেবে তো ?

তাজেল বলে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তুমি এখানে একটু বোস, আমি এক্ষুণি আসছি—বলে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় সেখানে এসে হাজির হয় রূপবান।

রূপবান রহিমকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

পরদিন সকালে রহিম মাসীকে ডেকে বলে, দেখ মাসী, আমি আর বাইরের ঘরে বসে ভাত খাবনা। দিদি কোথায় গেছে ?

মাসী বলে,—রান্নাঘরে, তুমি সেখানে যাও।

মাসী এই বলে সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই ঘরে এসে ঢোকে রূপবান, হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রহিম তাকে দেখেই বলে ওঠে,—আমি তোমার হাতে ভাত খাবনা, আগে সত্য করে বল, তুমি কে ?

রূপবান বলে, সে অন্যদিন শুনো।

রহিম রেগে গিয়ে বলে,—তা'হলে তুমি আমার চোখের সুমুখ থেকে দূর হও।

রূপবান অনেক কাকুতি মিনতি করে, অনেক ভাবে সাধ্য সাধনা করে ভাত খাবার জন্য। কিন্তু রহিমের এক গোঁ,—হয় তুমি এখান থেকে দূর হও, তা' না হলে আমি চলে যাচ্ছি।

রূপবান অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে, না দাদা, তুমি কেন যাবে, এ দাসীই জন্মের মত বিদায় হয়ে যাচ্ছে—

রহিম প্রশ্ন করে, এ-কথার অর্থ ?

রূপবান কৌশলে আদ্যপান্ত সব কথাই বলে, শুধু বাকী রাখে উভয়ের আসল পরিচয়টা দিতে। রহিম সদন্তে বলে, সে যাবে তার দুলাভাইকে (ভগ্নীপতি অর্থাৎ রূপবানের পতি) খুঁজে আনতে। তার জন্যইত' তার এমন সোনার দিদির আজ এত কষ্ট ! !

রূপবান রহিমের আস্ফালন শুনে মুখে কিছু বলেনা, মনে মনে হাসে।

রহিম তখনকার মত ঠাণ্ডা হয়ে আস্তে আস্তে স্কুলের পথ ধরে। স্কুলে এসে শোনে, ছায়েদ বাদশা প্রচার করেছে, রহিমকে তার ঘোড়ার

সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জিততে হবে। যদি সে জেতে তা'হলে পাবে প্রচুর পুরস্কার—না হলে তাকে আর স্কুলেই ঢুকতে দেওয়া হবেনা।

এ-কথা শুনে রহিম ছায়েদ বাদশার ঘোড়ার সঙ্গে বাজী ধরে দৌড় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে এলো এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে বাজীও জিতে গেল। কিন্তু পুরস্কার চাইতে গেলেই বাদশা তাকে বন্দী করে রেখে দিল কারাগারের অন্ধকার কক্ষে। হুকুম হল, কাল প্রভাতে কারাগারের প্রহরীরা তাকে বেত্রাঘাত করবে।

এদিকে রহিম এইভাবে কারাগারে বন্দী, অপর দিকে রূপবান চিন্তিত, —আজ ওর এত দেরী হচ্ছে কেন, এখনও কেন তার প্রাণনিধি ফিরে আসছে না?

এমন সময় রাজবাড়ির দারোয়ান এসে খবর দিল,—রহিম ছায়েদ বাদশার কারাগারে বন্দী।

খবর শুনেইত' রূপবান কেঁদে আকুল। এখন সে কী করবে? কাঁদতে কাঁদতে মাসীকে ডেকে তার হাতে এক চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল জংলী-রাজার কাছে। তার এই বিপদের দিনে সেইতো একমাত্র ভরসা।

রূপবানের ডাক পেয়ে তক্ষুণি সেখানে এসে হাজির হল জংলী-রাজ। কথা দিল, যে করেই হোক সে ছায়েদ বাদশাকে পরাস্ত করে রহিমকে ফিরিয়ে এনে দেবে তার কাছে।

কিন্তু ছায়েদ বাদশা আঁড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের পিছনেই। তাই, যে মুহূর্তে জংলী-রাজ বাইরে চলে গেল, সেও সেই মুহূর্তে এসে আবির্ভূত হল রূপবানের সম্মুখে।

ছায়েদ চেষ্টা করল রূপবানকে হরণ করে নিয়ে যেতে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে অসি হস্তে এসে প্রবেশ করল তাজেল।

ছায়েদ প্রথটায় বাধা পায়। কিন্তু পরে এদের দুজনকেই পরাস্ত করে রূপবানকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তখন রূপবান

১৭

"আব্বা-আব্বা" বলে ঘন ঘন ডাকতে থাকে বিপদের বন্ধু জংলী-রাজের উদ্দেশ্যে।

রূপবানের কাতর কণ্ঠের ডাক পেয়ে জংলী-রাজ ওদিকের কাজ বন্ধ রেখে ছুটে চলে আসে এখানে, আর ছায়েদকে পরাজিত করে রূপবান ও তাজেলকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় যেখানে রহিম তখনও কারাগারে বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছে। তাজেল এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে মুক্ত করে দেয় রহিমকে।

রহিম মুক্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু সে একা। পথ চেনেনা। বরাতের উপর ভরসা করে হাটতে থাকে। কোন্ পথে যাবে সে কে জানে। হঠাৎ পথের মধ্যে দেখা হয়ে যায় তার স্কুলের সেই গুরুমশাইয়ের সঙ্গে।

গুরু মশাই তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ দেন, কী ভাবে রূপবান তার কে হয়—এই সত্য জানবার কৌশল সম্পর্কে।

রহিম গুরু মশাইয়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে আবার চলতে থাকে।

রহিম নিরুদ্দেশ। কে জানে সে কোথায় রয়েছে। একাকী নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে বিলাপ করতে থাকে রূপবান। এই সময় এক বৈরাগী ঠাকুরের ছদ্মবেশে রহিম সেখানে এসে হাজির।

রূপবানকে ঐ ভাবে বিরস বদনে বসে থাকতে দেখে ছদ্মবেশী রহিম তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু ছদ্মবেশী রহিমের সঙ্গে কথাবার্তায় রূপবানের কেমন যেন সন্দেহ জাগে মনে, —ঠাকুরকে যতই দেখছি, যতই তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার মন ঠিক সায় দিচ্ছেনা। মনে হচ্ছে, এ যেন আমার কত আপন জন—এই ভেবে বৈরাগী ঠাকুরকে সে প্রশ্ন করে, আচ্ছা ঠাকুর, তোমার নাম কি ?

ঠাকুর একটু হেঁয়ালীর ভাষায় উত্তর দেয়,—

"রামের বামে থাকি আমি গো,
অ-সখি, রহিম আমার মিতাজী,
শোন সখি, সখি গো।"

এই সময় ঠাকুর বলে, তোমার হাতখানা আমার হাতে দেও দেখি, আমি গণনা করে বলে দিচ্ছি তোমার স্বামী কোথায় আছে—এই বলে ছদ্মবেশী রহিম রূপবানের হাত ধরতে যেতেই রূপবান রাগত ভাবে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, আর এই টানাটানিতে রহিমের ছদ্মবেশও খসে পড়ে। মিলন হয় দুজনের মধ্যে।

ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় তাজেল। সে বলে, আজ থেকে দিদি আমি তোমাদের দাসী হয়ে রইলাম।

এসে পৌঁছয় ছায়েদ বাদশা। সে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায় রহিম ও রূপবানের কাছে। জংলী-রাজাও এসে গেছে। বলে, মা রূপবান, তোদেব অজ্ঞাতবাসের দ্বাদশ বর্ষ আজ পূর্ণ হয়েছে, চল এবার তোদের পৌঁছে দিয়ে আসি তোদের নিজ রাজ্যে —এই বলে জংলী-রাজ তাদের নিয়ে চলে আসে নিরাশপুরে—রহিমের পিতৃরাজ্যে, একেবারে একাব্বর বাদশার সামনে।

খবর পেয়ে রাজসভার ভিতরেই পাগলিনীর ন্যায় এসে পৌঁছোন রহিমের মাতা জাহানারা। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন তাদের রহিম আর রূপবানকে।

এসে যান উজীর সাহেবও। সভাস্থ সকলের সুমুখে একাব্বর বাদশা নিজের তাজ খুলে পরিয়ে দেন রহিমের মাথায়। বলেন, আজ থেকে তুমিই হলে এ-রাজত্বের রাজা, আর আমার দুই মা তাজেল ও রূপবান হল রানী।

আনন্দে মেতে উঠলো পুরবাসীরাও। সাত দিন, সাত রাত ধরে চলল্ খানা পিনা, আমোদ আহ্লাদ হৈ-চৈ।

॥ কাব্য ॥

(এক)

(হারে) শোনেন সবে ভক্তিভাবে হিন্দু মুছলমান,
নিরাশপুরের একাব্বর বাদশার এক কাহিনী বিদ্যমান।
দুঃখের কথা কি-বা কইমু কইতে পরাণ যায়,
পোলাবিনা রাজার আঁটকুড়া নামও না যায়।
একদিন ফয়জোরে রাজা উজিররে বোলায়,
ক'ন দেহি উজির মশাই পেরজায় কী-না কয়।
উজির কয়, জাঁহাপনা সত্য কইছি মুই,
আঁটকুড়া রাজার রাজ্যে থাকবে না আর কেউ।
রাজা কয়, আমার কর্মচারী হইয়্যা কিনা এতদূর আস্পর্দা,
আইজ থিকা বরখাস্ত কইরা তোমায় করুম শায়েস্তা।

উজির কয়, সেই না ভাল কথা কইয়্যাছেন আপুনি,
রইলো আপনার উজিরগিরি, মুই চললাম্ এখুনি।
এইনা কথা কইয়্যারে উজির বিদায় হইয়্যা যায়,
একাব্বর বাদশা মোনের দুঃখে করে হায় হায়।
রাজা ভাবে, যে রাজত্বে মোরে কেউ না ভালবাসে,
কি-বা সুখে রইমু হেথায় যাইমু পরবাসে।

এইনা ভাইব্যা রাজা তহন খোলে মুকুট মাথার উপার থিকা,
সিংহাসনে রাইখ্যা মুকুট চলে লামান দিয়া।
(হারে) মোনের দুঃখে একাব্বর বাদশা গ্যাল বিবাগী হইয়্যা,
আঁধার নিশৈতি (১) কালে রাণী-জাহানারা
আইলো খোঁজের লইগ্যা।
(হায়রে) পইর‍্যা রইছে সোনার সিংহাসন দরবার মইধ্যে খানে,
জাহানারা দেইখ্যা হেয়া মস্তকে করাঘাত হানে।

নিশিরাত্রি = গভীর রাত্রি

কান্দিতে কান্দিতে রাণী চলে অন্তঃপুরে,
সেই না কালে উজির আর রাহেলা আইস্যা প্রবেশ করে।
রাহেলা কয়, শোন গো পতি কহিগো তোমারে,
হারাজীবন নুন খাইছি এইবার একখান কাম
করণ লাগে।
চল যাই বেগমসাহেবারডে কহি তারে কথা,
য্যামন ত্যামন কইর‍্যা ফিরাইয়্যা আনুমু রাজারে
এর না করুম অন্যথা।
এই যুক্তি না কইর‍্যা দুইও জন পুরীর মইধ্যে ঢোকে,
ইদিগেতে বাদশা আইসে নদীর কিনারে।
ওগো সেইনা ঘাটে খেয়া দেয় উস্‌মান মাঝি,
দিনে রাইতে বায় নৌকা বিশ্রাম নাহি জানি।
হারা দিন বায় নাও (২) গায় কতনা গান,
বাতাসের টানে টানে জুড়ায় পরাণ।
ক্যামনে পাড়ি দিবরে ঢেউ উঠ্যাছে সাগরে রে,
দিবা নিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইয়্যা।
মোনরে যারা ছিল চতুর নাইয়্যা,
তারা গ্যাল আগে বাইয়্যা (রে)॥
আমি অধম রইলাম বইস্যা ভাঙ্গা তরী লইয়্যা (রে)॥
দিবা নিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইয়্যা॥
মাঝিরে দেইখ্যা বাদশা কয়, শোন্ আমার কথা,
পরপারে দ্যাও পৌছাইয়্যা খাও আমার মাথা।
মাঝি বাইয়্যা যাওরে—
অকূল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙ্গা নাওরে
(মাঝি বাইয়্যা যাওরে)॥

(২) নৌকো

ওরে ভেন্না কাষ্ঠের নৌকাখানি মাঝখানে তার গুড়া,
নৌকা আগার থাইক্যা পাছায় গ্যালে গলুই যাবে খইয়্যা,
(মাঝি বাইয়্যা যাওরে) ॥
ওরে দীক্ষা শিক্ষা না অইতে আগে করছ বিয়া,
এহন বিনা খতে গোলাম হইলে গাঁইটের ট্যাহা দিয়া।
(হারে) বিত্তাশে বিপাকে যার ব্যাটা মারা যায়,
পাড়া পড়শী না জানিলেও আগে জানে তার মায়।
(মাঝি বাইয়্যা যাওরে) ॥
নায়ের থিকা নাইম্যা বাদশা অরুণ (৩) জোঙ্গলে ঢোকে,
নির্জন বনস্থলীতে এক মুনি বইয়্যা রইছে।
চৌক্ষু বুঁইজা মুনিবর ধেয়ানে অচেতন,
সাড়া জাগাইতে বাদশা জুড়িল কান্দন।
ধেয়ান ভাঙ্গিয়া মুনি তহন ক্রোধান্বিত হন,
বলে, তোরে দিলাম এই অভিশাপ,
ছাওয়ালের জন্য বার বচ্ছর করবি অনুতাপ।
হাসিয়া বলেরে বাদশা, কী কইলা মুনিবর,
পুত্রের অদর্শনে বৈফল (৪) জীবন মোর।
মুনি কয়, আমার বাক্য কভু লঙ্ঘন না হয়,
পুত্র তোর জন্ম নিবে এই কইলাম নিচ্চয়।
কিন্তু পুত্রের বয়স যখন দ্বাদশ দিবস হবে,
সেইও দণ্ডে পুত্রফল তোর অকালে ঝরিবে।
বাদশা কয়, এমন বর ফিরৗা ন্যাও তুমি,
বিহিত যদি কবার (৫) পার বলেনত' এখুনি।
মুনি কয়, বিহিত এট্টা হবার পারে যদি মোনে কর,
বারদিনের পোলার লগে বারবচ্ছরের মাইয়্যার
বিয়া দেবার পার।

(৩) গভীর জঙ্গলে (৪) বিফল = ব্যর্থ (৫) বলিতে পারা,

বিয়ার রাইতে ঐ না পুত্র আর পুত্রবধূ যে হবে,
তাদের নিব্বাসন দিবা বার বচ্ছুরের তরে।
বাদশা কয়, তোমার চরণে মোর শতেক সেলাম,
এমন বাক্য ফিরা৷ নিয়া মোরে কর তোমার গোলাম।(৬)
এই কথা শুন্যা মুনি অট্টহাসি হাসে,
আশীর্বাদ না অভিশাপ কে-বা তাও গোনে।
বিষণ্ণ হইয়্যা বাদশা তহন জুড়িল কান্দন,
তার কান্দন শুন্যা আইলো জানারা (৭) বেগম।
পত্নীরে দেইখ্যা বাদশায় কয় দুঃখিত অন্তরে,
শোন শোন প্রণাধিকে কী কব বা তোমারে।
মুনির দোয়াতে মুই পাইয়্যাছি পুত্র-বর,
হরিষে বিষাদ বয়স তার বারদিন মাত্তর।
শুধু তাই নয় ওগো শোনো সোমাচার,
ঐ না বারদিনের পোলার লগে
বিয়া হ্যাও বার বচ্ছরের কইন্যার।
বিয়ার রাইতে পোলা বউরে দিলে নিব্বাসন,
বারটা বচ্ছর শ্যাষে তারা দিবে দরশন।
জাহানারা কয়, স্বামী, সোম্বাদ (৮) ত' গুরুতর,
হউক যতনা কষ্ট যাউক আঁটকুড়ী নাম মোর।
এই কথা বলবলি কইর‍্যা দুইজনে রাজধানীতে যায়,
দেইখ্যা দেইখ্যা পরজাগণে আনন্দে তাকায়।
উইদিগেতে উজির-ঘরে রাহেলা বিবি কয়,
উজির সাইবের চৌউখ্ দুইডা কানা,
মা রূপবান যে ডাঙ্গর (৯) হইছে হের বিয়ার
কথা ক্যান কন্ না।

(৬) দাস (৭) জাহানারা বেগম। (৮) সংবাদ=খবর (৯) যুবতী

উজিরে কয়, বইল্যাছত' ঠিক,
সৎপাত্তরের লাইগ্যা মুই ফিরমু দিগ্ বিদিগ্।
কথা কয় দুইও জনে ভাবে নানা কথা,
এমন কালে দরজায় আইলো একাব্বর বাদশা।
বাদশায় কয়, শোন উজির, ঘোরলামত' বিস্তর,
কুমারের লাইগ্যা কইন্যা না পাইয়্যা মুই
না হই সুস্থির
তোমার কইন্যা মা রূপবান রূপে গুণে ধইন্যা,
তার লগে রহিমের সাদী দেও এই মোর ভিক্ষা।
উজির কয়, জাঁহাপানা, এমন কথা সম্ভব না হয়,
বার বচ্ছরের যোবতি কইন্যা রূপবানের লগে
রহিমের সাদী কভু নাহি হয়।
এমন অসম্ভব কথা জাঁহাপানা আর না কহিবেন,
বেয়াদ্দাপি যদি হয়, ক্ষেমা করি নেবেন।
বাদশা কয়, শোন উজির, এ-বিয়া না হইলে
রহিমের প্রাণ বুঝি না বাঁচে,
রূপবানেরে দান দিয়া তুমি প্রাণে বাঁচাও তারে।
রূপবানের অইলে সাদী আমার পোলার লগে,
সারা জনম থাকবে সুখে রাজারাণী হইয়ে।
উজির বলে, জাঁহাপানা, ক্ষ্যামা দ্যান মোরে,
এ-হেন অনিজ্য পরস্তাব আর না শুনিবারে পারে।
বাদশা কয়, আমার প্রস্তাব তুচ্ছ করলে
কী ফল তা জান,
উজির বলে, মৃত্যু দণ্ডই আমার একমাত্র কাম্য।
বাদশার আদেশে রক্ষী বান্ধে উজিরের হাতে,
সেইও না কালে ঘটনাস্থলে জাহানারা
আর রাহেলা আইস্যা প্রবেশ করে।

জাহানারা বলে, বুইন (১০) আমার মাথা খাও,
রূপবানেরে সাদী দিয়া রহিমরে বাঁচাও।
অনেক চেষ্টা করছি বুইন না পাইলাম হেন কইন্যা,
শ্যাষ তক(১১) তোমার দুয়ারেই দিলাম আইজ ধন্না(১২)।
রাহেলা বলে, বুইন তোমার পরস্তাব মানি,
রূপবান মোর সতীনকন্যা রাজী হইলে
হেরে(১৩) নিও আপনি।

চল তয়(১৪) চল বুইন, ত্বরা করি যাই,
রূপবানেরে বুজাইয়্যা বুইন এহন ইজ্জত বাঁচাই।
ঘরের দাওয়ায় বইয়্যা রূপবান দাইমারে কয়,
কি জানি, কি শুনি দাইমা গো,
ও দাইমা, কি শুনিলাম কানে গো
আমার দাইমা, দাইমা গো,
পাড়ার লোকে সবে বলে গো
'ও রূপবান, তোমার হবে বলি(১৫) গো'
আমার দাইমা দাইমা গো।

দাইমা কয়, শোন রূপবান নতুন কিছু নয়,
মোরও হইচে, তোরগোও হবে এই কইলাম নিচ্চয়।
রূপবান কয়, আমার বাড়ির দক্ষিণ পাশে গো
ও দাইমা, কীসের বাইদ্য বাজেগো
আমার দাইমা, দাইমা গো।

ঢোল বাজে, কাঁসর বাজেগো,
ও দাইমা আরও বাজে বাঁশী গো,
আমার দাইমা, দাইমা গো।

---

(১০) ভগ্নী (১১) শেষপর্যন্ত (১২) ধর্ণা = আকুল আবেদন জানানো।
) তাহাকে (১৪) তবে (১৫) বধ = মৃত্যু

বাজাইতে বাজাইতে আসে গো
ও দাইমা আসে মোদের বাড়ি গো
আমার দাইমা, দাইমা গো।
শোন, শোন, শোন রূপবান গো,
ও রূপবান বলি যে তোমারে গো
শোন রূপবান, রূপবান গো।

এই কথানা শ্যাষ অইলে ঘটক আইলো ঘরে,
রূপবানেরে ডাইক্যা কয়, কবুল কর খুসী মনে,
বারদিনের বাদশাজাদার লগে সাদী দিয়া দিমু আনে।

শোনেন, শোনেন, শোনেন দাদুগো,
ও দাদু বলি যে আনফারে(১৬) গো,
শোনেন দাদু, দাদু গো॥

বারদিনের ছেইলার লগে গো,
ও দাদু, কোন্ হ্যাশে বা বিয়া গো
শোনেন দাদু, দাদুগো।
দাইমা কয়, শোন, শোন, শোন রূপবান গো,
ও রূপবান, বলি যে তোমারে গো
শোন রূপবান, রূপবান গো,
দাদু আইছে ঘটক হইয়্যা গো,
ও রূপবান কবুল কর তুমি গো,
শোন রূপবান, রূপবান গো॥
জোয়ার-যৈবন আমার গো,
ও দাইমা যাবে গাঙের ভাটিগো
আমার দাইমা, দাইমাগো।
জোয়ার যহন আসে দাইমা গো

(১৬) আপনাকে

ও দাইমা নদী থাহে ভরা গো,
আমার দাইমা, দাইমা গো।
ভ্রমর বিনে ফুলের মধুগো
ও দাইমা যাবে শুকাইয়্যা গো,
আমার দাইমা, দাইমা গো।
আমার যৈবন বৃথা যাবেগো
ও দাইমা একি বিধির লিখন গো
আমার দাইমা, দাইমা গো।
সোয়ামী বইল্যা কবুল কর রহিমেরে রূপবান,
নচেৎ তোমার পিতার যাবে চলি জান।
আমার পিতা কোথায় আছেন গো,
ও দাতু বলে দেন আমারে গো
শোনেন দাতু, দাতুগো ॥
তোমার পিতা উজীর সাইব রইছেন কারাগারে,
তুমি সাদি কবুল করলেই তার মুক্তি হবার পারে।
হাতে ধরি, পায়ে ধরিগো
ও দাতু মুক্তি করেন পিতারে
আমার দাতু, দাতুগো।
ঘটক বলে, শোন রূপবান, বলি হাচা(১৭) কথা,
চইল্যা আস এইদণ্ডে দেখবা যদি তোমার পিতা।
এই কথা না যুক্তি কইর‍্যা তুইওজনে বিদায় হইয়্যা যায়,
বন্দীদশায় উজিরের বৃত্তান্ত কিছু শুনেন গো মশায়।
প্রহরী কয়, উজীর সাইব, শ্যাষ ইচ্ছা আছে কী আপনার,
'কিছু নাই' উজির কয়, এই সোমাচার।
উজির সাইব, ভাইব্যা ছ্যাহেন আছে এহনও কিছু সোমায়,
মা রূপবানেরে ছ্যাখলাম না এই আক্ষেপ মরণ সোমায়।

(১৭) সত্য কথা

প্রহরী কয়, সময় উৎরাইয়্যা যায়,
আল্লারডে(১৮) দোয়া মাঙেন এই শ্যাষ ব্যালায়।
উজির কয়, আল্লার দরবারে মোর কোন আরজি নাই,
তোমার কর্তব্য শ্যাষ করেন, প্রহরী মশাই।
উজিরের কথায় জল্লাদ তলুয়ার উচা করে,
বাহির থিকা রূপবান চিকরা-চিকরি(১৯) করে।
মাইরোনা, মাইরোনা জল্লাদ গো
ও জল্লাদ, ম্যাইরোনা মোর পিতারে
দারুণ জল্লাদ, জল্লাদ রে।

কী অপরাধ কইর‍্যাছে মোর পিতায়রে
ও জল্লাদ, বল আমার কাছেরে
শোন জল্লাদ, জল্লাদরে॥

রূপবান কয়, চলেন পিতা, চলেন গো সত্বর,
না জানি বাদশার দূতের হাতে হবে ক্যামন তর।
হেনকালে যথাস্থানে আইলো একাব্বর বাদশা,
পালাইয়্যা যাইবা কোথায় এ ক্যামন তামাশা।
কী অপরাধ করছেন পিতায় গো
ও বাদশা বলে দেন আমারে গো।
উজির কয়, চইল্যা যা মা রূপবান এইখান থিকা,
কোন কশুর করি নাই মা, জানেন খোদাতাল্লা।
হাতে ধরি, পায়ে ধরি গো
ও বাদশা মুক্তি করেন পিতারে
আমার বাদশা, বাদশা গো।
আমায় আপনি প্রাণে মারেন গো,
ও বাদশা মুক্তি করেন পিতারে॥

---

(১৮) কাছে (১৯) চেঁচামেচি

বাদশা কয়, মুক্তি নাই পিতার তোমার
যদি না কবুল কর রহিমেরে সোয়ামী তোমার।
রূপবান কয়, কবুল হয়লাম(২০) সত্য মনে,
আপনার পোলা(২১) রহিম সোয়ামী আমার জ্ঞানে।
বাদশা কয়, শীতল হইল এতদিনে আমারও পরাণ,
উজির-ভাই, আমারও আর দুঃখু কিছুই নাই
এই দণ্ডেই আপনার মুক্তির বিধান দিলাম ভাই।

(দুই)

আরে ও আমার পরার মোন,
এ দুনিয়ায় পর বিনে তোর কে আছে আপন।
হারে নদীর ঘাটে সিনান করে রূপবান সুন্দরী,
সঙ্গেতে বাহার দিছে সাতশত যৈবতী।
হেনকালে সিনান ঘাটে আইসে বাদশা একাব্বর
জাহানারা সঙ্গে আইসে, আইসে রাহেলা উজির।
নানা বাইন্ত বাজে শোন লাগে চমৎকার,
আরশী, পড়শী, জ্ঞাতি-গুষ্টি আইসে এতিম ফকির।
সিনান কইর‍্যা রূপবান আইলো ঘাটলার পরে,
কাজী কয়, বিয়া পড়াই মুই এইবারে।
বিয়া পড়াইলো কাজী সাহেব, কবুল দোনো(২২) পক্ষে,
কাঁদিয়া উজীর সাইবের পানি ঝরে চৌক্ষে।
উজির কয়, বেগম সাহেবা, এক নিবেদন করি,
আইজথনে রূপবান অইলো কইন্যা আপনারি।
শিশুকালে মা হারাইছে মায়ের মর্ম জানে না,
গোণা(২৩) কিছু করলে পরেও চরণে ঠেইল্যোন না।

(২০) করিলাম (২১) পুত্র (২২) দুই পক্ষে (২৩) দোষ

হারে এই না কথা শুইন্তা রূপবান পিতার হস্ত ধরি,
কান্দিয়া কয়, বাজান, এহন মুই কী বা করি।
জাহানারা কয়, বেটী দুঃখু কিছু নাই,
পিতারড়ে, মাতারডে বিদায় নিয়া আয়।
জাহানারার বাক্যে রূপবান মাগ্রে বিদায় উজিরের সমীপে,
কান্দিতে কান্দিতে উজির চৌক্ষের পানি মোছে।
বিদায় দেন, বিদায় দেন পিতাগো
ও পিতা বিদায় দেন আমারে গো
আমার পিতা, পিতা গো।

বিদায় দেন, বিদায় দেন, মাতা গো
ও মাতা বিদায় দেন আমারে গো
আমার মাতা, মাতা গো।

বারো দিনের স্বামী লইয়্যা গো
অ পিতা চইল্যাম শ্বশুরবাড়ি গো,
আমার পিতা, পিতা গো।
বারো দিনের স্বামী লইয়্যা গো
অ মাতা চইল্যাম শ্বশুরবাড়ি গো
আমার মাতা, মাতা গো।

(হারে) কান্দে উজির, কান্দে রূপবান আরও ওই রাহেলা সুন্দরী,
রূপবান কয় কথা পরাণ বিদরী।

মাতা ছাইড়্যা, পিতা ছাইড়্যা গো,
অ আল্লা চল্লাম শ্বশুরবাড়ি গো,
আমার আল্লা, আল্লা গো।

তোমরা সবাই দেইখ্যা রাইখো গো
অ আল্লা আমার প্রাণের পিতারে
আমার আল্লা আল্লা গো।

তোমরা সবাই দেইখ্যা রাইখো গো
অ আল্লা আমার প্রাণের মাতারে
আমার আল্লা আল্লারে।
ক্ষুধা লাইগলে খাইতে দিওগো
অ আল্লা আমার প্রাণের পিতারে
আমার আল্লা আল্লারে।
ক্ষুধা লাইগলে খাইতে দিওগো
অ আল্লা আমার প্রাণের মাতারে
আমার আল্লা আল্লারে।
আহারে দারুণ বিধিরে.
অ বিধি এই ছিল মোর কর্মের
আমার বিধি বিধিরে।
(হারে) এই কথা না কইয়্যারে রূপবান গ্যাল যে চলিয়া,
উজির কান্দে, কান্দে রাহেলা নদীর ঘাটে বইয়্যা।
রাজপুরীতে আইয়্যা রূপবান ঢোকে বাসর ঘরে,
বার দিনের সোয়ামী লইয়্যা দুঃখেতে গান ধরে।
বাসর ঘরে থাক পতিগো,
অ পতি খ্যাল (খেল) নানা ছলে গো,
আমার পতি, পতিগো।
কে পরাইবে তৈল কাজল রে
আ আল্লা কে খাওয়াবে দুগ্ধ, রে
আমার আল্লা আল্লারে।
(হারে) এই না কথা কইয়্যারে রূপবান এদিক ওদিক চায়,
তিন পহরের বাজকুড়ালী বোলান(২৪) দিয়া যায়।
ধড়মড়াইয়্যা উইঠ্যা রূপবান পতি নিয়া কোলে,
অঙ্গের বসন ত্যাজ্য করি যাত্রা শুরু করে।

(২৪) ডাক

বিদায় দ্যান, বিদায় দ্যান আব্বা গো
অ আব্বা বিদায় দ্যান আমারে গো
আমার আব্বা আব্বা গো।
বিদায় দ্যান, বিদায় দ্যান আম্মা গো
অ আম্মা বিদায় দ্যান আমারে গো
আমার আম্মা, আম্মা গো।
বার দিনের সোয়ামী লইয়্যা গো
অ আব্বা চল্‌লাম নিব্বাসনে গো
আমার আব্বা, আব্বা গো।
বার দিনের সোয়ামী লইয়্যা গো
অ আম্মা চল্‌লাম নিব্বাসনে গো
আমার আম্মা, আম্মা গো।
এই আশীর্বাদ করেন আব্বা গো
অ আব্বা আমি যেন ফির‍্যা আসি গো
আমার আব্বা, আব্বা গো।
এই আশীর্বাদ করেন আম্মা গো
অ আম্মা আসি যেন ফির‍্যা গো
আমার আম্মা, আম্মা গো।
শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা অ-আল্লা আমার হইলো না,
আমার আল্লা আল্লা রে।
তোমরা সবাই দেইখ্যা রাইখোরে
অ আল্লা আমার প্রাণের আব্বারে
আমার আল্লা, আল্লারে।
(হারে) এই কথা না কইয়্যা রূপবান ঘরের বাইরে যায়,
তাফাতে(২৫) থাইক্যা জাহানারা করে হায় হায়।

(২৫) দূরে

দশমাস, দশদিন মুই গভ্ভে ধরছি যারে,
হেইনা রহিম মোর গ্যাল গো ছাড়িয়ে।
মুই নারী অভাগিনী, জনম দুঃখিনী,
ক্যামনে কাটাইমু মুই দিবস রজনী।
বাদশা কয়, শোন প্রিয়ে রাজার মহিষী,
মুনির শাপ ফলিল বুঝি এত দিনে আসি।
হায় হায়রে এদিগেতে রূপবান তখন
পতি লইয়্যা কোলে,
সিংদরজার গোড়ে(২৬) আসিলো সত্বরে।
বিনয়ে রূপবান কয়, দাওরানরে,(২৭)
বলিতে বলিতে তার চৌখের পানি ঝরে।
শোন, শোন, শোন দাওরান গো
অ দাওরান বলিযে তোমারে গো
শোন দাওরান, দাওরান গো।

তুমি আমার ধর্মের ভাই অরে
অ-দাওরান, ধর্মের কাজ কররে
দাওরান ভাই অরে।

দ্বার ছাড়, দ্বার ছাড় দাওরান রে
অ দাওরান চলছি গহন বনেরে
দাওরান ভাই অরে॥

দাওরান কয়, বুইন, মুই দ্বার ছাড়তে পারমুনা,
দ্বার ছাড়ি দিলে মোর নকরী থাইকবে না।
বার দিনের সোয়ামী লইয়্যারে,
অ দাওরান চইল্যাছি নিব্বাসনেরে
দাওরান ভাই অরে।

(২৬) নিকটে (২৭) দারোয়ান

দাওরান কয়, বুইন, এ যে অসম্ভব কথা,
এত বড় ডাঙ্গর(২৮) মাইয়্যার এই সোয়ামী
হবার পারে না
বিধির কলমের লেখারে,
অ দাওরান কে খণ্ডাইতে পারেরে
দাওরান ভাই অরে।
শোন, শোন, শোন বুইন রূপবান
বলিযে তোমারে গো
শোন রূপবান রূপবান গো।
রাইত পোয়াইলে(২৯) চইল্যা যাইও গো
অ রূপবান কানন বনেতে গো
শোন রূপবান, রূপবান গো।
রাইত পোয়াইলে লোকে বলবেরে
অ রূপবান ছাওয়াল পাইলা কোথায়রে
দাওরান ভাই অরে।
রূপবানের কথায় তুষ্ট দারোয়ান বাবাজী,
দরজা খুইল্যা দিলে চইল্যা গেল রূপবান সুন্দারী।
হারে হাঁটিতে হাঁটিতে বেলা হইলো দিপ্পহর(৩০),
শ্যাষকালে আইলো কইন্যা উজানী নদীর চর।
উথালী পাথালী জল, নদী করে টলমল,
গাঙ দিয়া ভাইস্যা ফেরে নাও,
মোনের খুশীতে মাঝি গায় সারিগান।
আমার হাড় কালা করলাম রে,
আরে আমার দেহ কালার লাইগ্যারে,
অন্তর কালা করলামরে দুরন্ত পরবাসে।

(২৮) বয়স্থ—যুবতী (২৯) সকাল হইলে (৩০) দুপুর

(মোনরে) হাইল্যা লোকের লাঙ্গল ব্যাঁকা, জনম ব্যাঁকা চাঁদ,
তাহার চাইতে অধিক ব্যাঁকা, যারে দিছি প্রাণ।
মোনরে কূল ব্যাঁকা, গাঙ ব্যাঁকা, ব্যাঁকা গাঙের পানি,
সগল ব্যাঁকায় বাইলাম নৌকা, তবু ব্যাঁকারে না জানি।
(মোন্‌রে) হাড় অইলো জার জার অন্তর অইলো গুড়া (রে আমার)
পিরীতি ভাঙ্গিয়া গ্যালে হায় হায় নাই লাগে জোড়া।
পার কর, পার কর মাঝিরে—
অ মাঝি পার কর আমারে রে
ঘাটের মাঝি, মাঝিরে।
তোমরা যদি পার না করবে রে
অ-মাঝি কী হবে উপায়রে
ঘাটের মাঝি, মাঝিরে।
তোমরা আমার ধর্মের বাই অরে
অ মাঝি ধর্মের কাম কররে
ঘাটের মাঝি বাই অরে।
মাঝি কয়, সগল মানুষ পার করি দিদি, পয়সা যদি পাই,
বিনা পয়সায় পার করমু ক্যামনে সেই কথাডা শুধাই।
রূপবান কয়, বাই, পয়সা মোরডে নাই,
পার অইলে ইনাম কিছু দিবই নিচ্চয়ই।
মাঝি কয়, হাচা কথা বুঝলাম এহন তাই,
কোলের পোলা লইয়্যা দিদি নায়ে ওঠেন যাই।
নায়েতে উইঠ্যা রূপবান টালুমালু চায়,
ভাইটাল টানে নাও দিয়া মাঝি বিচ্ছ্যাদি গান গায়।
মোন মাঝি তোর বৈঠা নেরে মুই আর বাইতে পারলাম না,
অপর বেলায় ধরলাম পাড়ি (রে) নদীর কূল কিনারা
পাইলাম না।
(মুই আর বাইতে পারলাম না)।

ছেঁড়া দড়ি, আর ভাঙ্গা বৈঠারে হাইলেতেও মানে নারে,
আমি জনম ভইর‍্যা বাইলাম তরীরে
ও তরী ভাইটাল ছাড়া উজায়না।
রূপবান কয়, ভাই, আরনা গীত গান,
শুনলে এইনা গীত মোর বিদরে পরাণ।
এক মাঝি কয় অন্য জনারে,
এ কি বা কয় কথা মুই গান না করিমু,
পয়সা দেবার বেলায় বুঝি কোন্দল জুইড়্যা নিবু।
নদীপাড়ে আইস্যা মাঝি কয়, ইনাম দেন দিদি ঠাইন্,
ঘাটের মাঝি মোরা তাগাদা বাড়ি ফির‍্যা যান।
রূপবান কয়, ভাই, এই নেও ইনাম,
এই বইল্যা আঁচল থিকা খুল্যা দেয় চৌখ ঠিক্‌রাইনা ইনাম।
ইনাম লইয়্যা চাইয়্যা দেখে পিত্তলের টুকরা খান,
তোবা তোবা বইল্যা মাঝি কাইন্দা হইল খান্ খান্।
ঘাটের মাঝি মোরা ঘাটে ঘাটে ফিরি,
দুই আনার পয়সা পাইলেই কীরতার্থ(৩১) মোনে করি।
ছেমরী(৩২) বড়ই সেয়ানা পয়সা না দেয় দো-আনা,
ইনাম দেবার ছলে দিল পিতলের টুকরা খান।
পিত্তল লইয়্যা কী-করমু থুইনু বা কোন্ হানে,(৩৩)
পাড়ের থিকা দেইখ্যা এক পথিকে ঘোনায় হেই খানে।
পথিকে কয়, পিতলডা মোরে দেও মাঝি,
মুই দুই আনা দেই,
পয়সা পাইয়া বোকার দল তুইল্যা দিল
ইনামের টুকরাখান সেই।
দূরের থিকা দেইখ্যা রূপবান কয় মোনে মোনে,
ছেঁড়া কাঁথার ভিখারী হইয়া মানিক না চিন্‌লিরে।

(৩১) বাধিত। (৩২) মেয়ে (৩৩) স্থানে

চিন্‌লিনা, চিন্‌লিনা মাঝিরে,
ও মাঝি অমূল্য রতন রে, ঘাটের বোকা মাঝিরে।
যে চিন্যাছে, সে নিয়াছেরে
ও মাঝি সাতরাজার ধন রে ঘাটের বোকা মাঝিরে।
চাইর পয়সার ভিখারী মাঝিরে,
ও মাঝি থাক ঘাটেরে, ঘাটের বোকা মাঝিরে।

জহুরী না হইলে মাঝিরে
অ মাঝি জহর কী তাই চিনেরে, ঘাটের বোকা মাঝিরে।
হারে এই কথা না কইয়্যারে রূপবান হাটে জঙ্গল পথে,
এমন সময় দুইও দস্যু আসিল সেইখানে।

দস্যু না দেইখ্যা রূপবানের ভয়ে ওড়ে প্রাণ,
কে কোথায় আছেন আইস্যা প্রাণেতে বাঁচান।
(হারে) রূপবানের কান্দন শুইন্যা জংলী-রাজা এক
এদিক ওদিক চায়,
শিকারে আইস্যা রাজায় নারীর কান্দনে ফিরয়া চায়।
কেউ বুঝিবা পইড়্যাছে বিপদে রাজা গোনে মনে মনে,
সোর শুইন্যা সেইখানেতে জংলী রাজা ছোটে।
(হারে) জংলী-রাজার দাপটে জব্দ শমন দুশমন,
রূপবানেরে উদ্ধারিল জংলী-রাজন।

জংলী-রাজ কয়, মাই, তুহার কুছ ডর নাই,
তোহার লেড়কাকো মুই আদাব জানাই।

রূপবান কয়, বাবা, এ-মোর সোয়ামী,
সগল কথা খোলসা(৩৪) কইর‍্যা ক্যামনে বা মুই কমু আজি?
জংলী-রাজ কয়, মাইজী ঠিক বাত আছে,
হামার কাছে দে বাবাজীকে হামার ঘরে লিয়ে যাবে।

(৩৪) পরিষ্কার করে বলা

রূপবান কয়, বাবা তোমার ঘরে নাই যাব,
পতিরে লইয়্যা মুই এই কাননেতে রব।
বেশ কথা বুলছিস বেটী, তোর ইচ্ছা পূর্ণ হোবে,
এই জংগলে তুহার লাগি মুই কুটীর বানাইয়্যা দিবে।

(তিন)

(হারে) জংগলে থাকিয়া রূপবান স্বামী লইয়্যা কোলে,
বিষাদে নিশাদে তারও দিন কাটে।
রূপবান গায় গীত শোনে তরুলতা,
নিদারুণ দুঃখের কথা শুনে সে বারতা।
নিদারুণ শ্যাম, তোমায় লয়ে বনে আসিলাম,
সন্ধ্যা হইল বনের মাঝে পথ হারাইয়্যে রইলাম বসে, (রে)
আমি নয়ন জলে মালা গাঁথিলাম।
মোর হৃদয়বন্ধু কয়না কথা,
এই ছিল মোর কর্মের লেখা (রে)
মুই কলঙ্কের হার গলায় পরিলাম।
ও আমার মোনের দুঃখু কইনারে দুঃখ রাইখাছি অন্তরে (রে),
তোমায় লইয়্যা ঘুরিহে বন্ধু দেশে দেশান্তরে।
ও মনরে নদীর কাছে কইলে দুঃখু জল যায় উজাইয়্যা,
বিরিক্ষির(৩৫) কাছে কইলে দুঃখু পত্র যায় ঝড়িয়া (রে)
দেশ দেশান্তরে রে॥
(হারে) সারিয়া ঘরের কাম, রূপবান জল আনিতে যায়,
চলিতে চলিতে রূপবান ফির‍্যা ফির‍্যা চায়।
ও প্রাণের পতি গো, মুই কোন্ কা প্রাণে তোমায় ছাড়া যাব।
এ দুঃখিনীর মন প্রাণ, সকলি কইর‍্যাছি দান
তুমি বিনে কে আছে আমার।

(৩৫) গাছ

তোমারে শিশু লইয়্যা ঘুরি বনে বনে,
ফির‍্যা আইস্যা পাই-কি-নাই ভাবি তাই মনে।
হায় হায়রে রূপবান গেল জলের ঘাটে,
এ দিগেতে কানীবাঘা ঘরে আইস্যা রহিমেরে আড়ি করে।
ঘরেতে ফির‍্যা রূপবান, দেখে সর্বনাশ,
কলসী ফ্যালাইয়্যা থুইয়া বাঘেরে করে বিনয় প্রকাশ।
খাইওনা, খাইওনা বাঘরে
অ-বাঘ খাইওনা মোর পতিরে অ-বোনের বাঘরে।
হাতে ধরি পায়ে ধরিরে
অ বাঘা ছাইড়্যা দ্যাও মোর পতিরে অ-বোনের বাঘ রে।
আমার পতি খাইলে বাঘরে,
অ বাঘ ঠেইকবা খোদার কাছে, অ বোনের বাঘরে।
আগে খাও মোরে বাঘরে
অ বাঘ পিছে খাও মোর পতিরে, অ বোনের বাঘ রে।
হারে রূপবানের কান্দনে কান্দে যতেক তরুলতা,
জংলী-রাজার কর্ণে গিয়া পৌঁছাইলো সে বারতা।
শোর (৩৬) শুইন্যা জংলী-রাজ তহন নিমেষে দর্শন দেয়,
তার আগমনে বাঘ তড়িতে পালায়।
জংলী-রাজ কয়, বেটী তুহারে এইটে আর না রাখিব,
মাইল্যানীর ঘরেতে তুহারে পৌঁছা দিয়া আসব।
শিশু সোয়ামী কোলে নিয়া রূপবান
মাইল্যানীর ঘরে আসে চলি,
মাসী, মাসী বইল্যা রূপবান দিল তিন ডাক ছাড়ি।
শুন শুন মাসীমা গো
ও মাসী বলিযে তোমারে গো
শুন মাসী, মাসী গো।

(৩৬) ক্রন্দন ধ্বনি

নিরাশ্রয় হইয়্যা মাসী গো
অ মাসী আইলাম তোমার বাড়ি গো
আমার মাসী, মাসী গো।

ঘর থিক্যা বাইরাইয়্যা মালিনী কয় তুই মোর কে,
মাসী, মাসী বইল্যা কইছিস যহন সত্য পরিচয় দে।
রূপবান কয়, মাসী, মুই বড় দুঃখী
মোর সোয়ামীরে মানুষ কর, এই বাসনা করি।
মাসী কয়, এর জন্য কোন চিন্তা নাই,
তোর সোয়ামীরে মোর কাছে দে সেলাম জানাই।
(হারে) দেখতে দেখতে বছর গ্যাল ঘুইর্‌য়া,
মাসীর ঘরে থাকে রূপবান রহিমেরে লইয়্যা।

এক দিন, দুই দিন গ্যাল এগার বচ্ছর,
পাঠশালে পড়ে রহিম সেরা পড়ুয়া ছাত্তর।
একদিন পাঠশালে যাবার কালে রহিম ধরিল বায়না,
রূপবান ক্যান তার সাথে খায় না।
ছলা কলা কইর্‌য়া রূপবান রহিমরে ভুলায়,
আধা দূর গিয়া রহিম ঘরে ফির্‌য়া আয়(৩৭)।

রহিম বলে, দিদি তুমি হাচা(৩৮) কথা কও,
ক্যামনতর দিদি তুমি মোরে হেই কথাডা কও।
রূপবান বলে, দাদা, অন্য দিন তা কমু(৩৯),
এইবার দাদা তুমি পাঠশালে যাত্রা কর।
(হারে) এই দিগেতে ছায়েদ বাদশা সেই না দ্যাশের রাজা,
রহিমের গুণপনায় ফাটে তার কলিজা।

তার মাইয়্যা তাজেল সুন্দারী রহিমের সোমপাঠী,
তাজেল থিকা রহিম সগ্‌গল বিষয়েই খাঁটি।

---

(৩৭) আসে (৩৮) সত্য কথা (৩৯) বলিব

আরও সোমাচার কানে গেল ছায়েদ বাদশার,
রহিমের ঘরে বাস করে এক রূপসী সুন্দার।
য্যান ত্যান(৪০) প্রকারে রহিমরে জব্দ করা চাই,
আর ওইনা সুন্দরীরে মুই আনিমু নিচ্চয়ই।
হারে দুশমন ছায়েদ বাদশা তহন আইন জারি করে,
কাইল হইতে রহিম পাঠশালে আইবে,
উড়িয়াবাজ ঘোড়ায় চাইপ্যা জড়ির পিরান(৪১) পইরে।
হারে এই না আদেশ শুন্যা রহিম গুরুমশাইর থিকা,
চৌক্ষু বাইয়্যা ঝরে পানি, কান্দে রইয়্যা রইয়্যা।
বাদশাজাদী তাজেল সুন্দারী রহিমের সোমপাঠী,
হের (৪২) কান্দনে আউগাইয়্যা আসে কয়,
ক্যান কান্দ আপুনি?
(হারে রহিম) ছিঁড়া জামা, ছিঁড়া ধুতিরে
অ আল্লা, আমার ভাইগ্যে হইলোরে,
আমার আল্লা, আল্লারে।
কোথায় পাইমু টাহা, পয়সারে,
অ আল্লা কোথায় পাইমু জামারে,
আমার আল্লা, আল্লারে।
কে-বা প্রাণের বান্ধব হইয়্যা গো
অ আল্লা দিবে কিন্যা ঘোড়ারে
আমার আল্লা, আল্লারে।
তাজেল কয়, মুই(৪৩) তোমার বান্ধব হইয়্যা গো,
অ রহিম দিব কিন্যা ঘোড়া গো,
শোন রহিম, রহিম গো।

(৪০) যেমন করেই হোক (৪১) জামা_পোশাক (৪২) তাহার
(৪৩) আমি

চাইনা তোমার ভালবাসা গো,
অ তাজেল চাইনা তোমার জামা গো,
শোন তাজেল, তাজেল গো।
আমার দিদি শোনলে তাজেল গো,
অ তাজেল দিবে কিন্যা ঘোড়া গো
শোন তাজেল, তাজেল গো।
হারে এই কথা না কইয়্যারে রহিম বাইরে চইল্যা যায়,
দরজায় খাড়াইয়্যা তাজেল করে হায় হায়।
এমন সময় রহিমের তল্লাশে রূপবান আইসে সেইখানে,
হস্তে ধরি তাজেলেরে কয় মিষ্ট মধুর ভাষে।
প্রাণ সখিরে, মন না জেনে প্রেমে মইজোনা,
আগে না জানিলে গো তারে,
প্রেম করিলে পড়বে ফ্যারে(৪৪)
শ্যাষে কাঁদলে আরত সারবেনা।
পীরিতির এমনি গো ধারা
এক প্রেমেতে দুইজন মরা,
নইলে প্রেম আর দুইদিনও রবেনা।
আমি করি বন্ধুরগো আশা,
তুমি তাজেল সর্বনাশা,
এত জ্বালা প্রাণে সহেনা।
এত দুঃখ প্রাণে সহে না॥

শোন তাজেল তাজেল গো
মন না জেনে প্রেমে মইজো না।
(হারে) রূপবানের বাক্যে তাজেল দুঃখিত অন্তর,
ধীরে ধীরে যায় কইন্যা পুরীর ভিতর।

---

(৪৪) বিপদে

এদিকেতে রহিম ঘরে ফেরে কান্দিতে কান্দিতে,
তাহা না দেইখ্যা রূপবান পুড়িল্ অন্তরে।
আর দিন আসে দাদায় গো,
ও মাসী হাসিতে খেলিতে গো,
আমার মাসী মাসী গো ॥
আজি কেন আসে দাদায় গো,
ও মাসী কান্দিতে কান্দিতে গো।
কোথায় মাতা, কোথায় পিতারে,
অ আল্লা পাইলামনা সন্ধান রে।
রহিমেরে দেইখ্যা মাসী জিজ্ঞাসে কুশল,
রহিম কয়, পাঠশালে যাওয়া আমার হইল নিষ্ফল।
বাদশার আদেশ মোর জরির জামা নাই,
চাই উড়িয়াবাজ ঘোড়া[৪৫] নইলে নিস্তার নাই।
মাসা কয়, কান্দ ক্যানে ওগো বাছা ধন,
তোমার দিদি কিন্যা দিবে শুনিলে এখন।
নিশ্চিন্ত হইয়্যা রহিম ঘরে ঢুইক্যা যায়,
পাছ দুয়ারে খাড়াইয়্যা রূপধন করে হায় হায়।
কোথায় রইলেন প্রাণের আব্বা গো,
অ-আব্বা ছাহেন আসিয়া গো,
আমার আব্বা, আব্বা গো।
রূপবানের কাতর ডাকে আইসে জংলীরাজ,
কয়, কী কার্যে ডাকছিস্ বেটী মোরে, আছে কোন্ কাজ।
রূপবান কয় কথা সগল সোমাচার,
জংলীরাজ শুইন্যা কয়, বেটী তুই না ভাবিস আর।
উড়িয়াবাজ ঘোড়া আমার আছে একটা ঠিক,
কাইল প্রভাতে দিয়া যামু তুই দেইখ্যা নিস।

(৪৫) পক্ষীরাজ জাতীয় ঘোড়া

(হারে) পরদিনে রহিম পাঠশালতে গ্যালে,
গুরু আসিয়া প্রশ্ন করে রহিমের কাছে,
কে দিছেরে জরির পিরান, উড়িয়া-বাজ ঘোড়া,
রহিম কয়, দিদি আর ব্যাধে দিছে
তারগে তুলনা নাই দেশ জোড়া।
গুরু কয়, বাদশার হুকুম্ তুমি কাইল অসিবা
হাতীর পিঠে আমবার(৪৬) দিয়া।
নচেৎ তোমার পড়া বন্ধ, কইয়্যা দিলাম এই বেলা।।
আর একখান কথা রহিম শোন মোন দিয়া,
যেরে তুমি দিদি কও হের পরিচয় নেও গিয়া।
আইজ গিয়া ঘরে, যা কইলাম তোরে,
কর দোখ প্রিতিপালন দ্যাখবা কী বা ফল ফলে।
এই পর্যন্ত কইয়্যা গুরু ছুটি দিয়া দ্যায়,
উঠানে খাড়াইয়্যা রহিম করে হায় হায়।
কোথায় পামু ট্যাহা পয়সা রে,
'অ আল্লা কোথায় পাইমু হাতীরে
আমার আল্লা, আল্লারে।
(হারে) দেইখ্যা রহিমের কান্না বলে তাজেল সুন্দারী,
অনুমতি কর তুমি, আমি এর বিহিত করি।
আমি তোমার বান্ধব হইয়্যাগো,
অ রহিম দিব কিন্যা গো
শোন রহিম, রহিম গো।
আমার সাধের যৈবন গো,
অ রহিম তোমার লাইগ্যা গো,
শোন রহিম, রহিম গো।

(৪৬) হাওদা

আমায় যদি ভালবাস গো,
অ রহিম যৈবন করব দান গো,
শোন রহিম, রহিম গো।

চাইনা তোমার ভালবাসা গো
অ তাজেল চাইনা তোমার যৈবন গো
শোন তাজেল, তাজেল গো॥

আমার দিদি শোনলে তাজেল গো,
অ তাজেল পাগলিনী হবে গো
শোন তাজেল, তাজেল গো॥

তোমায় যদি ভালবাসি গো
অ তাজেল লোকে মন্দ বলবে গো
শোন তাজেল তাজেল গো।

লোকের মন্দ পুষ্প চন্দন গো,
অ রহিম পইর‍্যাছি মোর গলে গো
শোন রহিম, রহিম গো।

হাতে ধরি, পায়ে ধরি গো,
অ রহিম চল আমার বাড়ি গো
শোন রহিম, রহিম গো।
তোমার পিতা শোনলে তাজেল গো,
অ তাজেল মাথা নিবে আমার গো
শোন তাজেল, তাজেল গো।

রহিম কয়, সত্য কইর‍্যা কও বন্ধু,
মোরে কিন্যা দিবা হাতী,
তা হইলেইনা হইমু আমি তোমার চির সাথী।

শোন বন্ধুরে তোমায় আমি ফাঁকি দিবনা,
তোমায় আমি ফাঁকি দিবনা।

বানাইয়্যা হাতের গো বয়লা (৪৭),
খাইতে দিমু মাখন ছানা
শুইতে দিমু ফুল বিছানা।
এই দেহ সোনার গো যৈবন.
তোমায় আমি করব গো দান।
তুমি আমায় ছাইড়্যা যাইওনা,
তুমি নি আমায় ভুইল্যা যাইওনা।
রহিম কয়, সইত্য কইর‍্যা কও দেহি বন্ধু
দিবা নাত মোরে ফাঁকি,
প্রত্যয় হইলেই মুই তোমায় ভালবাসি।
এই যুক্তি না কইর‍্যা দুই জন যহন যাত্রা করে,
রহিমের তালাশে(৪৮) রূপবান সেইও খানে আসে।
হস্তে ধরি তাজেলের রূপবান করে গান,
শুইন্যা সেই না গান, রহিমের জুড়াইলো পরাণ।
সাগর কুলের নাইয়্যারে অপর বেলার মাঝি
তুমি কোথায় চইল্যাছ বাইয়্যা।
বার বচ্ছর রইলাম মাঝি পারঘাটায় বইস্যা,
ব্যালা গ্যাল সন্ধ্যা হইলো মাঝি তোমার পানে চাইয়্যা।
তোমার অভাগিনী দাসী কান্দেরে মাঝি,
ও মাঝি আমারে যাইও লইয়্যা রে।
রঙের মাস্তুল, রঙের বৈঠা, রঙের বাদাম দিয়া,
ঢেউয়ের তালে নাইচ্যা নাইচ্যা মাঝি কোথায় চলছ বাইয়্যা।
তুমি কেউরে হাসাও, কেউরে কান্দাও মাঝি,
(ও) মাঝি কেউরে যাও কান্দাইয়্যা রে॥
কেউরে ডাইক্যা কইছো ওরে মাঝি, আয়রে আমার নায়,
আমায় দেইখ্যা কইছ, ওরে মাঝি জায়গা নাই মোর নায়।

(৪৭) বালা—কঙ্কন (৪৮) খোঁজে

যহন তোমার কেউ ছিলনা, তহন ছিলাম আমি,
এহন তোমার সব হইয়্যাছে পর হইয়্যাছি আমি।
এই না বাক্য কইয়্যারে রূপবান রহিমেরে হস্তে ধারন কইর‍্যা,
চইল্যা যায় ঘরের দিকে তাজেলরে পাথারে ফ্যালাইয়্যা।
চইল্যা যায় রহিম আরো রূপবান সুমুখের পন্থ দিয়া,
খুঁইজ্যা দ্যাখে তাজেল সুন্দারী হের পরাণও গ্যাল লইয়্যা।

(চার)

ঘরেতে ফির‍্যা রহিম কয় মাসীর কাছে,
বাইর ঘরে ভাত সে আর খাইতে নারে।
মোর দিদিরে সেলাম দ্যাও অ-মাসীমা,
পাকশালে খাইমু ভাত, এহানে খাইমুনা।
এই না কালে ভাত লইয়্যা রূপবান আইলো ঘরে,
দেইখ্যা তারে রহিমের ক্রোধে চৌক্ষু জ্বলে।
দূর হ' পোড়ার মুখী এহান থিকা যা,
এ তুনিয়ায় কেউ নাই মোর যা সুমুখ থিকা।
রূপবান কয়, দাদা, এ-ক্যামুন রীতি,
তোমার দিদি আছে, মাসী আছে আর কিবা চাও
রাগ কইরোনা সোনা বন্ধু, বদন তুল্যা চাও।
ক্ষেমা দ্যাও বন্ধু আমার সেলাম মাঙ্গ করি,
এ তুঃখিনীর তুমিই যে গো হইলা জীবন তরী।
মাঝে মইধ্যে দ্যাখা দিয়া মোরে আকুল ক্যান কর,
নির্লজ্জ ব্যাহায়া তুই, কাইলকের কথা স্মরণ কর।
হস্তে ধরি, পায়ে পরিরে, অ ছোকরা ক্ষেমা কর মোরে,
আমার ছোকরা বন্ধু, বন্ধুরে।
অসময়ে নিদান কালেরে অ ছোকরা পাই যেন তোমারে,
আমার ছোকরা বন্ধু, বন্ধুরে।

রহিম কয়, নির্লজ্জ বেহায়া নারী, তোর মত আর কেডা,
তুই তয় থাক এহানে, মুই যাই মোর মোনে লয় যেথা।
দাসী বিদায় হইল বন্ধুরে, অ বন্ধু, এ জনমের তরে রে,
আমার ছোকরা বন্ধু, বন্ধুরে।
বার দিনের শিশু লইয়্যারে, অ ছোক্‌রা ঘুরছি বোনে বোনেরে
আমার ছোকরা বন্ধু, বন্ধুরে।
আগে যদি জানতাম বন্ধুরে, যাইবারে ছাড়িয়ারে,
আমার ছোকরা বন্ধুরে।
ফেইল্যা দিতাম বন্ধুরে, অ বন্ধু, বাঘের স্নমুখেরে,
আমার ছোকরা বন্ধুরে।
এ কি কথা কও দিদি, সইত্য কইর‍্যা কও,
বাঘের মুখে কারে ফ্যালাইয়্যা দিতা সেই কথাডা কও।
রূপবান কয়, দাদা ও কিছুনা,
জন্মের মতন বিদায় লই, আর ডাইক্যো না।
প্রাণ বন্ধুরে, দুঃখিনীরে আর কান্দাইওনা।
আমি করি বন্ধুরগো আশা, সে আশা মোর হয় নিরাশা,
এ জ্বালা প্রাণে সহেনা।
মাতা পিতা ত্যাজ্য গোকরি, আইলাম বন্ধু তোমার গো কাছে,
তুমি মোরে ছাইড়্যা যাইওনা।
রাত্র যে নিশি কালে, কুকিল ডাকে কদম ডালে,
আমি কাঁদিয়া ভিজাই বিছানা।
আরে হায় হায়রে রহিম তহন পাঠশালাতে যায়,
ছায়েদ বাদশার ঘোড়ার লগে দৌড়ের বাজী দেয়।
ছায়েদ বাদশা প্রচার করে, পুরস্কার দিবে,
যে পারবে হারাইতে তারে ঘোর দৌড়ের কালে।
বাজী না জিত্যা রহিম পুরস্কার যাঞা করে,
শয়তান ছায়েদ বাদশায় হেরে বন্দী করে।

ছায়েদ কয়, জবর ইনাম দেব তোরে শোনরে হতভাগা,
কে তোরে বাঁচাইবে হেথা কে বা তোর মাতা পিতা।
এই কথা না কইয়্যারে বাদশা তলুয়ার হাতে ধরে,
কোহান(৪৯) থিকা তলুয়ার নিয়া তাজেল আইসে ঘরে।
অস্ত্র হাতে পাইয়্যা রহিম উঠিয়া খাড়ায়,
তাজেলেরে দেইখ্যা বাদশার অক্ষি(৫০) চমকায়।
হারে তলুয়ার খেলাতে রহিম গ্যালযে হারিয়া,
বন্দী কইর‍্যা থোয় বাদশা তারে বুকে পাষাণ দিয়া।
কাকুতি মিনতি করে রহিম পেরহরির ডে,
মোর মিনতি রাখ ভাই মোর দিদিরে খবর দে।
হারে খবর পাইয়্যা রূপবান কান্দিতে লাগিল,
কান্দিতে কান্দিতে দুইও চক্ষু হের লালও যে হইলো।
কোথায় রইলেন প্রাণের মাসী গো,
ও মাসী ছ্যাখেন আসিয়া গো,
আমার মাসী মাসী গো।

হারে কোথায় রইলেন প্রাণের আব্বা গো,
ও আব্বা ছ্যাখেন আসিয়া গো
আমার আব্বা, আব্বা গো।
হারে মাসীর মুখে বার্তা পাইয়্যা,
জংলী রাজায় আসে ধাইয়্যা,
কয়, মাইজী, তুই চিন্তা করিস না।
এই কথা না কইয়্যা জংলীরাজ গ্যাল বাইর হইয়্যা,
পিছন থিকা ছায়েদ বাদশা খাড়াইলো আসিয়া।
ছায়েদেরে দেইখ্যা রূপবানের কম্পিত অন্তর,
কী কারণে আইছেন আপুনি বলেন গো সত্বর।

(৪৯) কোন্‌স্থান = কোনোখানে (৫০) চক্ষু

ছায়েদ কয়, শোন সুন্দারী, মোর প্রাসাদে চল,
তোর দুঃখ দূর করিমু মোরে সোয়ামী কবুল কর।
জাঁহাপনা এ অতি অসম্ভব কথা আপনি বলেন কী,
পরস্ত্রী হইযে আমি তাও জানেন নি ?
দুরাচার লম্পট আপনি এহান থিকা যান,
সতী নারী মুই আমি, আমার খেতি করেন ক্যান ?
হাসিয়া ছায়েদ কয়, শোন গো সুন্দারী,
এই না নির্জন স্থানে কেবা তোরে রক্ষা করবে আসি।
এই কথা না বইল্যা ছায়েদ আউগাইলো রূপবানের কাছে,
পিছান থিকা তলুয়ার হাতে তাজেল আইলো মাঝে।
তাজেলেরে দেইখ্যা ছায়েদ কুপিত অন্তর,
পদাঘাত করে ছায়েদ তাজেলের উপর।

লাথি খাইয়্যা তাজেল খাড়ায় য্যান কালসাপিনী,
মুই জেতা(৫১) থাকতে মোর দিদির গায়
হাত দ্যাও দেহি আপুনি।

হারে এই না কালে সোরগোলে জংলী রাজা আইস্যা পরে,
তলুয়ার হাতে নিয়া রাজা ছায়েদেরে ব্যারক(৫২) করে।
যুদ্ধে হাইর‍্যা গিয়া বাদশায় পালায়,
দোড়া দৌড়ি কইর‍্যা তাজেল গিয়া রহিমরে বাঁচায়।

ছাড়া পাইয়্যা রহিম তহন এদিক ওদিক চায়,
পথের মধ্যে সেইও কালে আবার গুরুর দেখা পায়।
গুরু কয়, রহিম, তুই না বন্দী হইয়্যা ছিলি,
যা কইছিলাম হের কি না করলি ?
এই কথা না কইয়্যারে গুরু রহিমরে নিল ঘরে,
সাজাইলো বৈরাগীর বেশে রহিম বাদশারে।

(৫১) জীবিত (৫২) ঘেরাও

(হারে) রহিম শূন্য একাঘরে রূপবানের দুঃখিত অন্তর,
মুখে নাহি বাক্য তার থাকে সতন্তর।
হেনকালে বৈরাগীবেশে রহিম আইলো কাছে,
আপন মনে গায় গীত চৌক্ষে পানি ঝরে,
বন বিরিক্ষির কান্না বুঝি নিশির(৫৩) হইয়্যা পরে।
আমার বন্ধু বিনোদিয়া রে প্রাণ বিনোদিয়া.
আমি আর কতকাল রাখবোরে যৈবন
নিজেরে বুঝাইয়্যা (রে)।
আমি আর কতকাল রাখবোরে যৈবন
পীদৃ্ম জ্বালাইয়্যা (রে)।
আগে যদি জানতাম বন্ধু যাইবারে ছাড়িয়া,
দুইও চরণ আমি বান্দিয়া রাখতাম
মাথার ক্যাশ দিয়া (রে)।
শোন, শোন, শোন সখী গো,
ও সখী বলি যে তোমারে গো,
শোন, শোন, সখী গো সারা দিনের উপবাসী গো,
ও সখী বলিযে তোমারে গো, শোন সখী সখী গো।
'তোমার সখী কোথায় আছে গো
ও ঠাকুর সেথায় যাও চলিয়া গো,
শোন ঠাকুর, ঠাকুর গো।'
(হারে) তুমি আমার ঘাটের তরী গো
ও সখী আমি তোমার মাঝি গো,
শোন সখী, সখী গো।
আমার মাঝি রাহম বাদশা গো,
ও ঠাকুর তোমায় মারব ঝাড়ু গো,
শোন ঠাকুর, ঠাকুর গো।

---

(৫৩) শিশির

আমার পিতা তোমার শ্বশুর গো,
ও সখী আমি তোমার দাদা গো
শোন সখী, সখী গো।
আমার শ্বশুর নিরাশপুরে গো,
ও ঠাকুর, তোমায় রাখব গোলাম গো,
শোন ঠাকুর ঠাকুর গো।
আমারি ভাইস্তার খুড়ি তুমি গো,
ও সখী আমি তোমার দাদা গো, শোন সখী সখী গো।
রূপবান কয়, ঠাকুর, মুখ সামলাইয়্যা কথা ক,
পিছা(৫৪) মাইর‍্যা বিদায় করমু, এহনও দূর হ।
রূপবান গাইল পাড়ে, মোনে মোনে চিন্তে,
যতই না কই(৫৫) ওরে মোন ক্যান কান্দে।
রূপবান কয়, ঠাকুর, নাম কিবা তোর,
সত্য কইর‍্যা কও না কথা, না হ'ও কোন্ চোর।
রামের বামে থাকি আমি গো,
অ সখী রহিম আমার মিতাজী, শোন সখী, সখী গো।
রূপবান কয়, ঠাকুর, চুপ কইর‍্যা থাক্,
রহিম আমার সোয়ামীর নাম, তার পায়ের যোগ্য নস্।
আইচ্ছা ঠাকুর, কও দেহি মোর সোয়ামী কোথায় আছে,
কইতে পারি, মোরডে(৫৬) তোর হস্ত খানা দে।
এই না বইল্যা ঠাকুর যেই রূপবানের হস্ত ধারন করে,
'দূর হও, সইর‍্যা খারাও' বইল্যা
রূপধন এক ঠেলা মারে।
ঠ্যালার চোটে ঠাকুরের পরচুলা খইয়্যা(৫৭) পরে,
রহিমেরে দেইখ্যা রূপবান আনন্দে চিৎকার করে।
জড়াইয়া ধরে রূপবান রহিমারে আদরে।

(৫৪) ঝাঁটা (৫৫) বলি (৫৬) কাছে (৫৭) খসিয়া পড়ে

'ক্যান কও নাই এতকাল' রহিম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে,
আদরে রহিমরে রূপবান কতনা সোহাগ করে।
তোমার লইগ্যা এতদিন মুই গুপ্ত ব্যাশে ছিলাম,
এহন আমাগো কাজ ফুরাইলো এইখানে ইতি দিলাম।
এই না কালে সেই খানেতে তাজেলের প্রবেশ,
সঙ্গে সঙ্গে আইস্যা গ্যাল ছায়েদ বাদশা,
আর জংলীরাজ অশেষ।
তাজেল কয়, দিদি, আইজ থিকা
মুই হইলাম তোর দাসী,
কীরপা করি সঙ্গে নিস বোন তাতেই আমি খুশী।
ছায়েদ কয়, রহিম, মুই বড়ই অজ্ঞান,
বিনা দোষে লাঞ্ছনা দিছি কর প্রনিধান।
জংলীরাজ কয়, মাইজী, তোহার বার বচ্ছর
শ্যাষ হইল আজি,
প্রাসাদে পাঠাইয়্যা তুদের মিলবে হামার ছুটি।
হারে জয়ের বাজনা বাজে, লক্ষ লক্ষ সিপাই সাজে,
রাজপুরীতে বাজল জয়ের ঢাক।
রহিম বাদশা রূপবান ফির‍্যা আইলো,
একাব্বর বাদশা জাহানারার আনন্দে বুক ভরিল,
খুশী হইলো উজীর, নাজির সব
বাজে জয়ের বাজনা বাজে।
রহিম বাদশা আর রূপবানের কেচ্ছা সাঙ্গ হইলো
আনন্দেতে পুরী ভরিলো,
আল্লা তাল্লার নাম ন্যাও যত হিন্দু মুছলমান।
একলাস উদ্দিন বলে ভাই, তেনার দয়ার অন্ত নাই,
অন্তকালে পাই যেন তার দেখা।
বাজে জয়ের বাজনা বাজে॥

॥ আলোচনা ॥

বঙ্গবিভাগ (১৯৪৭ খৃঃ অঃ) তথা স্বাধীনতার পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে একটি নতুন বহুল প্রচারিত লোক-নাটিকা হ'ল 'রূপবান কইন্যা'। পালাটির পুরোনাম হ'ল 'রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা'। এ কথা বলাই বাহুল্য ১৯৪৭ সনের পূর্বে এই লোক নাটিকাটির কোন অস্তিত্বই ছিলনা পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চলেই।

একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে,—এ-পালাটি উত্তরবঙ্গের 'রূপধন-কইন্যা' পালাটিরই হুবহু অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, যে স্বাধীনতার (১৯৪৭ খৃঃ অঃ) পরবর্তী কালে উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো গায়ক বা অভিনেতার দৌলতেই এটি পূর্ববঙ্গের মাটিতে গিয়ে পৌছেছে। কিন্তু এর ভিতর কোনো বিদেশী মাল নেই, বরং বলা চলে, উত্তরবঙ্গের বাহে দেশের 'রূপধন কন্যা' পূর্ববঙ্গের জলা ভূমিতে এসে 'রূপবান কইন্যা' নাম পরিগ্রহ করে এ-দেশের জলবায়ুর সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। তাকে যেন আর পৃথক ভাবে কোনমতেই ভাবা চলেনা। তাই পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণলীলা, গাজীর গানের দলের মতই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট, বড়, 'রূপবান কইন্যা' লোক-যাত্রা দলের।

এই পালাগানটিও পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত এবং কুশীলবরা সকলেই গাঁয়ের খেটে খাওয়া মানুষের দল। তাই, নিঃসন্দেহে এটিকেও একটি আদর্শ লোক-গীতি-নাট্য বলে স্বীকার করতে বাধা নেই।

এইবার কাব্যাংশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে এটিকে একটি আদর্শ লোক-গীত-কথা (Ballad) আখ্যা দেওয়া যাবে কি না।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ১৯৪৭ খৃঃ অঃ আগস্ট মাসের পূর্বে পূর্ববঙ্গে এই পালাগানের কোন অস্তিত্বই ছিলনা ঠিককথা, কিন্তু তা হলে এর রচয়িতা কে ?

গীতিকাটির ভনিতায় দেখা যায় একলাসউদ্দিন নামক কোন কবির নাম। তা হলে কি ধরে নিতে হবে ইনিই এই এতবড় গীতিকাটির একক রচয়িতা ?

তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, উক্ত একলাস উদ্দিনই এই গীতিকাটির রচয়িতা, তা হলে প্রশ্ন আসে, তাঁর বাড়ি কোথায়, তার বিস্তৃত পরিচয়ই বা কি ?

আমাদের ধারনায়, ইনি নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গের আদি বাসিন্দা ছিলেন-না, তা না হলে তার ইতিবৃত্ত ওই অঞ্চলের লোকেদের অন্ততঃ কিছুটা জানা থাকত। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জায়গায় অনুসন্ধান করেও কিছু হদিশ পাইনি।

অনুমান করা সঙ্গতঃ,—বঙ্গ বিভাগের পর, পূর্ববঙ্গ থেকে যেমনি বহু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ (উত্তরবঙ্গ সহ) থেকেও বেশ কিছু পরিমাণের মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। এই একলাসউদ্দিন সাহেবও হয়ত দিনাজপুরের বাসিন্দা ছিলেন, তারই প্রচেষ্টায় এটি পূর্ববঙ্গের মাটিতে স্থান পায়,। আমার "বাংলার পল্লী-গীতি"তে উল্লেখ করেছি, সমগ্র দিনাজপুর এবং রংপুর জেলার অনেক অঞ্চলে "রূপধন কইন্যা" নামে গীতি-নাট্যটি বিশেষ ভাধে প্রচলিত ছিল। হয়ত ওই অঞ্চলেরকোনো লোক-নাট্যের দলের সঙ্গে উনি এক-সময় যুক্ত ছিলেন। পরে, তিনি এবং তাদের দলের অনেকে মিলে মিশে এই লোক-নাটিকাটি রচনা করেন পূর্ব বর্নিত রূপধন কইন্যার ভাবানুলম্বনে।

অবশ্য লোক-নাটিকা দুটির ভিতরকার গল্পের মূল সুর টুকু এক হলেও ঘটনা সংস্থাপনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গীতি-নাট্য দুটির ভিতর বিভিন্ন বিষয়ে মিলও যেমনি রয়েছে, অমিলেরও কিছু কমতি নেই।

মিল

ছুটি নাটিকারই মূল সুর—কোন এক নিঃসন্তান রাজার বার দিনের ছেলের সঙ্গে ('রূপধন কইন্যা'য় আছে আড়াই দিন মাত্র) সেই দেশেরই মন্ত্রীর বার বছরের মেয়ের বিবাহ। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা অনেক কষ্টে এই শিশুকে বড় করে তুলেছে, উভয় কাহিনীতেই আশ্রয় দাত্রী এক মালিনী মাসী। উভয় ক্ষেত্রেই গুরু মশাইর পাঠশালায় রাজপুত্রের নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই দ্বাদশ বর্ষ অন্তে রাজপুত্র বা বাদশাপুত্র রহিমের স্ত্রী-সহ পিতৃ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন।

শুধু তাই নয়. উভয় গীতিনাট্যের নায়কের নামও একই—রহিম।

অমিল

দিনাজপুরের 'রূপধন কইন্যা'য় রাজপুত্রের জন্মলগ্ন থেকেই কাহিনীর পট উত্তোলন করা হয়েছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের 'রূপবান কইন্যা'র প্রথমেই দেখা যায় নিঃসন্তান রাজা পুত্রলাভের আশায় মনের আক্ষেপে বন গমন করলেন এবং শেষটায় কোন এক মুনির দয়ায় পুত্র লাভ করলেন। তা ছাড়া "রূপধন কইন্যা"র গুরুর আগাগোড়া লোভ ছিল রূপধনের উপর। এ-জন্য যতকিছু গর্হিত পন্থা আছে তার কোনটিই তিনি প্রয়োগ করতে বাকী রাখেননি. মায় যাদুবিদ্যারও আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। রাজপুত্র রহিমকে কখনও ছাগল, কখনও বা কবুতর বানিয়ে শেষ পর্যন্ত এদের নিয়ে ডাকাতদের হাতেও ফেলে ছিলেন—যাতে রহিমের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে বাধ্য হয়ে ছিল। পরে অবশ্য স্বর্গের দেবতা হর গৌরীর কৃপায় রহিম পুনর্জন্ম লাভ করে। কিন্তু "রূপবান কন্যা" সে তুলনায় অনেক বাস্তব মুখীন, এখানে অনাবশ্যক ভাবে স্বর্গের দেব দেবীকে টেনে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসেননি। "রূপধন কইন্যার" সে দেশের রাজাকে আর যাই হোক লম্পট বা দুশ্চরিত্র করে দেখাননি, যা-কিছু ব্যভিচার সবই গুরুমশাইর দ্বারাই। কিন্তু "রূপবান

কইন্যা"য় রাজা এবং গুরু উভয়কেই লম্পট এবং দুশ্চরিত্রবান রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। বিশেষ করে, সেই দেশের যিনি রাজা অর্থাৎ ছায়েদ বাদশাত' দস্তুরমত লম্পট এবং ব্যভিচারী। তার এই জঘন্য কাজের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল তারই নিজের মেয়ে তাজেল। "রূপধন কইন্যা"য় তাজেল অর্থাৎ বাদশাজাদীর কাহিনী সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। "রূপবান কইন্যা"য় রহিমের উপর তাজেলের ভালবাসা একটি নতুন বস্তু, মনে হয় এ-কারণেই কাহিনীটি আরও বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এ-ছাড়া "রূপবান কইন্যা"য় জংলীরাজার কাহিনীটিও নতুন। "রূপধন কইন্যা"য় এটিও অনুপস্থিত। বলা বাহুল্য কাহিনীর প্রয়োজনে এই চরিত্রটির উপস্থাপনা একেবারে বে-মানান হয়নি। তাই, কাহিনী শেষে রাজপুত্র রহিমের একত্রে দুই স্ত্রী নিয়ে নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তনও মানিয়ে গেছে।

আজকের সমাজে এই দৃশ্য ততটা মানানসই না হলেও রূপকথাশ্রিত বহু লোক-নাটিকা বা লোক-গীত-কথায় এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। আমাদের সংগৃহীত দক্ষিণ বঙ্গের লোক-গীত-কথা "সতী রুমুনা ঝুমুনার পালা"য়ও এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। সেখানেও রুমুনা ও ঝুমুনা এক লোককেই পরম নিশ্চিন্তে স্বামী-রূপে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেনি। মনে হয় সে-যুগে (এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও) অনেকেরই একাধিক বিবাহ বা সপত্নী সহ বাস করবার মধ্যে আশ্চর্য বা অদ্ভুত কিছু মনে হতনা। আজকের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অবশ্য এ ব্যাপারটি খুব যে একটা গ্রহনীয় নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে কাহিনীটিকে তুলনা করতে হবে সেই যুগের দৃষ্টি এবং সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে,—যখন ইতর ভদ্র সকল সমাজেই পুরুষদের একাধিক বিবাহ দোষের কিছু ছিলনা।

রাজ কন্যার নাম—রূপবান। অবশ্য শব্দ দুটির অর্থ একই।

আলোচ্য গীত-কথাটির ভনিতায় দেখাযায় একলাসউদ্দিন নামে কোন এক ব্যক্তি এর রচয়িতা—এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু

উনি এই সুবৃহৎ গীতিকাটির একক রচয়িতা কিনা সে-কথা নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এই গীতিকাটি আমি সংগ্রহ করি বাংলা দেশের খুলনা জেলার শৈলদা গ্রামের লম্বোদর ঢালীর সহায়তায়। উনিও বলতে পারেন নি সঠিক ভাবে কে বা কে-কে এর রচয়িতা।

তবে অন্যান্য গীতিকার বেলায় যেমনটি হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। এক খুলনা জেলাতেই একাধিক 'রূপবান' পালার দল ছিল, মায় ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রায় সব জেলাতেই এর প্রচুর দল গজিয়ে উঠেছিল।

আমাদের সংগৃহীত লোক-নাটিকা বা লোক-গীত-কথাটি এক এক অঞ্চলে এক এক নামে প্রচলিত। এই রকম কয়েক দলের গান পাশা পাশি রাখলে সকলের ভিতর মোটামুটি একটা মিল পাওয়া যাবে।

আলোচ্য গীত-কথাটি কখনও নাটকের রূপে, কখনও বা 'লম্বা গীতি'র রূপে পাওয়া যায়। সেখানে কথক মশাইর মুখ থেকে যেমনটি শোনা গিয়েছিল তেমনটিই এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

।। সতী রুমুনা ঝুমুনার পালা ।।

কাহিনী

অনেকদিন আগে হাসনাবাদ পরগণার অধীনে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার নাম ডাক খুব, দেব-দ্বিজে ভক্তি, দীন-দুঃখীর পরম বান্ধব। কলিতে পাপী-তাপীদের কষ্ট দেখে তাঁর ইচ্ছে হ'ল, তিনি তার রাজ্যকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবেন। এ-জন্য তিনি 'ইন্দিপরবে'র আয়োজন করে ইন্দ্রধ্বজ পূজোর ব্যবস্থা করলেন।

এদিকে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেব দেখলেন,—এ ত' ভারী মুস্কিল, চন্দ্রকেতু রাজা যদি 'ইন্দিপরব' সমাপন করতে পারে, তাহলে সে ত' স্বর্গের অধীশ্বরই হয়ে পড়বে—তার কী অবস্থা হবে?

এই সব সাত পাঁচ ভেবে চন্দ্রকেতু রাজাকে অপদস্থ করবার জন্য স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র, মা গঙ্গার স্মরণাপন্ন হলেন। ইন্দ্র বললেন, দেখুন মা গঙ্গা, এক বিষম বিপদে পড়ে আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি, এ ঘোর বিপদ থেকে আপনি ছাড়া আর কেউই উদ্ধার করতে পারবে না।

গঙ্গাদেবী উত্তর দিলেন, আপনি দেবরাজ স্বর্গাধিপতি, আপনার কোনো কাজে যদি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি, তা'হলে খুবই খুশী হব। এবার বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?

ইন্দ্র বিনয় সহকারে উত্তর দিলেন, দেখুন, দক্ষিণবঙ্গে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা আছে। লোকটি খুবই ধার্মিক। শুনেছি, ও নাকি ইন্দ্রধ্বজ পূজো করে তার রাজত্বকেই দ্বিতীয় স্বর্গ বানাবে। এখন সে যদি সত্যিই একটা নতুন স্বর্গ তৈরী করে ফেলে, তা'হলে ত' আর আমার স্বর্গরাজ্যের কোন দামই থাকবে না, লোকে আর আমাকে দেবতাদের অধিপতি বলে মানবেই না। তাই, আমার একান্ত ইচ্ছে, ও যেদিন যজ্ঞ সমাপন করে পূর্ণাহুতি দেবে তখন আপনাকে নিয়ে আসতে যাবে আদিগঙ্গায়—যেখানে আপনার পুণ্য প্রবাহ প্রবহমান। তার বাসনা,

তার রাজত্বে আপনার আগমনে, আপনার সলিলস্পর্শে ওই রাজ্যের যত পাপী-তাপী সব উদ্ধার পাবে। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, সে যখন আপনাকে নিমন্ত্রণ করে তার রাজত্বে নিয়ে আসতে যাবে, আপনি তার প্রার্থনা পূরণ করবেন না—তা'হলে আর তার অভিলাষও পূরণ হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

গঙ্গা উত্তর দিলেন, দেখুন দেবরাজ, সে আমার পরম ভক্ত। বিনা দোষে কী করে তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারি বলুন—আমার দ্বারা ত' সে অধার্মিক কাজ করা সম্ভব নয়। তবে, একটা কথা আছে, আমি যখন ওর রাজত্বে প্রবেশ করব, তখন আমার যাত্রাপথে যদি কোনো অনাচার-কদাচার অথবা অধর্মী কিছু নজরে পড়ে তা'হলে আমি আর ওর রাজত্বে প্রবেশ করব না—সেখান থেকেই ফিরে চলে আসব।

ইন্দ্র, তথাস্তু—বলে সেখান থেকে বেরিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে গিয়ে হাজির হলেন ভাটীর প্রধান বড়খাঁ গাজীর কাছে।

বড়খাঁ গাজী ইন্দ্রের কাছ থেকে তার সেখানে আসবার কারণ জানতে পেরে দুঃখিত হয়ে বলে উঠলেন, চন্দ্রকেতু রাজা আমার বিশেষ বন্ধুলোক, কী করে বিনা দোষে তার ক্ষতি করি—আপনিই বলুন দেবরাজ।

ইন্দ্র দেখলেন, সাধারণ কথায় বড়খাঁ গাজীকে রাজী করান সম্ভব নয়, তাই এবার ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

ইন্দ্র অনেক ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন, দেখুন, সে ঠিক করেছে ইন্দ্রধ্বজ পূজো করে আগামী দশহারার দিন গঙ্গাকে তার রাজত্বে নিয়ে যাবে, তা'হলে সে এই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে যাবে—তখন আর আপনার কোন মান্য মান থাকবে না। আপনার ভাটী অঞ্চলও তার অধীনস্থ হয়ে পড়বে। জগৎ থেকে আপনার নাম একেবারেই মুছে যাবে। তাই এখনই তাকে একাজে বাধা দেওয়া আপনার একান্ত প্রয়োজন। আর সবচাইতে বড় খবর হ'ল ঐ দশহরার দিন গঙ্গাদেবীকে

তুষ্ট করবার জন্য একলক্ষ মানুষকে সে বলি দেবে। গঙ্গাদেবী নাকি সেই লক্ষ নর বলির রক্তের উপর দিয়ে তার পিছু পিছু তার রাজত্বে প্রবেশ করবেন।

ইন্দ্রের ছলচাতুরীতে কাজ হ'ল। অকারণে নরহত্যার কথা, সেই সঙ্গে তার প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে ইন্দ্রকে কথা দিলেন, তিনি যেভাবেই হো'ক গঙ্গার যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করবেনই।

এদিকে যজ্ঞ সমাপনের দিন আগত। শুভ দশহার দিন রাজা চন্দ্রকেতু লোক-লশকর নিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে চললেন আদিগঙ্গার মোহনায় গঙ্গাকে সাদরে বরণ করে নিয়ে আসবার জন্য।

গঙ্গাদেবীও পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত আদিগঙ্গা থেকে ধীরে ধীরে চন্দ্রকেতুর পিছে পিছে এগিয়ে আসতে লাগলেন। বড়খাঁ গাজী দেখলেন আর ত' সময় নেই—যা কিছু করবার এই বারই করা প্রয়োজন। তাই তিনি মুহূর্তমধ্যে কতকগুলি কাটা গরুর মাথা এনে রাখলেন গঙ্গার আগমন পথের সুমুখে। দেবী তাঁর যাত্রাপথের সুমুখে এই রকম ম্লেছ, নোংরা, অশাস্ত্রীয় দৃশ্য দেখে কুপিত হলেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে অভিশাপ দিলেন, আমায় নিমন্ত্রণ করে এইভাবে অপমান করলে, এর প্রতিফল তোমায় পেতেই হবে—এই বলে তিনি সেখান থেকেই আবার ফিরে চলে গেলেন আদিগঙ্গায়।

দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল ঝড়, বৃষ্টি ও ভূমিকম্প। রাজার রাজ্য, রাজধানী মুহূর্তকালমধ্যে সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের তলায় তলিয়ে গেল। সাতদিন, সাতরাত পরে যখন ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্পের প্রকোপ সম্পূর্ণভাবে শেষ হ'ল সেখানে নতুনভাবে গজিয়ে উঠলো নতুন জনপদ —সেদিনের নতুন বাসিন্দারা সবাই ভুলে গেল রাজা চন্দ্রকেতুর কাহিনী। যে পর্যন্ত গঙ্গা এগিয়ে এসেছিলেন আজও সেই জায়গার নাম 'দে-গঙ্গা', নামে খ্যাত। যেখানে ছিল রাজার কোষাগার, সে স্থানের নাম হয়েছে 'ধনপোতা'। রাজার গড়ের আর রাজবাড়িরও নাম হয়েছে 'বেড়াচাপা' বলে। সেই সঙ্গে রাজবাড়ির সংলগ্ন যে গুপ্ত নদীপথ

ছিল সে নদীও কালক্রমে ক্ষীণস্রোতা হয়ে পড়ল। নতুন যুগের লোকেরা তার নাম দিল,—'দেউল পোতার সোতা'।

ভূমিকম্প, জলপ্লাবনে যখন রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র সকলেই জলের তলায় তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, ঠিক সেই সময় দৈবানুগ্রহে রাজারই এক বংশধর, নামেতে ভগীরথ, ঐ "দেউলপোতার সোতা" দিয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চল্‌ল আরও দক্ষিণে ভাটীর দেশে এক চরা ভূমিতে।

ভগীরথ সেই চরাতে স্থাপন করল এক নতুন বসতি। রাজা চন্দ্রকেতুর নামানুসারে সে জায়গার নামকরণ করল "চাঁদখালি" বা "চান্দখালি"।

অনেকদিন অতীত হয়ে গেলে ভগীরথ মৃত্যুকালে পুত্র জগন্নাথকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। জগন্নাথও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে বিষয়-সম্পত্তির আরও বিস্তৃতি ঘটিয়ে পুত্র স্বরূপ চাঁদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে পরপারে যাত্রা করলেন।

স্বরূপচাঁদ পিতৃ-পিতামহের ধারা বজায় রেখে বিষয়-সম্পত্তির আরও বিস্তৃতি ঘটালেন। ঝুমুনা নামে ছিল তার একমাত্র কন্যা। যেমনি দেখতে রূপসী, তেমনি সর্বগুণসম্পন্না। বিবাহের বয়স হয়েছে কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। স্বরূপ পাত্রের জন্য ঘটক পাঠালেন দেশ থেকে বিদেশে।

ঘটক খুঁজতে খুঁজতে সত্যিই ঝুমুনার এক উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ পেল রায়মঙ্গলে অবনীচাঁদ সাহুর পুত্র মোহন। যেমনি দেখতে বিশাল তার দেহ, গৌরবর্ণ গাত্র, প্রসস্ত বক্ষ। পাত্র দেখে ঘটক মনে মনে পুলকিত হয়ে অবনী সাধুর (সাহু) কাছে প্রস্তাব দিল তার পুত্রের বিবাহের—চাঁদখালি গাঁয়ে স্বরূপ বেনিয়ার একমাত্র কন্যা ঝুমুনা সুন্দরীর সঙ্গে।

স্বরূপ বেনিয়া অবনীচাঁদের পূর্ব পরিচিত। উভয়েই উভয়ের বিত্ত-বাসের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কাজেই ঘটকের প্রস্তাবে অবনীচাঁদ

এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। স্থির হ'ল, সামনেই যে চৈত্র মাস, মোম মধু সংগ্রহের সময়—এর পরেই শুভ বৈশাখেই মোহনের সঙ্গে হবে ঝুমুনার বিবাহ।

ঘটক খুশী মনে চাঁদখালিতে ফিরে গিয়ে খবর দিল স্বরূপের কাছে। তবে সেই সঙ্গে স্বরূপকে একটা প্রয়োজনীয় কথাও স্মরণ করিয়ে দিল—দেখুন সাধুমশাই, কন্যার বিবাহের যোগ্য আয়োজন আপনি যে করবেনই তা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখবেন, যখন জামাই নিয়ে আসতে যাবেন রায়মঙ্গলে তখন পথে কেঁদোখালি গাঁয়ে বাবা দক্ষিণ রায়ের যে থানা আছে, সেখানে কিন্তু পূজো দেওয়াই চাই।

ঘটকের কথায় অবনীচাঁদ খুবই খুশী হয়ে উঠল। বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল ঝুমুনার বিয়ের জন্য। দেখতে দেখতে শুভ বৈশাখ মাসের এক শুভ দিনে ঝুমুনার বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল। অনেকদিন পর বাড়িতে উৎসবের ঘটা। সিংহ দরজায় রশৌন চৌকিতে বসল সানাই, বাড়ির ভিতর খাটানো হ'ল চাঁদোয়া, চারিদিকে আলোর রোশনাই। সেই সুসজ্জিত বিবাহ বাসরে এসে দাঁড়াল বর—মোহন সাহু।

স্ত্রী-আচার, মঙ্গলাচারের পর শুভক্ষণে বিবাহপর্ব সাঙ্গ হ'ল। সুখেতে বাসর রাত্রি অতিবাহিত করে পরদিন দুপুরের দিকে মোহন নববধূ নিয়ে ফিরে চললো নিজদেশ—রায়মঙ্গলে।

বৌ দেখে সাহু বাড়ির সবাই খুশী। শাশুড়ী ত' বলেই ফেললেন, বউ তা'র খুব পয়মন্ত, এইবার মোম মধুতে প্রচুর লাভালাভ হয়েছে।

এক কথায় সাহুবাড়ির সবাই খুশী। কিন্তু এই হৈ-হট্টগোলের ভিতর সকলেই ভুলে গেল বাবা দক্ষিণ রায়ের পূজো দিতে।

কয়দিন কেটে গেল আমোদে-আহ্লাদে। এক শুভদিনে মোহন স্ত্রী-সহ চল্‌ল শ্বশুর বাড়ি অষ্টমঙ্গলার গিঁট খুলতে। কিন্তু সে জানে না কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি গম্ভীর পদক্ষেপে ধাওয়া করল তাদের পাল্কীর পিছনে পিছনে।

স্বরূপচাঁদের বাড়ি যেমনি বিশাল, তেমনি সুরক্ষিত। কুড়ি হাত পরিমাণ শাল কাঠের খুঁটি দিয়ে বাড়ির চারিদিক ঘেরা। সে খুঁটিগুলোর উপর আবার ঘন ঘন সাজানো সব ধারালো হাঙ্গরের দাঁত ঊর্দ্ধমুখীন করা। এ ছাড়াও সমগ্র বাড়িটি ঘিরে রয়েছে বিশাল পরিখা। সে-সব ডিঙিয়ে চোর ডাকাত ত' দূরের কথা, কোন শ্বাপদ প্রাণীরও ভিতরে প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপে দুঃসাধ্য। সুতরাং মহা নিশ্চিন্তেই দিন কাটায় মোহন শ্বশুরবাড়ির আদর-যত্নে।

একদিন, দুইদিন, তিনদিনের দিন রাত্রে আহার সমাপন করে আগু-পিছু প্রহরী নিয়ে মোহন ঘরের বার হয় মুখ ধোবার জন্য। মুখ ধোওয়াও হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি করে ঘরে উঠতে যাবে হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত কোথা থেকে সেই দুর্ভেদ্য বেড়া ডিঙিয়ে এসে হাজির হল সুন্দরবনের বহু খ্যাত এক বিশাল বাঘ। মুহূর্তমধ্যে জামাই মোহনকে কাঁধের উপর ফেলে এক লাফে সকলের চোখের সুমুখেই উধাও হয়ে গেল।

প্রথমটায় সকলেই হতচকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেয়েই শুরু হ'ল খোঁজ-খবর, তত্ত্ব-তালাসী।

কিন্তু না, সে বাঘের বা মোহনের কোন খোঁজই আর কেউ এনে দিতে পারল না।

খবর পেয়ে এগিয়ে আসে ঘটক প্রবর। বলে, সাধু, বাবা দক্ষিণ রায়ের কাছে মানত করে ছিলে, মেয়ের বিয়ের আগেই হ'ক বা তার পরক্ষণেই হো'ক তাঁ'র পূজো দেবে, কিন্তু তুমি তা দিলেনা—এ তারই প্রতিফল।

ব্যাঘ্র মহাবাজ মোহনকে কাঁধে নিয়ে এক এক লাফে মুহূর্ত মধ্যে গিয়ে হাজির হল এক গভীর বনের ভিতর। বাঘ শিকার নামিয়ে রেখে হালুম, হুলুম করে শুরু করল ডাকা ডাকি। তার ডাকে সেখানে এসে জড় হল অষ্টাশীটা বাঘ।

বাঘেরা জটলা করে, কী ভাবে এবার শিকার সংহার করবে।

এদিকে সেই বনের ভিতর মাধাই নামে ছিল এক কাঠুরিয়ার বাস। তার ছিল এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা—রুমুনা তার নাম। সে ছিল বনদেবীর সেবিকা। বয়স হয়েছে বছর কুড়ি, অথচ আজও পর্যন্ত উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তার বিয়ে হয়নি। বাপ বেটীর সংসার। হঠাৎ রুমুনা স্বপ্নাদিষ্ট হয়। মা-বনদেবী যেন বলছেন, দেখ্ বাছা, এতদিনে তোর উপযুক্ত পাত্র এসেছে, তোরই ঘরের দুয়ারে। আঠার ভাটীর শেষে বনের ভিতর দক্ষিণ রায়ের এলাকায় সে বন্দী হয়ে রয়েছে। এই দণ্ডেই তোর বাবাকে পাঠিয়ে দে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে। সে ফিরে এলে তার সঙ্গেই হবে তোর বিয়ে। আজ থেকে তাকেই তোর পতি বলে মান্য করবি—এর যেন অন্যথা না হয়। তোর কোনও চিন্তা নেই—যদিও দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে আমার বিবাদ বর্তমান। তবু শুধু তোর জন্যই আমি আজ ওকে রক্ষা করবই। এক্ষুনি মাধাইকে সেখানে পাঠিয়ে দে।

স্বপ্ন ভঙ্গ হতেই রুমুনা দৌড়ে গিয়ে বাবার কাছে সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করে সেই মুহূর্তেই তাকে পাঠিয়ে দেয় মোহনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবার জন্য।

এদিকে বনদেবীর কৃপায় মোহনের জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখ মেলেই দেখে, এক বনের ভিতর অসংখ্য বাঘের সুমুখে সে শুয়ে রয়েছে ঘাসের উপরে। কাছাকাছি আত্মরক্ষা করবার মত কিছুই নেই, কেবল সরল কতকগুলি সুন্দরী গাছ তাদের দীর্ঘ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ বনদেবী এক পক্ষি মূর্তি ধারণ করে মোহনের কাছে গিয়ে চক্রাকারে পাক দিতে দিতে মানুষের কণ্ঠেই বলে উঠ্লেন, তোর কোন ভয় নেই, এইত ভাল সময়, এই দণ্ডেই চট্ করে ঐ যে গাছগুলি রয়েছে, ওর যে কোন একটায় বেয়ে উঠে আগায় গিয়ে পৌঁছো—এদের জব্দ করবার ব্যবস্থা আমি করছি।

বনদেবীর দৈববাণীতে মোহন যেন সম্বিত ফিরে পায়। চেয়ে দেখে, বাঘেরা সব একত্রিত হয়ে কী-সব যেন পরামর্শ করছে। সে আর

মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে মা-বনদেবীর নাম স্মরণ করে কাছাকাছি যে সরল বৃক্ষটি ছিল তাই বেয়ে তর্ তর্ করে উপরে উঠতে শুরু করল। সে যখন প্রায় গাছের মাথায় গিয়ে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ ব্যাঘ্র কুলের নজর পড়ল সেই দিকে। শিকার হাত ছাড়া হয়ে যায় দেখে তারাও ভীষণ আক্রোশে শুরু করল হাঁক ডাক। কেউ কেউ লাফ্ দিয়ে শিকার ছিনিয়ে আনবারও চেষ্টা করে। কিন্তু মোহন ততক্ষণে অনেক উপরে উঠে গেছে—একেবারে ওদের নাগালের বাইরে।

বাঘেরা তখন যুক্তি করে। সবাই মিলে গাছের তলায় জড়ো হয়ে একের পিঠে আরেকজন চেপে দেওয়াল গাঁথার মত করে মোহনকে প্রায় ধরে ফেলে আর কি। মোহন দেখে আর নিস্তার নেই, উপরেও আর উঠবার জায়গা নেই, মাত্র আর কয়েক হাত দূরেই বাঘের থাবা। এইবার মরিয়া হয়ে সে মা-বনদেবীকে ডাকতে থাকে। আতঙ্কে গলার স্বর আর বেরুতে চায় না। মূর্ছিতপ্রায় অবস্থা। হঠাৎ দেখে কোথা থেকে এগিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুল। তারা এসেই এলোপাতাড়ি ভাবে দংশন শুরু করল বাঘের নাকে, মুখে, চোখে, গায় সর্বাঙ্গে।

ভীমরুলের কামড় বড় শক্ত কামড়। কামড়ের চোটে বাঘেরা তাশের ঘরের মত ঝুপ্ ঝুপ্ করে উপর থেকে পড়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল বনের চারিদিকে। ভীমরুলের ঝাঁক তখনও সমানে তাড়না করে চলেছে ওদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনপ্রান্তর গেল ফাঁকা হয়ে।

মোহন আর পারেনা। হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে হাত ফস্কে পড়ে গেল নিচে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে মা-বনদেবী এক বিশাল বাজ পাখীর রূপ ধরে তার দেহটা তুলে নিলেন তা'র নিজ পক্ষপুটে।

এদিকে মা-বনদেবীর নির্দেশ অনুসারে ঘটনাস্থলে এগিয়ে এসেছে মাধাই কাঠুরিয়া। দূর থেকে বনের আড়াল থেকে এতক্ষণ অতি-সঙ্গোপনে লক্ষ্য করছিল, মা-বনদেবীর অসীম লীলা খেলা।

মাধাই এগিয়ে এসে নিকটস্থ জলাশয় থেকে জল এনে মোহনের চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে কাপড়ের খুট দিয়ে বাতাশ করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে।

মাধাই তাড়াতাড়ি করে মোহনকে সঙ্গে নিয়ে চলে ঘরের পানে। কিন্তু মনে মনে সে যে-আশঙ্কা করছিল তাই হ'ল। কিছুদূর যেতে না যেতেই পথ আগলে এসে দাঁড়ালেন বাবা দক্ষিণ রায় এবং তার চেলা চামুণ্ডারা।

দক্ষিণ রায়কে দেখে উভয়েরই তখন ভীরমি লাগার যো। দক্ষিণ-রায় পষ্ট বললেন,—মাধাই, তুই বনদেবীর ভক্ত, তাই তোকে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু ওকে আমার চাই-ই। ও আমার পূজা মানত করে পূজা দেয়নি, আজ ওর প্রাণ সংহার করবই। যদি তুই ওকে রক্ষা করবার চেষ্টা করিস, তা'হলে তুইও নিস্তার পাবিনা।

মাধাই বলে, বাবা, যদি নররক্তেই তোমার বাসনা, তাহলে, এই আমি আমার জীবন তোমার পায়ে সমর্পণ করছি তুমি একে ছেড়ে দিয়ে আমায় গ্রহণ কর—

দক্ষিণ রায় বললেন, তোকে খেলেত বনদেবীর সঙ্গে আমার খামকা বিবাদ হবে। তার দরকার নেই, তুই ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘরে চলে যা—

কিন্তু মাধাই মোহনকে আঁকড়ে ধরে সমানে প্রার্থনা করে চলেছে মা-বনদেবীর কাছে। বনদেবী দেখেন, আর ত সময় নেই, অঘটন একটা কিছু ঘটে গেলে আর কোন উপায় থাকবেনা। তাই নিমিষের মধ্যে তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে এসে হাজির হলেন ঘটনাস্থলে।

বনদেবী বললেন, দেখ রায়, তুমি এদের ছেড়ে দাও, আমি কথা দিচ্ছি আগামী শুক্লা অষ্টমীর দিন মহা সমারোহে এরা তোমার পূজো দেবে। পরে মাধাইর দিকে ফিরে বললেন, তোমরা আর দেরী কোরোনা, তোমাদের পথের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে রুমুনা। যে ভাবে বললাম, সেই ভাবে রুমুনার বিয়ের পর দক্ষিণ রায়ের পূজো অবশ্যই দিও।

এদিকে যখন স্বরূপ বেনিয়ার ঘরে মহা ক্রন্দনের রোল উঠেছে, ঝুমুনা কাঁদতে কাঁদতে দু'চোখ প্রায় অন্ধ করে ফেলেছে, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ মানুষের রূপ ধারণ করে দক্ষিণ রায় এসে হাজির হলেন ঘটনাস্থলে। বললেন, দেখ আর চিন্তা কোরোনা। তোমাদের জামাই কুশলেই আছে। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাও, বনমধ্যে যেখানে মাধাই নামে এক কাঠুরিয়া বাস করে, সে সেখানেই অবস্থান করছে। বাবা দক্ষিণ রায়ের পূজো দিয়ে এই দণ্ডেই ঝুমুনা যেন সেখানে গিয়ে তার স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে—এই কথা বলেই মনুষ্যমূর্তিধারী দক্ষিণ রায় পলকের মধ্যে ব্যাঘ্রমূর্তি ধারণ করে এক লাফে বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দক্ষিণ রায়ের নির্দেশ মত সবাই যাত্রা করে কেঁদোখালি গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। পথে বাবা দক্ষিণ রায়ের উদ্দেশ্যে দেয় লক্ষ ছাগ বলি। ঢাক, ঢোল, সানাই বাজিয়ে স্বরূপ বেনিয়া জামাই বরণ করে নিয়ে আসবার জন্য যখন মাধাইর বাড়ির দিকে এগিয়ে এসেছে হঠাৎ সকলের নজরে আসে মাধাইর বাড়িতেও বিবাহের মঙ্গল বাদ্য বাজছে।

কী ব্যাপার? বুঝতে না পেরে সবাই এদিক ওদিক চাওয়া-চাওয়ি করে। আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতরে গিয়ে সবাই অবাক! একি! তাদেরই জামাই মোহন এখানে বরবেশে কেন?

সকলে চেয়ে দেখে, বিবাহের শেষে নববধূ সহ মোহন বসে রয়েছে সভা আলো করে। দেখে ঝুমুনা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। রুমুনা এগিয়ে এসে ঝুমুনার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে তাকে ধাতস্থ করে। রুমুনা ঝুমুনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, দিদি, আমাকে দোষের ভাগী কোরোনা, আমি মা-বনদেবীর আজ্ঞায় আজ তোমার স্বামীকেই আমার স্বামী বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। নিশিশেষে তুমি পতিসহ খুশী মনে গৃহে প্রত্যাগমন কর, আমি এখান থেকেই তোমাদের উভয়ের মঙ্গল কামনা করতে থাকব। কী ভাবে আমাদের পতি দেবতা প্রাণ ফিরে পেলেন, সবই তার কাছে শুনতে পাবে। আজ যখন দয়া

করে এখানে এসেই পড়েছ, তখন এই দরিদ্র ভগ্নীর পিতৃগৃহে সামান্য কিছু আহার্য গ্রহণ করে কষ্টের মধ্যেই রাতটুকু কাটিয়ে আগামী ভোরেই পতি নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন কর, আমি এ-জন্য কিছুমাত্র বাধাও দেবনা কোন অনুযোগও করবনা কারও কাছে।

ঝুমুনা পরম স্নেহে রুমুনার হাত ধরে পাশে বসিয়ে আস্তে আস্তে নিজের গায়ের সব অলঙ্কার খুলে তাকে সাজিয়ে দিয়ে বরণ কুলার সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল তার কপালে, সিঁথিতে।

রুমুনা কেঁদে ফেলে। বলে, দিদি, এ তুমি কী করলে, তুমি স্বহস্তে তোমার পতি ধনকে আজ আমার হাতে সঁপে দিলে?

ঝুমুনা সস্নেহে রুমুনার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, তোর জন্যই ত' বোন, আজ আমার স্বামীর প্রাণ ফিরে পেয়েছি। আজ ত' আমাদের সকলেরই মহা আনন্দের দিন। এখন থেকে আমরা দুই বোনে আমাদের পতির দু'পাশে জয়া-বিজয়া দাসীর মত থাকব। আমরা যেন চিরদিনই এই ভাবে একই বোঁটায় দুটি ফুল হয়ে থাকতে পারি।

এদিকে এখানে যখন এই অভূতপূর্ব নাটক সঞ্চারিত হচ্ছে তখন ওদিকে অবণী চাঁদ সাধুর বাড়িতেও খবর গিয়েছিল এই পরম দুঃসংবাদের। কিন্তু বাবা দক্ষিণ রায়ই স্বপ্ন দিয়েছেন তার পুত্র বেঁচে আছে তাঁ'রই কৃপায়।

দক্ষিণ রায়ের প্রত্যাদেশ পেয়ে অবণী চাঁদ সাধুও লোক লস্কর নিয়ে বাজনা বাদ্যি বাজিয়ে রওনা দিল ভাটীর দেশে মাধাইর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

মাধাইর বাড়িতে আজ আনন্দের হাট বসেছে। একত্রিত হয়েছে অবণী চাঁদ সাধু ও স্বরূপ বেণিয়া। মহা হট্টগোলের মধ্যে অবণী চাঁদ একহাতে ধরলেন রুমুনার হাত অপর হাত দিয়ে ধরলেন ঝুমুনার। আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন, আজ আমার এক পুত্র, কিন্তু মেয়ে আমার দু'জন। আমার দু'মায়ই আমার কাছে সমান।

আনন্দ কোলাহল শেষে, এইবার ঘরে ফিরবার পালা। স্বরূপ এবং অবণী চাঁদ উভয়েই মাধাইকে অনুরোধ জানালো তাদের সঙ্গে যাবার জন্য। কিন্তু মাধাই রাজী হলনা। বলে, বেয়াই, আমার পূর্বজন্মের অনেক সুকৃতির ফলে মা-বনদেবীর কৃপায় আজ তোমাদের কুটুম্বে পরিগণিত হয়েছি। আমি এখানেই থাকব। মা-বনদেবীর পূজো করেই আমার বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেব। তবে, আপনাদের কাছে আমার সকাতর অনুরোধ, যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে পথিমধ্যে কেঁদোখালিতে বাবা দক্ষিণ রায়ের পূজো দিয়ে যাবেন, আর আগামী শুক্লা অষ্টমীতে বাবা দক্ষিণ রায় এবং মা-জননী বনদেবীরও একত্রেই পূজোর ব্যবস্থা করবেন।

বেলা পড়ে আসে। মোহন একপাশে রুমুনা অপর পাশে ঝুমুনাকে নিয়ে লোক-লস্কর, বাদ্যভাণ্ড, আলোক মালায় সজ্জিত হয়ে যাত্রা করে নিজের ঘরের পানে। পথিমধ্যে রুমুনা ঝুমুনা দুইজনে প্রণাম করে বাবা দক্ষিণ রায়ের থানে এবং মাথায় তুলে নেয় বনবিবি (বনদেবী) তলার মাটি।

বর কনে চলে যায়। অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকে মাধাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, সেই দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে ওদের শেষ লোকটিও চোখের আড়ালে চলে গেলে যুক্ত করে প্রণাম জানায় ভাটির দেশের রাজা বাবা দক্ষিণ রায় এবং বনের মাতা বনের দেবী-বনবিবি (বনদেবী) র উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ধীরে ধীরে শূন্য ঘরে ফিরে আসে মাধাই কাঠুরিয়া।

॥ কাব্য ॥

(১)

শুনেন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন,
রুমুনা ঝুমুনার পালা করিবেন শ্রবণ।

পূর্বেতে হাসানাবাদ পরগনায় ছিল
রাজা চন্দ্রকেতুর বাস,
দেবে দ্বিজে ভক্তি রাজার শমনে পায় ত্রাস।
ধন ধান্যে পূর্ণ রাজার নাহি লেখা জোকা,
হাতী শালে হাতী রাজার ঘোড়াশালে ঘোড়া।
নিকটেই ইছামতী নদীর প্রধান,
তাহাতে ভাসিত রাজার ডিঙা চৌদ্দশ খান।
দশদিকে যাইতো রাজার বাণিজ্যের বেসাতি,
যবন বেনিয়া কত করিত সঙ্গতি।
দক্ষিণে কপিল নাম মহা জাগ্রত মুণি,
সেই পর্যন্ত ছিল রাজার রাজ্য রাজধানী।
ইন্দিপরব করে রাজা বিলায় লক্ষ ধন,
স্বর্গেতে পড়িল টনক কাঁপে ত্রিভুবন।
দেবগণে যুক্তি করে কে এই মহামতী,
ইন্দিপরব সাঙ্গ হইলে রাজা পাবে স্বর্গ রাজধানী।
চিন্তিয়া ভাবিয়া ইন্দ্র করে যুক্তি মা গঙ্গার সহিতে,
তুমি দেবী না করিলে দয়া স্বর্গ না পারি রাখিতে।
গঙ্গা বলে, কী সমাচার কহগো আমারে,
অবশ্য করিব কার্য যদি লাগে তব কাজে।
ইন্দ্র বলে, শোন দেবী, শোন দিয়া মন,
দক্ষিণেতে আছে এক চন্দ্রকেতু রাজন।
ইন্দ্রধ্বজ পূজা সে যে করিবে সমাপন,
ইহার ফলেতে স্বর্গে তার অবশ্য গমন।
পুণ্যের ফলেতে রাজা যদি নতুন স্বর্গ বানাইতে চায়,
অবশ্য লভিবে তায় কথা মিথ্যা নয়।
পাপী তাপী উদ্ধারিতে রাজা হেথায় স্বর্গ বানাইতে চায়,
তোমারে আমন্ত্রণ তিনি করিবেন নিশ্চয়।

তোমারে মিনতি করি শুন গঙ্গা দেবী,
চন্দ্রকেতুর ডাকে সাড়া না দিও আপুনি।
গঙ্গা বলে, দেবরাজ, সত্যবদ্ধ আমি,
মহাভক্ত চন্দ্রকেতুর ডাক কেমনে দিব ফেলি।
তোমাদের হিতার্থে এক কার্য করিতে পারি,
অনাচার হেরিলে সেথা পরিত্যাজ্য করি।
তথাস্তুঃ তথাস্তু বলি ইন্দ্র করিল প্রস্থান,
আহুতির দিন ক্রমে হইল আগুয়ান।
সর্বদেব নিমন্ত্রণ করি রাজা পূজে গঙ্গা দেবী,
কী বা বর চাও রাজা বলত আপুনি।
রাজা বলে, শোন মাতা, আমি অভাজন,
পাপীতাপির লাগি মন মোর কান্দে অনুক্ষণ।
স্বর্গেতে না যাইতে চাই মোর প্রজাগণে ছাড়ি,
মনেতে বাঞ্ছা আছে এখানে এক নতুন স্বর্গ গড়ি।
তুমি যদি চল মাতা মোর রাজ্য রাজধানী,
তোমার পরশে উদ্ধারিবে নরে তুমি পতিতপাবনী
গঙ্গা বলে, শোন রাজা, তুমি ভক্তেরি প্রধান,
তব অভিলাষ পূরাইবো না হইবে আন।
অনাচার, কদাচার আমার যাত্রাপথে
কভু যেন নাহি হয়,
সেইমত কার্য তুমি করিও নিশ্চয়।
তাহাই হইবে মাতা দশহরার দিনে,
তোমারে পূজিয়া নিতে মুই আসিব এইখানে।
এত বলি চলে রাজা হরিষ অন্তরে,
যজ্ঞের আয়োজন করে পূজার মন্দিরে।
এদিকেতে ইন্দ্ররাজা কৌশলে এক কর্ম করে,
মুনিঋষি সাজিয়া চলে গাজী বড়খাঁর দরবারে।

গাজী বড়খাঁ ছিল ভাটীর অধিশ্বর,
তাহারে ইন্দ্র দিল এক নূতন সমাচার।
ইন্দ্র বলে, শোন গাজী, তুমি মোর দোস্ত,
এক জরুরী বার্তা দিতে তোমায় করিয়াছি মনস্ত।
দক্ষিণের চন্দ্রকেতু রাজা করিয়াছে স্থির,
ভাটী হইতে খেদাইয়া তোমায় করিবে অস্থির।
এখনও হিত যদি চাও, শোন দিয়া মন,
বলিনু সত্য কথা না ভাব স্বপন।
দশহরার দিনে চন্দ্রকেতু যখন আনিবে গঙ্গা মাই,
অবশ্য তোমার তখন তারে বাধা দেওয়া চাই।
এই মত কর যদি কর্ম সমাপন,
ভাটীর দেশেতে তুমি রহিবে প্রধান।
গাজী বলে, চন্দ্রকেতু মোর বন্ধু হয় যে বড়,
অকারণে ক্ষতি তার করি ক্যামনে চিন্তিতেছি বড়।
ইন্দ্র বলে, অকারণে প্রাণীহত্যা সর্বধর্মে মানা,
লক্ষ নরবলি দিবে রাজা মন করিছে বাসনা।
ইহার উপর হয় যদি সে তোমার অধীশ্বর,
ছুনিয়া মাঝারে আর তোমার না রবে কদর।
নরবলির কথা শুনি গাজীর হইল বিষম গোস্বা,
চন্দ্রকেতু রাজায় জব্দ করিতে করিল বিষম প্রতিজ্ঞা।
এদিকেতে যজ্ঞের দিন হইলো সমাগত,
তেত্রিশ কোটী দেবতায় পূজে রাজা
পূজে বিধি মত।
মহাবাদ্য কোলাহল, শঙ্খ নিয়া হাতে,
চন্দ্রকেতু রাজায় চলে গঙ্গায় আনিতে।
চলে রাজা, চলে মন্ত্রী, শাস্ত্রীরা সাবধান,
আদি গঙ্গায় আসিয়া রাজা পাইলেন দরশন।

পূর্বের স্বীকৃত মত গঙ্গাদেবী আসিতে লাগিল,
ছুই তীরে মহা উল্লাসে, হুলুধ্বনি দিল।
কত পথ, কত ঘাট, পার হইয়্যা শেষে,
পৌঁছাইলো গঙ্গার ধারা চন্দ্রকেতুর দেশে।
এদিকেতে গাজী দেখেন আর তো বিলম্ব নাই,
যাহা কিছু করিবার করিব নিশ্চয়ই।
একবার গঙ্গা যদি পৌঁছায় চন্দ্রকেতুর দেশে,
অবশ্য প্রমাদ ঘটিবে তার হইবে অবশেষে।
এইরূপ চিন্তিয়া গাজী তখন কয়টা কাটা গরুর মাথা
আনিয়া ফেলিল,
যে পথে গঙ্গা দেবী আসিতে আছিল।
অপবিত্র পর্শনে গঙ্গা ক্রোধান্বিত হইল,
সেইও দণ্ডে গঙ্গা মাই পশ্চাৎগামী হইল।
ষড়যন্ত্র বুঝিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল,
কান্দিতে কান্দিতে রাজা ভূমে লোটাইয়া পড়িল।
গঙ্গা বলে, শোনো রাজা, সত্যভঙ্গ করলা অবশেষে,
আর না যাইব মুই তোমারও ওই দেশে।
আমন্ত্রণ করিয়া মোরে দিলা মনস্তাপ,
এই না কারণে তোমায় দিলাম অভিশাপ।
তোমার ক্ষতির তুমি না পাইবা পরিমাণ,
এইও দণ্ডে সব্বংশে হইবা নিধান।
যেই না মুহূর্তে দেবী হইলা অদর্শন,
ঊনকোটি বায়ু আসি হইল আধিষ্ঠান।
সেইও দণ্ডে মা বাসুকী কাঁপিতে লাগিল,
ভূমিকম্প আরম্ভিলে রাজার রাজ্যপাট রসাতলে গেল।
সাতদিন, সাত রাত্তির সে তাণ্ডব চলিতে লাগিল,
চন্দ্রকেতুগড়ের চন্দ্র অস্তাচলে গেল।

অনেক দিন হইলে গত কুঃস্বপনের মত,
মুনিষ্যে ভুলিয়া গেল চন্দ্রকেতুর বৃত্তান্ত।
আজিতক যে পর্যন্ত গঙ্গা গিয়াছিল চন্দ্রকেতুর সঙ্গে,
'দে-গঙ্গা' নাম ধারণ করিয়াছে বঙ্গে।
'বেড়াচাপায়' চাপা পইল রাজার রাজ্য রাজধানী,
'ধনপোতা' নাম নেয় রাজার কোষাগার ভিটি।
এই না রাজার এক বংশধর ভগীরথ যার নাম,
স্রোতেতে ভাসিয়া আসে চান্দখালি ধাম।
যে নদীর সাথে ছিল রাজপুরীর গুপ্ত যোগাযোগ,
'দেউল পোতার সোতা' এবে বলে সর্বলোক।
দেউল পোতার সোতা দিয়া ভগীরথ ভাসিয়া চলিল,
ভাসিতে ভাসিতে শেষে এক চরেতে ঠেকিল।
চরেতে বসতি করে ভগীরথ বসতি স্থাপিয়া,
'চান্দখালি' নাম রাখে স্থানের রাজারে স্মরিয়া।
ভগীরথের পুত্র ছিল জগন্নাথ বেনিয়া,
তার পুত্র স্বরূপচাঁদের কথা শোন মন দিয়া।

(২)

দক্ষিণে ভাটীর দেশ চান্দখালি গাঁয়ে,
স্বরূপ বেনিয়ার ছিল এক সুন্দরী মেয়ে।
রূপে গুণে অনুপাম ঝুমুনা তাহার নাম,
হলুদ বরণ গাত্র যার অঙ্গটি সুঠাম।
ষোড়শ বচ্ছর হইল কন্যার বিয়া নাই হয়,
স্বরূপ বেনিয়া তখন ঘটককে ডাকায়।
ঘটক বলে, সাধু, তুমি চিন্তা কর কিসের,
উত্তর হইতে পাত্র এক আনিব বিশেষ।
এই কথা বলিয়া ঘটক ছাতি, লাঠি নেয়,
সাঁঝ সন্ধাকালে গিয়া রায়মঙ্গল পৌঁছায়।

রায়মঙ্গলে ছিল এক অবণী চাঁদ সাউ,
তার মত সাধু এই ভাটিতে আর না আছিল কেউ।
ঘটক বলে, সাধুমশাই, এক নিবেদন করি,
আপনার আছে যোগ্য পুত্র, তার বিয়ার প্রস্তাব করি।
চান্দখালি গাঁয়ে আছে স্বরূপ বেনিয়া,
তার কন্যা ঝুমুনা রূপেগুণে ধইন্যা।
আপনার পুত্র মোহন যার দেশ বিদেশে খ্যাতি,
এই কন্যার যোগ্য পাত্র বুঝিলাম খাঁটি।
সাধু বলে, মহাশয়, স্বরূপ আমার দোস্ত,
তার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহে করিলাম মনস্ত।
সম্মুখে চৈত্রমাস মোম-মধুর সময়,
বৈশাখে ফিরিয়া ঘরে, পুত্রের বিবাহ দিব যে নিশ্চয়।
এত শুনি ঘটকবর চলে নিজ বাসে,
দেখিয়া ঘটকে স্বরূপ পুলকেতে ভাসে।
ঘটক বলে, সাধু মশাই, চিন্তা আর কেন,
কন্যার বিবাহের আয়োজন এই দণ্ডেই কর।
কিন্তু একটি কথা তোমায় স্মরণ করান চাই,
পথেতে কেঁদোখালি গাঁও এক আছে, জানেনত'
নিশ্চয়ই।
কেঁদোখালিতে আছে জেনো দক্ষিণ রায়ের থানা,
জামাই আনিবার কালে হোথায় অবশ্য দিও পূজা।
স্বরূপ বলে, ঘটক মশাই, না ভাবিও আন,
বাবা দক্ষিণরায়ের পূজায় অবশ্য দিব মান্যমান।
এত বলি স্বরূপ বেনিয়া হরিষ অন্তরে,
অন্দরে বারতা দেয়, মহা কলরবে।
শুনিয়া বেনিয়া গিন্নী আনন্দেতে ভাসে,
তাম্বুলাদি দিয়া সব পড়শীরে ডাকে।

এইরূপে কিছুদিন হইল গত,
ঝুমুনার বিবাহের বয়ান এবার শুনুন বিধিমত।

(৩)

বৈশাখ মাসে ফেরে সাধু বাদাবন হইতে,
মোম মধু সাত ডিঙা আনিল সহিতে।
মোম মধু বিক্রি করি সাধুর হরষিত মন,
শুক্লপক্ষেতে করে বিবাহের দিন নিরূপণ।
সিং দরজায় বসিল সানাই উঠানে সামিয়ানা,
চাঁন্দখালি গাঁয়ে পড়ল আনন্দের আলপনা।
কেহ খায়, কেহ গায়, নাচে কেউবা রঙ্গে,
ঝুমুনার হইবে বিয়া মোহন বেনিয়ার সঙ্গে।
নামেতে মোহন যার রূপে চান্দপানা,
খেসারীর ডাইলের মত অপূর্ব দেহখানা।
হস্ত দু'খান লোহার শাবল বক্ষটি বিশাল,
সেই বক্ষে আলিঙ্গন হইলে ঝুমুনার বড়ই যে কপাল।
বিয়ার সাজে সজ্জ হইল মোহন বেনিয়া,
চৌ-দোলা চাপিয়া চলে বরযাত্রী নিয়া।
আগে চলে মশালধারী পিছে তীরন্দাজ,
বাদ্যবাদন চলে সঙ্গে বিয়ার চলন করে আন্দাজ।
খুশীতে বেনিয়ার পো করে ডগমগ,
বন্ধুজনার সাথে করে নানা রঙ্গ।
হেনকালে সইঞ্চা কালে পৌঁছাইলো চান্দখালি গাঁয়,
সানাই বাজাইয়া বেনিয়া স্বাগতম জানায়।
উপরে চান্দোয়া শোভে নিচেতে ফরাশ পাতা,
তার মধ্যে বেনিয়ারপোর আসন যেন বিলের পদ্মপাতা।
চৌ-দিকে মহা সোরগোল কান পাতা দায়,
টিকারা নাগেরা বাজে বিয়ার গান গায়।

হেনকালে রাত হইল সোয়া দুই প্রহর,
বর আসিয়া দাঁড়াইলো পিঁড়ির উপর।
স্ত্রী-আচার, কুলাচার, দেশাচার মতে,
যত কিছু কর্ম ছিল শেষ করে আগে।
পুরোহিতের মন্ত্র শেষে শুভদৃষ্টির বেলা,
কী জানি কী লেখিয়া দিল অলক্ষ্যের খাতা।
শঙ্খ বাজে, তম্বুরা বাজে, বাজেরে মৃদঙ্গ,
বরযাত্রী সবে মিলি করে নানা রঙ্গ।
সুখের বাসর রাতি গেল পোহাইয়া,
ঘরে ফিরিবার তাড়া করে মোহন বেনিয়া।
বেলা দুই পহর, ঘরেতে যাত্রা করে বরযাত্রীগণ,
মঙ্গলাচারে বিদায় দেয় পুরনারীগণ।
এইরূপে লোকজন নববধূ নিয়া,
ভাটির দেশ ছাড়ি চলে উজানে বাহিয়া।
মহা হট্টগোল, কোলাহলে সকলেই ব্যস্ত,
বাবা দক্ষিণরায়ের কথা আর কারও
না হইল মনস্ত।
ঘরেতে ফিরিয়া মোহন মাতার সমীপে,
বলে, দেখ মাতা, দাসী আনিয়াছি তোর তরে।
মাতা বলে, বউ আমার পয়মন্ত খুব,
এই বছরে লাভালাভ হইয়াছে প্রচুর।
হাসি, গান, নৃত্য, গীতে গেল কয় দিন,
অষ্টমঙ্গলার দিন হইল আসীন।
নববধূ নিয়া মোহন চলে শ্বশুর গৃহে,
পিছন হইতে কী জানি কে চলিল সাথে সাথে।
স্বরূপ বেনিয়ার গৃহ অতি মনোহর,
স্বর্গের ইন্দির পুরী তার কাছে কোন্ ছাড়্।

বাড়ির চৌদিকে পরিখা কাটা তার আগে বেড়া,
বেড়ার উপর শোভে কত হাঙ্গরের কাঁটা।
কুড়ি হস্ত পরিমিত কাঠের বেড়া যার,
সেই ঘরে দুশমন্ আসা সহজ কি আর।
প্রথম রজনীতে মোহন সুখে নিদ্রা যায়,
পর দিবসে শ্বশুর গৃহে চিন্ পরিচয় হয়।
তৃতীয় দিন নিশিরাত্রে ভোজনের শেষে,
ঝারি হস্তে বাহির হয় মোহন মুখ ধুইবার আশে।
আগে যায় মোহন সাধু পিছনেতে কেউ,
মশাল নিয়ে এগিয়ে এলেন ঝি-দাসী বা কেউ।
মুখ ধুইয়া যেই ক্ষণে মোহন ফিরিতে যায় ঘরে,
সেইও না মুহূর্তে এক অঘটনও ঘটে।
কোথা হতে এলো বাঘ কেউনা দেখিল,
বেড়া ডিঙাইয়া মোহনের উপরে পড়িল।
নিমিষে দক্ষিণরায়ের চেলা মোহনকে
স্কন্ধে নিয়া তোলে,
কুড়ি হস্ত বেড়া ডিঙাইয়্যা মুহূর্তেতে ছোটে।
ধর্ ধর্ করে কেউবা, করে হায়, হায়,
সোরগোল শুনিয়া আসে ঝুমুনার বাপে মায়।
হায় হায় করে সবাই কপালে করাঘাত,
স্বরূপ বেনিয়া কাঁদে মাথায় দিয়া হাত।
হেনকালে সেইখানে আসিল ঘটক,
বলে, সাধু, কর্মফলে আজি তুমি হইলা আটক।
পূর্বেতে স্বীকৃত ছিলা দক্ষিণ রায়ের পূজা,
পূজা না দিলা তুমি তাই এই হেনস্থা।
দক্ষিণ রায়ের মহিমা বল কে বর্ণিতে পারে,
জনার্দ্দন মণ্ডল বলে, শুন সর্বজনে।

(৪)

শুন সর্বজন হয়ে একমন,
কীরূপে রক্ষা পাইলো জামাতা নন্দন।
মোহনেরে স্কন্ধে করি বাঘা লাগিল দৌড়াইতে,
অচৈতন্য জামাতা নিয়া সে আইলো বনেতে।
চতুর্দিকে কাশবন আর সরল বৃক্ষ রাজি,
তারি মাঝেতে বাঘা শিকার আনিল রাখি।
সাধের শিকার রাখি বাঘা হালুম হুলুম ডাকে,
সেই ডাকে সাড়া দিল অষ্টাশীটা বাঘে।
দেখিতে দেখিতে সেথা আইলো বাঘের পাল,
সম্মুখে দেখিয়া শিকার সবে আনন্দে মাতাল।
লম্ফ ঝম্প করে কেহ, পুলকে তোলে সোর,
দক্ষিণ রায়ের চেলারা সব আনন্দে বিভোর।
বাদাবনে আছে এক কাহিনীর প্রচার,
বাবা যারে কোল দেন কি-বা ভয় তার।
এদিকেতে চেতনাহীন মোহন বেনিয়া,
জঙ্গলের শেষে পূজা করে রূপসী রুমুনা।
মাধাই নামেতে ছিল এক কাঠুরে সর্দার,
তার কন্যা রুমুনা সুন্দরীর সার।
কাষ্ঠ কাটে, মোম বেচে. মধু বেচে খায়,
জঙ্গল আর বাদাবনে দিন কেটে যায়।
বনদেবী, বনের মাতা বাদাবনের সার,
সুন্দরী রুমুনা তার পূজার করিছে প্রচার।
নিত্য নিত্য পূজে রুমুনা ভক্তিমতী হইয়্যা,
প্রভাতে চমকাইয়া যায় প্রত্যাদেশ পাইয়া।
বনদেবী বলিছে, কন্যা, তোর দুঃখ হইল দূর,
পতি তোর দ্বারে এল সাদরে বরণ কর।

আঠারো ভাটীর উত্তরে আছে দক্ষিণরায়ের থানা,
সেইখানে আটক আছে মোহন বেনিয়া।
মোহন বেনিয়া দেখ্‌বি রূপে গুণে ধন্য,
তাহারে আনিয়া দিব কেবল তোরই জন্য।
কুপিত দক্ষিণরায়ের চেলা সব তারে ঘিরে আছে,
এখুনি পাঠাওনা ক্যানে তারে খুঁজি আনতে।
শোনো ওগো, শোন কন্যা, বলি যে তোমায়,
তাহারেই প্রাণ সঁপিও অন্যথা না হয়।
এই বাক্য শুনিয়া রুমুনা ঘরের বাহির হয়,
নিকটেই ব্যস্ত কাজে মাধাইর দেখা পায়।
রুমুনা কয়, শোন বাবা, বনদেবীর এক
অপূর্ব বারতা,
এই বাদাবনে আসিয়াছে আজ তোমারি জামাতা।
রুমুনার কথায় মাধাই চমৎকার মানে,
হাতের কাজে বন্ধ দিয়া অবাক হইয়্যা ভাবে।
এত বড় যুবতী কন্যা কদাচ ঘরের বাহির না হয়,
আজ কেনে কন্যা তার এমন কথা কয়।
মাধাইরে চিন্তিত দেখি রুমুনার চক্ষু জলে ভাসে,
দুই হস্ত জোড় করি বনদেবীরে ঘন ঘন ডাকে।
কাতর কণ্ঠে বলিছে রুমুনা, মাগো তুমি অন্তর্যামিনী,
পতিরে মোর রক্ষা কর আমি বড় দুঃখিনী।
কন্যার ক্রন্দনে মাধাই সম্বিত ফিরি পায়,
বিলম্ব না করি আর বনের দিকে ধায়।
এদিকেতে মোহন দেখে, দক্ষিণ রায়ের চেলা,
আমোদে আত্মহারা হইয়্যা,
কখনও বা নাচে, কেউবা উল্লাস জানায়
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া।

এই না ভাল সময় রুমুনা কামনা জানায়,
মা-বনদেবীর ঠাঁই,
পতিরে মোর রক্ষা কর, আর ত' কিছুই নাই চাই।
বাদাবনের কাহিনী শোন এক অপূর্ব ঘটনা,
বাঘের রাজা দক্ষিণ রায়ের সাথে বনদেবীর ছিল যে রটনা।
বনদেবী বলিছে, বেটী, তোর কিছু ডর নাই,
রায়কে জব্দ মুই করিব নিশ্চয়ই।
এই কথা বলিয়া দেবী এক পক্ষীমূর্তি ধরি,
পলকে উড়িয়া গেল মোহনের উপরি।
পক্ষীমূর্তি ধরি মাতা মোহনকে ডাকি বলে,
সরল বৃক্ষ বাহিয়া উপরে উঠনা এই শুভক্ষণে।
উপরে উঠিয়া তুমি বইস ভাল হইয়ে,
অচিরাৎ মুক্তি তুমি পাবে কুতুহলে।
পক্ষীর বারতা শুনি মোহনের প্রত্যয় জন্মিল,
ডাইনে বায়ে না চাহিয়া এক বৃক্ষেতে চড়িল।
চড়্‌চড়াৎ করি মোহন যখন বৃক্ষে উঠে চড়ি,
দক্ষিণ রায়ের চেলাবৃন্দ ঘিরিয়া ধরিল আসি।
ক্রোধেতে অজ্ঞান হইয়া রায়ের চেলা লম্ফ ঝম্প করে,
একুশ হাত উপরে উঠি মোহন ঠক্ ঠকাইয়া কাঁপে।
(ওগো) লম্ফ ঝম্প দিয়া বাঘা যখন কিছুই নাই পারে,
বাঘের পালে যুক্তি করি এক নূতন বুদ্ধি ধরে।
একের পৃষ্ঠে আরেক বাঘ তখন লাগিল উঠিতে,
(আহা) যেন ইটের পরে ইট দিয়া দালান লাগিল গাঁথিতে।
অষ্টাশীটা বাঘের শেষে মোহন যখন হাত খানেক বা দূরে,
ভয়েতে ব্যাকুল হইয়্যা সে তখন বনদেবীরে স্মরে।
শিশুকালে মা জননী বলেছিল যে কথা,
বিপদকালে শুনিল যেন সেই সে বারতা।

বনমাঝে বিপদেতে যদি কখনও পড়,
একমনে মা-বনদেবীরে নিদানে ডাকিও।
বনদেবী বনের রাজা জানে সকল লোকে,
বিপদেতে রক্ষা তিনি করেন সকলেকে।
আতঙ্কেতে গলার স্বর বাহিরও না হয়,
মনে মনে ডাকে মোহন যদি বনদেবীর দয়া হয়।
(ওগো) বিধির নিৰ্ব্বন্ধ বল কে বুঝিতে পারে,
আচমকা ভীমরুলের পাল আইলো ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভীমরুল আসিয়া দংশায় বাঘের চৌখে মুখে,
যন্ত্রণায় কাতর হইয়্যা বাঘের পালে নড়াচড়া করে।
নড়া চড়ায় বাঘের মেল গেল আলগা হইয়া,
ঝপা ঝপ্ পড়ে বাঘ চৌদিগে ছড়াইয়া।
অস্থির বাঘের পাল যন্ত্রণায় দৌড়াইতে লাগিল,
দণ্ডমধ্যে বৃক্ষতল ফাঁকা হইয়া গেল।
(ওগো) এই মতে কতকক্ষণ হইল গত
কিছুই নাই মনে,
দেখিতে দেখিতে ভানু উঠিল মধ্যম গগনে।
এই না ভাল সময় মাধাই বন মধ্যে আসে,
দূরেতে থাকিয়া এই তাজ্জব কাণ্ড দেখে।
উপরে থাকিয়া মোহন ডাকে ঘন ঘন,
পিপাসায় কাতর কণ্ঠ, শরীর অবসন্ন।
(ওগো) বনদেবী বনের রাজা অপার মহিমা,
পলকে নিজের আঁচল দিল যে বিছাইয়া।
(ওগো) উপর হইতে মোহন যখন পড়িল ভূমেতে,
বাজ পক্ষীর রূপ ধরি মাতা তুলি নিল ডানাতে।
অতি সাবধানে তারে শোয়াইয়্যা বনের ভিতরে,
শুকপক্ষী হইয়্যা ডাকে মাধাই কাঠুরিয়ারে।

নিকটে আসিয়া দেখে মোহন হইয়াছে অজ্ঞান,
বস্ত্র দিয়া হাওয়া করি মাধাই জলের খোঁজে যান।
বনদেবীর মহিমায় নিকটে এক সরোবর আছিল,
সেই না জলের ধারায় মোহন চৌক্ষু যে মেলিল।
যেন কোন কথা স্মরণ নাই অবাক হইয়া চায়,
মাধাইরে দেখিয়া মোহনের তড়াসে বুক শুকায়।
মাধাই বলে, চল সাধু চিন্তা আর ক্যানে,
বনদেবীর আজ্ঞায় তোমায় নিতে আইসাছি এইক্ষেণে।
ভূমেতে দাঁড়াইয়া মোহন তবু ভয় পায়,
কী জানি কোন্ ছলা বুঝি করে দক্ষিণ রায়।
মাধাই বলে, সাধু, এবে চল শীঘ্র গতি,
কী জানি কখন দেখা দিবেন রায় মহামতী।
এই পর্যন্ত বলিয়া দু'জনে লাগিল চলিতে,
পথি মধ্যে হ'ল দেখা দক্ষিণ রায়ের সাথে।
বাঘের বেশেতে রায় পথ আটকাইয়া রয়,
দেখিয়া রায়ের মূর্তি মোহন পুনঃ ভিরমি খায়।
রায় বলে, অনেক কষ্টে তোদের পাইয়াছি এইক্ষেণে,
এক এক থাবায় শেষ করিব মোর শত্রু দুইজনে।
বাদাবনে করি বাস বেটা মোরে নাহি ডরিস,
কোথাকার বনদেবীর তারে পূজা করিস।
আজ তোদের বধিব পরাণ দেখি কেবা রক্ষা করে,
মোর এলাকায় আসি মোর শিকার
কেবা নিতে পারে।
মাধাই বলে, প্রভু, তবে এক নিবেদন করি,
বাদাবনে বাস করি তোমায় নিত্য স্মরণ করি।
মুনিষ্যের রক্তে যদি তোমার এতই না তিয়াষা,
ওরে ছাড়ি মোরে খাও পুরাও তোমার আশা।

রায় বলে, তুই হলি বনদেবীর শিষ্য,
তোরে খাইলে তার সাথে মোর বিবাদ হইবে অবশ্য।
এই বেটার দোষ কিন্তু অনেক, যার লেখাজোখা নাই,
পূর্বেতে স্বীকৃত ছিল সেবা তার খেয়াল কেন নাই।
কোন কথা না শুনিব ছাড় উহার দেহ,
ব্যতিরকে দুইজনারই মৃত্যু হইবে অবশ্য।
ভয়েতে কাতর মাধাই তবু ডাকে, মা বনদেবী,
অসময়ে সদয় হও মা দেখা দাও গো আপুনি।
শুনিয়া মাধাইর কথা অট্টহাসি হাসে রায়ের দল,
ভূত. প্রেত, দত্যি, দানা, পিশাচে তোলে সোরগোল।
রায় বলে, কাঠুরের পো আমায় না দিস কোন দোষ,
একই সঙ্গে সাবাড় করি দু'জনায় হইব সন্তোষ।
মোহনকে লইয়া কোলে মাধাই ঘনঘন ডাকে,
তাহার কান্দন পৌঁছাইলো বনদেবীর কাছে।
ভক্তের বিপদ বার্তা দেবী শুনিতে পাইয়া,
নিমিষে আসিল সেথা রণমূর্তি হইয়া।
আসিয়া দেখেন, রায় করিয়াছে আড়ি,
এখনও না সামাল দিলে বিপদ হবে ভারী।
বনদেবী বলে, রায়, সম্বর আপুনি,
মোর ভক্তের বিপদ কেন ডাকিছ যাদুমণি।
রায় বলে, তোমার ভক্তের উপর আমার
বাসনা কিছুই নাই,
বেনিয়াপুত্রের টাটকা রক্ত অবশ্যই আমার চাই।
বিবাহের পূর্বেতে স্বীকৃত ছিল দিবে মোরে পূজা,
সে কথার খেলাপে তাই দিলাম এই সাজা।
বনদেবী বলে, রায়, কাজিয়া বন্ধ কর,
এখন হইতে পূজা তুমি পাইবা বিধিমত।

রায় বলে, শুনিয়াছি এই বেটা জামাই হবে মাধাইর,
এর পরে কি আর ফিরে দেখা পাইব উহার।
বনদেবী বলে, শুন, রাজা বাদা বনের,
আমার বাক্য লঙ্ঘন করে সাধ্য কি এই নরের।
এতক্ষণে মোহনের মূর্ছা ভঙ্গ হয়,
নিকটের দৃশ্য দেখি তরাসে বুক শুকায়।
কী অপরূপ দেবীমূর্তি পূর্বেতে না দেখি,
বুড়া বুড়ির কাছে শুনিয়াছি ইহার কত না কাহিনী।
বনদেবী বলে, বাছা, তোমরা যাও গৃহে চলি,
তোমাদের পথ চাহি বসি আছে রুমুনা সুন্দরী।
আজি হতে দ্বাদশ দিনে শুক্লা অষ্টমীর রাতে,
দুই পূজা একত্রে কর ভক্ত, কর ভক্তি ভাবে।
এই কথা বলিয়া দেবী অদৃশ্য হইল,
আশীর্বাদ করিয়া রায় প্রস্থান করিল।
দেখিতে দেখিতে রবি ঢলিল পশ্চিমে,
রুমুনা ঝুমুনায় কান্দে দুই জনায় দুই গাঁয়ে।

(৫)

(হারে) কান্দে সাধু স্বরূপ বেনিয়া,
তাহার ক্রন্দনে কান্দে বনের তরুলতা।
বক্ষে করাঘাত করি কাঁদে ঝুমুনার মাতা,
অবনী লোটাইয়া কান্দে রূপসী ঝুমুনা।
এইরূপে কয়দণ্ড হইল গত, কিছুই নাই থির,
হেনকালে দক্ষিণ রায় মনুষ্য বেশে হইল হাজির।
বলে, শোন সাধু, বলি তোমায় অপূর্ব ঘটন,
কুশলে বাঁচিয়া আছে তব জামাতা নন্দন।
পূজা কর বিধিমত ভক্তিযুক্ত হইয়া,
অচিরাৎ পাবে দেখা দক্ষিণ দিকে গিয়া।

বনমধ্যে কাঠুরিয়া মাধাইয়ের নিবাস,
সেই ঘরে তোর জামাই করিতেছে বাস।
ছাগ বলি দিয়া রায়ে সন্তুষ্ট করিয়া,
ঝুমুনারে লইয়া যাও ত্বরান্বিত হইয়া।
দৈববাণী শুনি সবে চমকিত হইয়া,
ভূমি শয্যা ত্যাজি দেখে এদিক ওদিক চাইয়া।
আচম্বিতে দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্ররূপ ধরি,
কাননে চলিয়া গেল মহা হুহুঙ্কার ছাড়ি।
রায়ের বাক্যেতে সবে পুলকিত হইয়া,
আয়োজন করে পূজার ভক্তিমান হইয়া।
শুভক্ষণ দেখিয়া সবে যাত্রা করে কেঁদোখালি গাঁয়ে,
সেইখানে রায়ের থানে শত ছাগ বলি দেয়
মহতি উল্লাসে।
ঢাক, ঢোল, কাড়া বাজে সারিন্দাদি সানাই,
সাঁঝ সন্ধ্যায় পৌঁছে সবাই মাধাইয়ের ঠাঁই।
দূরেতে মাধাইয়ের বাড়ি ওই দেখা যায়,
বিবাহের মঙ্গলবাদ্যে সকলে চমকায়।
এত বড় হৈ-চৈ এই না বাদাবনে,
না জানি কার বিবাহ এই না শুভক্ষণে।
দূরেতে বাদ্য শুনি মাধাই মশাল নিয়া হাতে,
অগুরিয়া হৃষ্ট মনে সকলেকে ডাকে।
থমকিয়া দাঁড়ায় সবে আসি মাধাইয়ের কুটীরে,
এ কি অসম্ভব কথা মোহন সাজিয়াছে বর বেশে।
পাশেতে রুমুনা সতী যেন লক্ষ্মীনারায়ণ,
সূর্য পাশে চন্দ্র শোভিল যেমন।
মুখে নাহি বাক্য কারো নির্বাক হইয়া রয়,
হুতাশে ঝুমুনা সতী মূর্চ্ছাগত হয়।

কেহ আনে জলের ঘটি, বাতাস দেয় বা কেহ,
রুমুনা বলে, দিদি, মোরে ভগ্নী মান্য কর।
তুমি মোর দিদি হও মোর মাথে থাকিও,
দুঃখিনী ভগিনীরে চরণে ঠাঁই দিও।
মা-বনদেবীর আদেশে আজি তা'রে পতি বলি মানি,
নিশি প্রভাতে পতি-সনে যাইও তুমি, যেথা ইচ্ছা করি।
কী-রূপে বাঁচিল পতি তব জিজ্ঞাসিও তা'রি,
ভাল মন্দ নাহি জানি কেবল বনদেবীরে স্মরি।
পিতার সাক্ষাতে শুনিয়াছি তোমরা
রায় ঠাকুরের চেলা,
হই যদি বা বনদেবীর কন্যা মোরে না করিও হেলা।
এই সত্য করি আজি তোমার গাত্র ছুঁই,
তোমার সুখের পথের কাঁটা কভু না হইব মুই।
স্বামী সঙ্গে নিশ্চিন্তিতে সুখে নিশি যাপ,
দরিদ্র ভগিনীর পিত্রালয়ে আতিথ্য গ্রহণ কর॥
ঝুমুনা বলে, ভগ্নী, বুঝিলাম সার,
সকলই দেবতার ইচ্ছা মোরা নিমিত্তের ভার।
আজি হতে মোরা দুই বোন রহিব একত্রে,
জয়া-বিজয়া দাসী যেমন বিষ্ণু পদতলে।
এত বলি ঝুমুনা তখন হাতের কাঁকণ, গলার হার
আর সিঁথিপাটী যত,
নিমিষে খুলিয়া তাহা সাজায় রুমুনায় রাজনন্দিনীর মত।
বরণডালার সিঁদুর নিয়া রুমুনার সিঁথিতে পরাইলো,
দক্ষিণ-রায়ে স্মরণ করি আশীষ মঙিল।
এই না ভাল সময় নিশি প্রভাত হইল,
কাক কুকিলায় তোলে রোল
ঝুমুনার কোলে রুমুনা কাঁদিতে লাগিল।

রুমুনা বলে, দিদি, আমি অতি অভাজন,
কেমনে সঁপিয়া দিলা তব পতি ধন।
ঝুমুনা বলে, বোন, মনে না করিও আন,
তোর তরেই ফিরে পেলাম আমার স্বামী ধন।
এদিকেতে বেটার নিরুদ্দেশের বার্তা অবনীচাঁদ,
কানেতে শুনিয়া,
মূর্ছাগত হইয়াছিল দিন ক্ষণ না গণিয়া।
নিশি যোগে স্বপ্ন দেখে, বাবা দক্ষিণ রায়,
বাঁচাইয়া দিয়াছে তার পুত্র সদাশয়।
খবর পাইয়া সাধু তখন রায়মঙ্গল হইতে,
লোকলস্কর নিয়া আসে মাধাইয়ের বাড়িতে।
মাধাই বলে, পূর্বজন্মের সুকৃতি আর মা বনবিবির দয়া,
তাহা না হইলে কি আর পাইতাম বিয়াইর দেখা।
সাধুর সেরা অবনীচাঁদ বলে, হরিষ অন্তরে,
বেটা আমার ফির‍্যা পাইলাম, দুই কন্যাও সেই সঙ্গে।
মাধাই বলে, আপনি যে সদাশয় ব্যক্তি
ভাটী দেশের সবাই তা' জানে,
আপনার অভিরুচি মত কার্য এক্ষণে করুন না ক্যানে।
কিন্তু বিয়াই একটা নিবেদন রাখি তব কাছে,
যাত্রাকালে বনদেবী আর রায় বাবার পূজা দিতে হবে;
আপনার এক মাতা ভক্ত রায় ঠাকুরের
আর এক মাতার উপাস্য বনদেবী,
দুইওজনায় একত্রে থাকুক এই মোর মিনতি।
বনদেবী বনের মাতা সর্বলোকে জানে,
বাবা রায়ের মাহিত্ম্যও কেউ না অমান্য করে।
আজি হতে আমার জ্ঞাতী, বন্ধুবর্গ যে যেখানে আছে,
মা-বনদেবী আর দক্ষিণ রায়ের পূজা যেন একই সঙ্গে করে।

স্বরূপ বলে, বেয়াই, তবে বিলম্ব আর কেন,
পূজা অন্তে আমাদের যাত্রার যোগাড় কর।
আজ্ঞা পাইয়া মাধাই তখন যাত্রার আয়োজন করে,
সাদরে নিমন্ত্রণ করে স্বরূপ, ভাটীর লোকজনে।
কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ নৃত্য করে—
রুমুনা ঝুমুনারে সঙ্গে করি মোহন যাত্রা করে।
অঞ্চলে বাঁধিয়া ফুল, বাবা দক্ষিণরায়ের,
বনবিবি (বনদেবী) তলার মাটি লইল শিরোপরে।
অবনী সাধু বলে, বেয়াই তুমিও চল মোদের সঙ্গে,
আনন্দে কাটাব দিন, করি নানা রঙ্গে।
মাধাই বলে, বেয়াই তোমার বচনে মুই হইলাম পরিতুষ্ট,
এইখানেই থাকিবো মুই না হবে মোর কোন কষ্ট।
বাবা রায়ের দয়ায় আর বনদেবীর কৃপায়,
কিছুরই আর অভাব মোর নাই এ ধরায়।
যে দিন হইতে বাবার দয়া পাইয়াছি সার,
ঘরেতে বসিয়া মোম, মধু পাই ভাড়ে ভাড়।
কাষ্ঠ বেচি, মোম বেচি দুঃখ কিছু নাই,
সাঁঝ সইঞ্ঝায় পূজি মুই দুই দেবতায়।
তোমাদের কুশল মাগি যাত্রা ত্বরা কর,
পথেতে আঁধার নামলে বিপদ হবে বড়।
এই কথা বলিয়া মাধাই বিদায় দেয় কন্যায়,
করজোড়ে কুশল মাঙে কন্যা জামাতায়।
বাবা দক্ষিণ রায় ভাটীর দেশের রাজা,
বাদাবনের বনদেবী (বনবিধি)
যে গো তাহারি মিতা।
অধম জনার্দ্দন মুই হেথায় কী কহিতে পারি,
বনদেবী, দক্ষিণ রায়ের নামে একত্রে দিও জয়ধ্বনি।

আলোচনা

লোক-গীত-কথার সন্ধানে যখন আমার সীমিত সামর্থ নিয়ে পশ্চিম-বঙ্গের (দক্ষিণবঙ্গ সহ) নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, সেই সময় ২৪ পরগণার সোনারপুর অঞ্চলে কালিকাপুর গ্রামে, গায়ক নারায়ণ চন্দ্র সূত্রধরের সহায়তায় তস্য গুরু যুধিষ্ঠির মণ্ডলের কাছ থেকে (তার তুলোট কাগজের পুঁথিদৃষ্টে) এই গাথাটি সংগ্রহ করতে সমর্থ হই। কিন্তু গীতিকাটির শেষে জনার্দ্দন নামক কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তাঁর পুরো নাম ছিল জনার্দ্দন মণ্ডল। তবে উক্ত জনার্দ্দন ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। অনুরূপ আর একটি লোক-গাথা ঐ জেলারই হাসনাবাদ অঞ্চলে হারু কৈবর্তের কাছ থেকেও পাওয়া যায়, তবে সে কাহিনীটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। সে কারণে এই গীতিকাটির প্রকৃত রচয়িতা কে সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া একটু কষ্টকর। কারণ, উপস্থাপিত এই গীতিকাটির শেষ হয়েছে যেখানে এই বলে :—

"বাবা দক্ষিণ রায় ভাটী দেশের রাজা,
বাদাবনের বনদেবী যে গো তাহারি মিতা।
অধম জনার্দ্দন মুই হেথায় কী কহিতে পারি,
বনদেবী, দক্ষিণ রায়ের নামে দিও জয়ধ্বনি।"

সেখানে হাসনাবাদ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাটির (খণ্ডিত) শেষে বলা হয়েছে :—

"সেলাম, সেলাম তোমায় গাজী পীর,
কি-খা দোষে করলে আমায় ঘর ছাড়া
যেমুন চন্দ্রকেতু রাজার বাড়ি করলে ছারখার,
অধম হারু তাই তোমায় সেলাম জানায় বারে বার।"

এ ছাড়াও আরও একটি বড় ব্যতিক্রম এর কাহিনী বিন্যাসে। উপস্থাপিত গীতিকাটিতে আরম্ভ হয়েছে চন্দ্রকেতু রাজা ইন্দ্রধ্বজ পুজো করে তার রাজত্বকে দ্বিতীয় স্বর্গ বানাবার চেষ্টা করেন। সে কারণে তিনি

গঙ্গাদেবীকে নিজ দেশে আনায়ন করতে চান। কিন্তু ইন্দ্র ও গাজীপীরের চক্রান্তে তার সে আশা ত' বরবাদ হ'লই, উপরন্তু গঙ্গাদেবীর ক্রোধে এবং গাজীপীরের বিরূপতায় চন্দ্রকেতু রাজার রাজ্য-রাজধানী সবই ধ্বংশ হয়ে গেল, কিন্তু দৈবক্রমে সেই বংশেরই একজন ভাসতে ভাসতে আরও দক্ষিণে উপনীত হয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করেন। তিনি বাদাবনের অধীশ্বর বাবা দক্ষিণ রায়ের সেবক হয়ে সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। পরে, ঘটনাচক্রে আবার বনদেবীরও পরম ভক্ত হয়ে পড়লেন এবং পরিশেষে বনদেবী ও দক্ষিণ রায়ের একত্রেই পূজার প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু হাসনাবাদ অঞ্চলের গীতিকাটির (যতটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল) মূলকাহিনী প্রায় অনুরূপ হলেও এর ভিতর গাজীপীরের প্রভাবটাই যেন বেশী।

গাজীপীরও বাদাবনের অন্যতম অধীশ্বর। কিন্তু দক্ষিণ রায় বা বনদেবীর (কোন কোন সম্প্রদায়ে 'বনবিবি' বলেও উল্লিখিত) সঙ্গে তার কোনো বিবাদ নেই। তিনি নিজ মহিমায়ই উজ্জ্বল। এ গাথাটির আরম্ভ হল :—একদিন গাজী পীর তার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে পরমধার্মিক নৃপতি রাজা চন্দ্রকেতুর দরবারে এসে হাজির হলেন। রাজা তার শক্তিমত্তার বিশেষ সমাদর করলেন না। রাজা শ্লেষভরে পীরকে বললেন, তোমার যদি এতই ক্ষমতা, তা' হলে আমার এই যে রাজধানী লোহার বেড়া দিয়ে চৌদিক ঘেরাও করা রয়েছে, তুমি এর প্রত্যেকটির গায়ে একটি করে সোনার চাঁপা ফুল ফুটিয়ে তুলতে পার কিনা দেখাও, তা'হলে বুঝব তোমার শক্তির দৌড় কত!

রাজার কথায় গাজীপীর অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি শেষবারের মত রাজাকে অনুরোধ করলেন, তার অন্যায় এবং অযৌক্তিক আদেশ ফিরিয়ে নিতে।

রাজা কিন্তু সে কথায় কর্ণপাতও করলেন না। তিনি গোঁ ধরে বসলেন, যদি সত্যিকারের গুণীন হও, তা'হলে যা বলেছি তাই কর, নচেৎ আমার রাজত্ব থেকে দূর হয়ে যাও—।

গাজীপীর তখন তার 'আশালাঠি' হাতে নিয়ে বললেন, রাজার পাপেই রাজ্য নষ্ট, সর্ব ধর্মেই এ-কথা বলে। আমার কোন দোষ নেই, এই দেখ,—বলে তিনি তার 'আশালাঠি'টা রাজার রাজধানীর চতুর্দিকের লোহার বেড়ার (রেলিং) উপর একবার তড়িৎ গতিতে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে রাজার রাজত্বের যে লোহার বেড়া ছিল তার সবকটি শিকের উপর ফুটে উঠলো এক একটি স্বর্ণচাঁপা। জনশ্রুতি, সেই থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছে 'বেড়াচাঁপা'। অবশ্য উপস্থাপিত গীতিকাটিতে অন্যরূপ রয়েছে—বেড়া মানে প্রাচীর অর্থাৎ যেখানে রাজার রাজপুরী বেড়া (প্রাচীর) চাপা পড়ে গেছে—চলে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, সে স্থানটির লোক মুখে মুখে নাম ধারণ করল 'বেড়াচাঁপা' অর্থাৎ প্রাচীরের অন্তরালে।

রাজা এবং সমগ্র সভাসদ চাক্ষুশ দেখলেন এই অলৌকিক ব্যাপারটা। রাজারও সম্বিত ফিরে এসেছে। তিনি সিংহাসন ছেড়ে এগিয়ে এলেন গাজীপীরের কাছে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার তা শুরু হয়ে গেছে। গাজীপীর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেখা দিল প্রবল ঝড়, বৃষ্টি সঙ্গে ভূমিকম্প এবং প্রবল জলোচ্ছ্বাস। সাতদিন, সাতরাত ধরে চলল এই অবিরাম বর্ষণ। রাজার রাজধানী তলিয়ে গেল জলের তলায়, রাজপুরী চাপা পড়ল মাটির নিচে। কালক্রমে আবার নতুন দেশ জেগে উঠলো। লোকে ভুলে গেল রাজা চন্দ্রকেতুর কথা। কেবল এই জলোচ্ছ্বাসের সময় রাজবাড়ির কেউ কেউ ভাসতে ভাসতে চলে গেল আরও দক্ষিণে।

হাসনাবাদ অঞ্চলের কাহিনীর এর পরের অংশ পাওয়া যায় না। কোন পুঁথি বা লিখনও কারও কাছ থেকে পাইনি। দু'টি কাহিনীর মূলে আছে চন্দ্রকেতু রাজার রাজত্বের ধ্বংশের কাহিনী। সে দিক থেকে দু'টি কাহিনী সম্পূর্ণ আলদা হলেও এই অংশ পর্যন্ত একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরবর্তী ঘটনা যথা—বনদেবী

(বনবিবি) বা দক্ষিণ রায়ের কথা কিছু পাওয়া যায় না। সোনারপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গাথাটির ভিতরও গাজীপীরের উল্লেখ আছে, তবে, তিনি ছিলেন রাজার বন্ধু। ইন্দ্রের ছল চাতুরীতে তিনি বাধ্য হয়ে ছিলেন রাজার বিরুদ্ধাচরণ করতে। কিন্তু হাসনাবাদ অঞ্চলের গাথায় গাজীপীরকে প্রথম থেকেই রাজার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখান হয়েছে। জানিনা সম্পূর্ণ গীতিকাটি হাতে এলে এর পরবর্তী অংশ অর্থাৎ মাধব বেনিয়া, রুমুনা ঝুমুনার কাহিনী কী-রূপ ছিল বা অন্য কোন নায়ক বা নায়িকার উপস্থিতি ছিল কি না। তবে একটা বিষয়ে দু'টি জায়গায় মিল পাওয়া যায়,—ঝড়, জল, ভূ-কম্প বা জলচ্ছাসে রাজার রাজ্য রাজধানী মাটির সঙ্গে মিশে গেল, কিন্তু "দেউলপোতার সোতা" (রাজার রাজপুরীর সংলগ্ন গুপ্ত খাল) দিয়ে দৈবক্রমে রক্ষা পেল রাজার কোন বংশধর। সোনারপুর অঞ্চলের কাহিনীতে অবশ্য এই বংশধরের নাম উল্লিখিত হয়েছে "ভগীরথ" হিসেবে, কিন্তু হাসনাবাদ অঞ্চলের কাহিনীতে কোন নাম নেই, শুধু বলেছে—'রাজপুরীর কেউ কেউ'।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, হাসনাবাদ অঞ্চলের হারু কৈবর্তের গীতি-কাটি খণ্ডিত। তাই দু'টি গাথাকে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তবে, একটা বিষয়ে লক্ষ্য করবার আছে, কাহিনীর প্রথমার্ধে কোন গাথার ভিতরই বাবা দক্ষিণরায় বা বনদেবীর (বনবিবি) উল্লেখ নেই, পক্ষান্তরে গাজীপীরের কথা কিন্তু দু'টি গাথাতেই উপস্থিত—অবশ্য একটু রকমফের রয়েছে তা ঠিক।

দু'টি কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের ভিতর রাজা চন্দ্রকেতু এবং গাজী-জিন্দা পীর যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বর্তমান গবেষণায় সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আনুকুল্যে রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্য, রাজধানী, তা'র ধনাগার, মুদ্রা, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। আর সুন্দরবন প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলে গাজী জিন্দাপীরের নামও বহুল

প্রচারিত। তবে, দু'টি কাহিনীই এই নব আবিষ্কৃত তথ্যাদির বহুপূর্ব থেকেই প্রচলিত। কিন্তু কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ চন্দ্রকেতু রাজার জনৈক বংশধর (গীতিকা অনুসারে ভগীরথ) কর্তৃক নূতন বসতি স্থাপনা বা বাবা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য কিংবা বনদেবীর বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবর্তে লৌকিক উপাখ্যানই প্রাধান্য পেয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ, বিশেষতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে (বাংলা দেশেও) এখনও কোন কোন অঞ্চলে পৃথক ভাবেই বাবা দক্ষিণ রায় এবং বনদেবী বা বনবিবির পূজোর প্রচলন বিদ্যমান।

বাবা দক্ষিণরায় লৌকিক দেবতা। তিনি ব্যাঘ্রের দেবতা রূপেই পূজিত। লৌকিক দেব-দেবীদের আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার মূলে ভয় এবং ভক্তিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের উৎপাত সর্বজন বিদিত অথচ বনে কাঠুরেদের যেতেই হয় কাষ্ঠ সংগ্রহের তরে, তাই তাদের কিছু রক্ষা কবচের দরকার হয়ে পড়ে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভয় থেকেই ভক্তি সুতরাং এই হিংস্র জানোয়ারকে শুধু মাত্র ভয় করে বসে থাকলেত' আর লোকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না—কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য তাদের বনে ঢুকতেই হবে। তাই কল্পিত হ'ল বাবা দক্ষিণরায়ের মূর্তি এবং প্রচারিত হ'ল তা'র মাহাত্ম্য—তিনি যদি কৃপা করেন এবং সন্তুষ্ট হ'ন তাহলে কাঠুরেরা নির্বিঘ্নে বনাঞ্চল থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারবে—এই জন্যেই কাঠুরেরা দলবদ্ধ হয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করে প্রথমেই বাবা দক্ষিণরায়ের পূজো দেয়। পূজোর প্রধান উপকরণ ছাগ বলি। বলি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। দক্ষিণরায়ের পূজো করে ছাগ শিশুটিকে তার পূজো বেদীর সন্নিকটে খোঁটা পুতে রেখে চলে আসে—বাবা ব্যাঘ্র রূপ ধারণ করে এক সময় এসে তার পূজো (ছাগ শিশুটিকে) গ্রহণ করে চলে যান—কাঠুরেরা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে ঢাক, ঢোল বাজিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে মহা হৈ-চৈ করে বনে প্রবেশ করে তাদের পছন্দমত কাষ্ঠ সংগ্রহ করে যত সত্বর সম্ভব নৌকোতে ফিরে আসে।

কালক্রমে এই দক্ষিণরায় এবং তা'র বাহন সম্পর্কে অনেক লৌকিক কাহিনী এবং ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে গুনীন্‌দের। এরা কাষ্ঠ সংগ্রহকারীদের দলে থাকেন। নৌকো থেকে নেমেই এরা আগে 'বাঘবন্দী' মন্ত্র উচ্চারণ করে দলের প্রত্যেকটি লোককে ধুলোপড়া দিয়ে নিঃশঙ্ক করে তবে বনে ঢুকবার অনুমতি দেন। গুনীন্ ছাড়া কাঠুরেরা বড় একটা বনে পা দেয় না। এদের খাতির অনেকটা সাপের রোঝা বা ঝারফুঁক্‌কারী ফকিরদের সমান। মনসা মঙ্গলের মনসাদেবীর কাহিনীর মত দক্ষিণ রায়ের কাহিনীরও প্রচুর ছড়াছড়ি। সুতরাং ওই অঞ্চলের গীতিকায় দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন কিছুটাত' থাকবেই—এতে আর আশ্চর্যের কী ?

বাবা দক্ষিণরায় পুরুষ দেবতা কিন্তু মাংসাশী। তিনি বনের অন্যতম অধীশ্বর। কাঠুরেরা বনে প্রবেশ মুখে অবশ্যই তার পূজো দিয়ে থাকে। বনের এই রকম আর এক নারী দেবতা আছেন, তিনি হলেন "বনদেবী" (মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে বনবিবি)। কাঠুরেরা সাধারণতঃ তা'র পূজো না করলেও বনে আগমনকারী আরেক দল লোক যাদের কাজ হ'ল মধু ও মোম সংগ্রহ করা—তারাই হলেন বনদেবী (বনবিবি) র প্রধান উপাসক। এরাও বনে মধু ও মোম সংগ্রহের মানসে বনে প্রবেশের মুখে বনদেবী (বনবিবি) র পুজো দিয়ে তবে ঢোকে। বনদেবী সময় হলে এই মধু-মোম সংগ্রহকারীরা প্রচুর পরিমানে মোম-মধু সংগ্রহ করে অর্থাগম করে থাকে। সুতরাং সুন্দরবনের বাদা এবং বনাঞ্চলের এই দুই দেবতারই দাপট প্রচণ্ড পরিমাণে। ভীমরুল ও মৌমাছি হল বনদেবীর সব সহচর। অবশ্য সাপ, বাঘও তা'র আদেশ অমান্য করেনা। তাই, মধু-মোম সংগ্রহকারীরা বনে ঢুকে বনদেবীর পূজো দিয়ে নির্ভয়ে তাদের কাজ শুরু করে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটু উল্লেখ করা উচিত—দক্ষিণরায়ের এলাকা গভীর বন এবং জলভূমির দিকে আর বনদেবীর এলাকা অপেক্ষাকৃত বিরল বৃক্ষরাজির এলাকার ভিতর। বাদাবনের বাসিন্দারের জীবিকার প্রধান

উৎসই হ'ল সুন্দরবনের কাঠ এবং মোম-মধু সংগ্রহ করে গঞ্জের বাজার বা পাইকারদের কাছে বিক্রি করা। প্রতি বছরই এই উপলক্ষে বিভিন্ন দলে কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং মোম মধুর জন্য আগমন করে থাকে।

বলা বাহুল্য এত পূজো-অর্চনা সত্ত্বেও প্রতি বছর ২/১০ জন লোকযে বাঘের পেটে বা ভীমরুল, মৌমাছি বা সাপের কামড়ে মারা যায়না এমন নয়। তবু, লৌকিক বিশ্বাস অনুসারে সে ব্যক্তির মৃত্যুকে গণ্য করা হয়—দক্ষিণরায় বা বনদেবীর রোশ অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়, মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই বনে প্রবেশের মুখে কোন পাপ কর্ম বা অনাচার করেছিল বা সে যে-কোন ভাবেই অশুচি ছিল নতুবা এত লোক থাকতে তারইবা মৃত্যু হবে কেন?

গীতিকাটিকে মোটামুটি ভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ রাজা চন্দ্রকেতুর কাহিনী-তার পতন, দ্বিতীয়তঃ বাবা দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ ও তার কর্মধারা, তৃতীয়তঃ বনদেবীর উপাখ্যান ও তার মাহাত্ম্য বর্নণ। সর্বশেষে চতুর্থ অংশ হল বনদেবী (বনবিবি) ও দক্ষিণরায়ের সমঝোতা বা সখ্যতা অর্থাৎ সেই থেকে লোকে বনদেবী (বনবিবি) ও দক্ষিণরায়ের একত্রে পূজোর প্রচলন। অবশ্য সব সময়ে দুজনে একত্রে পূজিত না হলেও মান্য মানে সমান সমান—এ বিষয়ে সকলেই একমত।

গীতিকাটির অন্যতম চরিত্র হলেন বড় খাঁ গাজী বা গাজী জিন্দাপীর সংক্ষেপে গাজীপীর। সংগৃহীত দুটি গীতিকাতেই প্রথমার্ধে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোথাও তার নামও উল্লেখ নেই (অবশ্য হাসনাবাদ অঞ্চলের গীতিকাটি খণ্ডিত, তাই বোঝা যায় না ওই গীতিকাটির শেষে তা'র কোন কথা বা কীর্তি-কাহিনী কিছু লিপিবদ্ধ করা ছিল কিনা)। অথচ বাদা বনে প্রচলিত বহু ছোট খাট গীতিকাতেই তা'র নামের উল্লেখ আছে। অবশ্য অন্যত্র তার নাম বা কীর্তিকলাপ বর্ণিত থাকলেই যে এ কাহিনীতেও তার কিছু নিদর্শন থাকতেই হবে

এমন কোন কথা নেই। তা'হলেত কুমীরের দেবতা কালু রায়ের কথাও এসে পড়ে। একটি গীতিকা নিয়ে বিচার করতে বসে আঞ্চলিক সব লৌকিক দেব-দেবীর নামই যে উল্লেখ থাকতে হবে এমন কোন কারণ নেই। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত সংগৃহীত এবং উপস্থাপিত গীতিকা (সতী রুমুনা ঝুমুনার পালা) টির উপর।

যতদূর জানি, এই গীতিকাটিও একসময় পালাগান হিসেবেই প্রচলিত এবং প্রচারিত ছিল।

———